কোরআন-হাদীসের আলোকে বছরব্যাপী করণীয় ও বর্জনীয়

জাওয়াহিরুল কুনজ, তাযকিরাতুল আওরাদ, বাহাতুল কুলুব, জাওয়াহিরে গায়বী, মোকছুদুল মোমেনিন ও বার চান্দের আমলসহ অসংখ্য জাল হাদিস ও মিথ্যা আজগুবি ফযীলত বিষয়ক আমলের বইয়ের বিপরীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা।

সংকলক

মুফতী শাহাদাত হুসাইন ফরায়েজী

তত্বাবধানে: মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী

কোরআন-হাদীসের আলোকে
বছরব্যাপী করণীয় ও বর্জনীয়

সংকলক: মুহাম্মাদ শাহাদাত হুসাইন ফরায়েজী
তত্ত্বাবধানে: মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী দা.বা.
অঙ্গসজ্জা: মুফতী নিজামুদ্দীন আল গাজী
প্রকাশকাল: ০৮- ১১- ২০২৩ ইং
গ্রন্থস্বত্ব: সংকলক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশনায়: ফরায়েজী সাহিত্য পরিষদ
প্রচ্ছদ: মুহা. জোবায়ের হোসাইন

মূল্য: ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:
মুসলিম ভিলেজ (বাংলা বাজার, ঢাকা)
আজিজিয়া লাইব্রেরী (ফেনী)
আল মদিনা লাইব্রেরী (ছাগলনাইয়া, ফেনী)
যোগাযোগ: ০১৬৭৩৮৭২০২৯ , ০১৮২২৭০৫৫১৬

মুদ্রণে: সাবিহা প্রিন্টিং এন্ড এক্সেসরিজ
(আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা) ফোন: +৮৮ ০১৯১৮৪২৭০০০

ঢাকা রামপুরার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপিঠ তা'লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, চিন্তক, মুনাজেরে যমান

আল্লামা মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী দা.বা. -এর

দোআ ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

মানবসৃষ্টির প্রধানতম কারণ কুরআনে কারীমে রব্বে কারীম ব্যক্ত করেছেন 'তাঁর ইবাদত' বলে। 'ইবাদত' মানে আব্দিয়্যাত বা গোলামী। গোলামের নিজের কোন ইচ্ছে থাকে না। থাকে না কোন স্বাধীনতা। মালিকের ইচ্ছেটাই তার ইচ্ছা। মালিকের আদেশই তার জন্য শিরোধার্য। মালিকের নিষেধ করা কাজ থেকে বিরত থাকা তার জন্য অত্যাবশ্যক।

ইবাদতের একটি মৌলিক বিষয় হলো 'আমালে ছলেহা' বা নেক আমল। সেই নেক আমল কিভাবে করতে হবে? কোন পদ্ধতিতে করতে হবে? কিভাবে করলে মালিক খুশি হবেন? সেটাও রব্বে কারীম কুরআনে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন।

সেটি হলো: আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী, আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাতানো পদ্ধতিতে তা আদায় করতে হবে। তবেই তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে। নতুবা নিজের বানানো পদ্ধতিতে যতই ইবাদত করা হোক তা মূলত ইবাদত বা আমলে ছলেহা হবে না।

দৈনন্দিন জীবনে আবশ্যকীয় ইবাদত ছাড়াও কতিপয় নফল বা ঐচ্ছিক আমল রয়েছে। যা করলে অনেক সওয়াব, কিন্তু না করলে গোনাহ নেই।

হাশরের ময়দানে আবশ্যকীয় ইবাদতের কমতিগুলো যে নফল আমলের সওয়াবের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ হবে। তাই এসব আমলগুলো ঐচ্ছিক হলেও অনেক গুরুত্ব বহন করে।

প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতিটি মাস এবং সময়ের স্রোতে বয়ে চলা প্রতিটি বছর। আমাদের জীবনের এক মহামূল্যবান সময়। যার প্রতিটি মুহুর্তেই নফল আমলগুলো করে আল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন হবার রয়েছে অমূল্য সুযোগ। আল্লাহ তাআলার রহমাতে আমাদের দেশের অনেক মানুষ তা করার চেষ্টাও করে থাকেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ইলমের কমতির কারণে অনেকেই নফল ইবাদতের নামে নানা ধরণের কুসংস্কার, রুসুম রেওয়াজ ও বিদআতে লিপ্ত হয়ে গেছেন। ফলে সওয়াবের বদলে বিদআতে লিপ্ত হবার করণে অজান্তেই অনেকে গোনাহে জড়িয়ে পড়ছেন।

তাই এসব রুসুম রেওয়াজ সম্পর্কে সতর্ক হয়ে, সুন্নাহসম্মত নেক আমল সম্পর্কে অবগতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমার অত্যান্ত খুশি লেগেছে আমার মোহাব্বাতের ভাই, স্নেহাস্পদ ছাত্র ‘মুফতী শাহাদাত হোসাইন ফরায়েজী’ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে কলম ধরেছেন।

দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছরের করণীয় আমল ও বর্জনীয় কাজ বিষয়ক কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক একটি চমৎকার সংকলন “কুরআন ও হাদীসের আলোকে বছরব্যাপী ও করণীয় ও বর্জনীয় আমল” শিরোনামে একত্র করেছেন। যাতে করণীয় আমল যেমন দলীলসহ উপস্থাপন করেছেন। তেমনি বর্জনীয় বিষয়াদীও সুন্দরভাবে প্রমাণিকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

আমি পুরো বইটা আদ্যোপান্ত পড়েছি। সেইসাথে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছি।

আমি বিশ্বাস করি, এ বইটা প্রতিটা দ্বীনদার নরনারীর ঘরে থাকা উচিত। সকলের পড়া উচিত এবং আমল করতে চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা মুফতী শাহাদাত হোসাইনের এ মেহনতকে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী
পরিচালক: তা'লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
ওয়েব: www.ahlehaqmedia.com

দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শে উদ্ভাসিত এবং নববী ইলমের পুষ্পকানন শত হাফেজ ও আলেমের ইলম অর্জনের অন্যতম মারকায ঢাকা - নারায়ণগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপিঠ জামি'আ উসমানিয়া দারুল উলুম তালতলা মাদ্রাসার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, হুফফাজুল কোরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ/পিরোজপুর জেলার সভাপতি

আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন সাহেব-এর

দো'আ ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। যিনি মানুষের আমলকে শুধরানোর জন্য যুগে যুগে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সালাত ও সালাম মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সা্ঃ এর জন্য। যিনি সকল সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ। বর্তমান যুগ বড়ই ভয়াবহ।চারিদিকে শুধু অন্যায় অনাচার আর পাপাচারে ভরপুর।ফেৎনার সমুদ্রে যেন উত্তাল শুরু হয়েছে। গুম-খুন চুরি-রাহাজানি, ব্যভিচারের মত বিষয় গুলো যেন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে।এই সকল বিষয় হল, বদ আমল। এই আমল গুলোই জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আমাদের মাঝে আমালে সালেহা নেক আমলের খুবই অভাব।অনেকে আছে জানা সত্ত্বেও আমল করে না। অনেকে আছেন না জানার কারণে আমল করে না। আমল বিহীন ইলম এবং ইলম বিহীন আমল উভয়টিই ক্ষতিকর। বস্তুত মুফতী শাহাদাত হুসাইন সাহেব অত্র জামিয়ার একজন স্বনামধন্য শিক্ষক। মাদ্রাসায় ইলমে ওহির খেদমত, দরস ও তাদরীসের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা তাকে লিখনীর স্পৃহাও দান করেছেন। উক্ত গ্রন্থখানার পান্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ আমি দেখেছি। ইতিপূর্বে ৩৬৫ দিনের আমলের

বহু দো'আর বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে "কুরআন হাদীসের আলোকে বছরব্যাপী করণীয় ও বর্জনীয়" নামক বইটি একটু ব্যতিক্রম অনুমিত হচ্ছে।কারণ এতে সংকলক তা সংকলন করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ দো'আ ও আমলের পাশাপাশি ফযিলতের (দৈনন্দিন-সাপ্তাহিক-মাসিক-বাৎসরিক শিরোনামে) সমাহার ঘটিয়েছেন।এবং যথাসাধ্য দলিল ও তাহকীক সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে সংকলকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার সার্থক ফসল।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দো'আ করি, তিনি যেন গ্রন্থখানা কবুল করেন। লেখকের নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করেন। এবং উলামা ও ত্বলাবা, সর্বসাধারণের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা দান করেন। আমীন।

হাফেজ মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক: জামি'আ উসমানিয়া দারুল উলুম তালতলা মাদরাসা।

ভূমিকা

حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। হৃদয়ের গহীন থেকে অসংখ্য অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শাফেয়ুল মুজনিবীন সর্দারে দো-আলম মুহাম্মাদ সা্ঃ এর উপর। এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামগণের উপর।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আর যে আমার স্মরণ হতে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয়ই তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত, এবং তাকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করব অন্ধ অবস্থায়।[1]

ব্যাখ্যাঃ আর যারা আমার হুকুমের বিরোধিতা করবে, আমার রাসূলদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করবে এবং অন্য পথে চলবে, তারা দুনিয়ায় সংকীর্ণ অবস্থায় থাকবে। তারা প্রশান্তি ও সচ্ছলতা লাভ করবে না। নিজেদের গুমরাহীর কারণে সংকীর্ণ অবস্থায় কালাতিপাত করবে। যদিও বাহ্যতঃ পানাহার ও পরিধানের ব্যাপারে প্রশস্ততা পরিদৃষ্ট হবে, কিন্তু অন্তরে ঈমান ও হিদায়াত না থাকার কারণে সদা সর্বদা সন্দেহ, সংশয়, সংকীর্ণতা এবং স্বল্পতার মধ্যেই জড়িয়ে পড়বে। তারা হবে হতভাগা, আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত এবং কল্যাণশূণ্য। কেননা মহান আল্লাহর উপর তারা ঈমানহীন। তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসহীন, মৃত্যুর পর তাঁর নি’আমতের মধ্যে তাদের কোন অংশ নেই। এবং তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠানো

---

[1] সূরা ত্ব-হা ২০: ১২৪ ।

হবে। হযরত ইকরিমা রহ. বলেন, জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু তার নযরে পড়বেনা।[2]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম।[3] সে বলবে হে আমার রব্ব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো ছিলাম চক্ষুষ্মান। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ এরূপ'ই আমার আয়াতসমূহ তোমার নিকট এসেছিলো, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।[4]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আজকে আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল।[5] সুতরাং এটা তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল।

যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীমের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং এর হুকুম অনুযায়ী আমলও করে, কিন্তু যদি কুরআনের শব্দ ভুলে যায় তাহলে সে এই প্রতিশ্রুত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তার জন্য অন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করার পর তা অলসতাবশত ভুলে যায় তার জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ: করা হয়েছে।[6]

---

[2] তাফসীরে ইবনে কাসীর পৃ.২৯৮, সূরা ত্বা-হা ১২৪ নং আয়াত দ্রঃ।

[3] সূরা ইসরা ১৭: ৯৭।

[4] সূরা ত্ব-হা ২০: ১২৫।

[5] সূরা আ'রাফ ৭: ৫১।

[6] তাফসীরে ইবনে কাসীর সূরা ত্বা-হার ১২৪ নং আয়াত দ্রঃ। (উপরোক্ত কয়েকটি ব্যখ্যা)।

আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো যিকির।

এ প্রসঙ্গে আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সা্ঃ বলেনঃ আমি কি তোমাদের আমলসমূহের সর্বোত্তমটি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, তোমাদের সোনা-রূপা দান করার চেয়ে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের শত্রুদের হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম? সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি কী? তিনি বলেনঃ আল্লাহর যিকির। মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, কোন মানুষের জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন আমল নাই, যা তাকে মহামহিম আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে।[7]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, হুজুরে আকরাম সা্ঃ এরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّه" وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّه" مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সা্ঃ বলেছেনঃ যে তাঁর প্রতিপালকের যিক্‌র করে, আর যে যিক্‌র করে না, তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তি।[8]

সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমলের কোন বিকল্প নেই। আমল করার দ্বারা আবদের আবদিয়্যাত, বান্দার বন্দেগী, ও দাসের দাসত্বের প্রমাণ বহন করে। যার মাধ্যমে খালেকের সাথে মাখলুকের, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মুহাব্বাতের সেতুবন্ধন তৈরি হয়। এই জন্য একজন বুদ্ধিমান মুমিনের কাজ হলো, আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্যের মধ্যে নিজ হায়াতকে বিসর্জন দেয়া।

[7] ইবনু মাজাহ হা. ৩৭৯০, তিরমিজি হা. ৩৩৭৭।

[8] বুখারী হা. ৬৪০৭, মুসলিম ৬/২৯, হা. ৭৭৯, ই. ফা. হা. ৫৮৫২।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ জ্ঞানী/বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় নফসকে অনুগত করে নেয় (নিয়ন্ত্রণে রেখেছে) এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে। আর ঐ ব্যক্তি নির্বোধ ও অক্ষম, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে (নফসের কথা মতো চলে) এবং আল্লাহর ওপর (মুক্তি লাভের) আশা করে বসে থাকে।[9]

সুতরাং উল্লিখিত কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা এ কথাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা’আলার স্মরণ ছাড়া তার রহমত পাওয়া, দিদার পাওয়া দুষ্প্রাপ্য। আর তাকে স্মরণ করার একমাত্র মাধ্যম তার যিকির। নিম্নে ৪টি অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর পূর্ণ ৬৩ বৎসরের আমলী (যিকরি) যিন্দেগীকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ এর আমলী জিন্দেগী দুই ভাবে প্রমাণিত। এক হলো, ক্বাওলী (মৌখিক যিকির-আযকার, দো‘আ ইত্যাদি)।

দ্বিতীয়: ফেয়েলী (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যিকির-আযকার, হাত তুলে দো‘আ, নামাজ ইত্যাদি)।

প্রথম বিষয়ে (মৌখিক যিকির-আযকার) কুরআন সুন্নাহে বেশি আলোচনা পাওয়া যায়।

উক্ত বইয়ে আমল সহজ করণার্থে রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর পুরো আমলী যিন্দেগীকে সম্পূর্ণ কুরআন হাদীস থেকে দালিলিক চার অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে তথা রাসূল সা্ঃ দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কোন ধরনের আমল করতেন?

[9] তিরমিজি হা. ২৪৫৯, ইবনে মাজাহ হা. ৪২৬০, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭১২৩।

✓**প্রথম অধ্যায়ঃ উচ্চারণসহ দৈনন্দিন আমল ও তার ফযীলত**
✓**দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাপ্তাহিক আমল ও তার ফযীলত**
✓**তৃতীয় অধ্যায়ঃ মাসিক আমল ও তার ফযীলত**
✓**চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাৎসরিক আমল ও তার ফযীলত**

উক্ত বইয়ে মোটামোটি তাৎপর্যপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ অনেকগুলো আমলের আলোচনা করা হয়েছে। যদিও সকল আমল একসাথে করা সম্ভব না। তবে কিছু আমল প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনে ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে করা চাই। হোক তা পরিমাণে সামান্য। কারণ আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয় যা সর্বদা করা হয়। যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সাঃ কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় 'আমাল কি? তিনি বললেনঃ যে 'আমাল সদা-সর্বদা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা অল্প হয়। তিনি আরও বললেন, তোমরা সাধ্যের অধিক কাজ নিজের উপর চাপিয়ে নিও না।[10]

বি:দ্র: ব্যাপক একটি আলোচনা এই ছোট পুস্তিকায় করা সহজলভ্য বিষয় নয়। তাই চেষ্টা করা হয়েছে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনায় নিয়ে আসার।

---

[10] বুখারী, হা. ৬৪৬৫, ই.ফা. ৬০২১।

অধম একমাত্র আসাতেজায়ে কেরামের নেক নজরের উসিলায়. বিশেষভাবে প্রাণাধিক প্রিয় আধ্যাত্মিক রাহবার, উস্তাজুল আসাতিজা, শায়খুল হাদীস, আল্লামা মুফতী ফয়জুল্লাহ কাসেমী (মুহতামিম জামেয়া রশীদিয়া) দা.বা., আকাবীরে দেওবন্দের উজ্জল নক্ষত্র, উস্তাজুল আসাতিজা, শায়খুল হাদীস, আল্লামা মুফতী তৈয়ব কাসেমী রহ. ("শায়খে সানী" মারকাযুশ শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকা) এবং প্রিয় উস্তাজে মুহতারাম মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, চিন্তক মুনাযেরে যমান আল্লামা মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী দা.বা., যার তত্ত্বাবধানে অধম পাপী বান্দার হাতে "কোরআন হাদীসের আলোকে বছরব্যাপী করণীয় ও বর্জনীয়" নামে আমলী বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

অধম তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, যারা অধমকে নূরানী, হিফজুল কোরআন, উর্দূ বিভাগ থেকে নিয়ে ইফতা পর্যন্ত দীর্ঘ একটি সময় আর্থিক সহযোগিতা করে, কখনও বুদ্ধি দিয়ে, কখনও দায়িত্বের মাধ্যমে পাশে থেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার সু-ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রিয় মা ও মেজো ভাইয়ের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

বইটি আলাদা আলাদা চার অধ্যায়ে লিখা হয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, আমল প্রসঙ্গে বই লিখার জন্য নিজে একজন খাঁটি আমলী হতে হয়। কিন্তু অধম ঐ ব্যক্তিদের কাতারে না হওয়া সত্ত্বেও আমল প্রসঙ্গে বই লিখার কারণ হল, আমলকারীদের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা। আল্লাহ তা'আলা যেনো কিয়ামতের দিন এই মুখলিস খোদাভীরু আমেলদের কাতারে শামিল করেন, এই আকাঙ্ক্ষায় বইটির কাজ শুরু করেছি। আলহামদুলিল্লাহ সম্পূর্ণও হয়েছে।

অধম যেহেতু এই ময়দানে একেবারেই নতুন, তাই পুস্তিকাতে কোন প্রকারের ভুলভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে জানিয়ে বাধিত করবেন। চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। অগ্রিম জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

প্রিয় আমল পিপাসু পাঠকবৃন্দ! আপনার আমার সকলের সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি আমাদেরকে একটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যা তিনি কুরআনে কারীমে এরশাদ করেছেন, আমি মানব ও জীন-জাতিকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে। তারা যেন সন্তুষ্ট চিত্তে অথবা বাধ্য হয়ে আমাকে প্রকৃত মাবুদ মেনে নেয়।
তাই দুনিয়ার মায়ায় না পড়ে, চিরস্থায়ী যিন্দেগীকে সামনে রেখে, সুন্নাহ পদ্ধতিতে বেশি বেশি নেক আমল করা উচিত । আল্লাহ তা'আলা লেখক ও পাঠকবৃন্দকে আমল করার তাওফিক দান করুক। এবং পুস্তিকাটিকে অধমের সমস্ত আসাতেজা ও পুরো পরিবারের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

১৪/০৯/২০২২ইং বুধবার।
১৭/০২/১৪৪৪ হিজরী।
বান্দাহ মুহাম্মাদ শাহাদাত হুসাইন

Quran $ hadither Aloke bosor bapi koroniyo $ borjonio, Compiled by- Shahadat Hossain Forazi, Khatib: rowshon Ali Munshi bari, ChhagalNaiya, Feni,
Senior Teacher: Jamea Usmaniya Darul Ulim Taltola Madrasha, Munshikhola, Dhaka

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দৈনন্দিন আমলসমূহ:

❖ ঘুমানোর পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ একাধিক দো'আ ও যিকির-আযকার/২৫
❖ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ যিকির-আযকার/৩১
❖ বাসা বাড়ী থেকে বের হওয়ার ফযীলতপূর্ণ দো'আ/৩২
❖ বাজারে প্রবেশকালের ফযীলতপূর্ণ দো'আ/৩৩
❖ পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ দো'আ ও যিকির-আযকার/৩৩
❖ ইস্তেগফার, তাসবীহে ফাতেমী, সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ গুনাহ মাফের আমল, আসমান-যমিনের মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়াসহ একাধিক ফযীলতপূর্ণ আমল।
❖ আয়াতুল কুরসীর বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত/৩৭
❖ সকাল-সন্ধার গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ আমল/৪৭
❖ ঋণগ্রস্থদের জন্য কার্যকরি আমল ও নিষ্কৃতি/৪৯
❖ বিপদাপদে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল ও নিষ্কৃতি/৬০
❖ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় কার্যকরি আমল ও নিরাময়/৬১
❖ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহের গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত/৬৪
❖ অজুর ফযীলত/৬৬
❖ অজুর শেষে দো'আর ফযীলত/৬৮
❖ মসজিদে বসে থাকার ফযীলত/৬৮
❖ আজান দেওয়ার ফযীলত/৬৯
❖ প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ের ফযীলত/৬৯

❖ জামাতে নামাজ আদায়ের ফযীলত /৭০
❖ পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায আদায়ের ফযীলত/৭১
❖ সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলার ফযীলত/৭৩
❖ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু বলার ফযীলত/৭৪
❖ নামাযের রুকুর ফযীলত/৭৪
❖ নামাযের সিজদার ফযীলত/৭৪
❖ ফজরের নামাযের ফযীলত/৭৫
❖ ইশারের নামাজ আদায়ের ফযীলত/৮০
❖ জানাযার নামায আদায়ের ফযীলত/৮১
❖ সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামায আদায়ের ফযীলত/৮২
❖ সুন্নতে যায়েদা ও নফল নামায আদায়ের ফযীলত/৮৩
❖ তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ফযীলত/৮৪
❖ ইশরাকের নামায আদায়ের ফযীলত/৮৬
❖ চাশতের নামায আদায়ের ফযীলত/৮৭
❖ তাহিয়্যাতুল অজু ও নামাযের ফযীলত/৮৮
❖ মাগরিবের পর ছয় রাকাত নফল নামায আদায়ের ফযীলত/৯০
❖ সালাতুত তাসবীহের নামায আদায়ের ফযীলত/৯০
❖ সালাতুল হাজত আদায়ের গুরুত্ব ও পদ্ধতি/৯১
❖ সালাতুল ইস্তিখারার নামাযের গুরুত্ব ও ফলাফল/৯৩
❖ কোন নামাযের পর কোন সূরা তিলাওয়াত করতে হয় এবং ফযীলত কি?/৯৮
❖ দৈনন্দিন কোরআন তেলোওয়াতের ফযীলত/১০৪
❖ দৈনন্দিন সদকার ফযীলত/১০৮
❖ দৈনন্দিন ইস্তেগফারের গুরুত্ব ও ফযীলত/১১৩
❖ দৈনন্দিন মিসওয়াক করার গুরুত্ব ও ফযীলত/১১৭
❖ দৈনন্দিন সালামের গুরুত্ব ও ফযীলত/ ১১৮
❖ দৈনন্দিন দরুদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত/১২১
❖ শুক্রবার দরুদ পাঠের ফযীলত/১২৫
❖ দৈনন্দিন পাগড়ি পরিধানের গুরুত্ব ও ফযীলত/১২৫
❖ বদ নজর থেকে রক্ষার কার্যকরি আমল/১২৯

❖ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কার্যকরি আমল/১৩৩
❖ দৈনন্দিন বর্জনীয় বিষয়/১৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাপ্তাহিক আমলসমূহ

❖ সাত দিনের নামগুলোর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ /১৩৬
❖ সাপ্তাহিক আমল ও তার ফযীলত /১৩৭
❖ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের আমল ও তার ফযীলত /১৩৭
❖ শুক্রবারের গুরুত্বপূর্ণ আমল ও তার ফযীলত/১৩৯
❖ সালাতুত তাসবীহের নামায আদায়ের পদ্ধতি ও তার ফযীলত/১৫০

তৃতীয় অধ্যায়

মাসিক আমলসমূহ

❖ ইংরেজি মাস ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/১৫৩
❖ হিজরী সন গণনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/১৫৪
❖ চান্দ্র মাস ও নামকরণ/১৫৪

❖ **মুহাররাম মাস:** /১৫৭
❖ মুহাররাম মাসের মর্যাদা ও ফযীলত/১৫৮
❖ এই মাস বিষয়ে প্রচলিত জাল ফযীলত/১৬০
❖ করণীয় আমল/১৬৩
❖ বেশি বেশি তাওবা করা /১৬৩
❖ রোজা রাখা/১৬৪
❖ আশুরার তাৎপর্য /১৬৫
❖ সাধ্যানুপাতে ভালো খাবারের আয়োজন করা/১৬৫
❖ বর্জনীয় আমল/১৬৭

❖ **সফর মাস:** /১৭০
❖ শিয়াদের পরিচয়/১৭১
❖ এ মাস সম্পর্কিত শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা সমূহ /১৭১
❖ এ মাস কেন্দ্রিক শিয়াদের উদ্ভট আমল সমুহ ও পর্যালোচনা/১৭৪
❖ আখেরী চাহার শোম্বা ও পর্যালোচনা/১৭৭
❖ শিয়াদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা/১৭৮

❖ **রবিউল আউওয়াল মাস/১৮০**
❖ রবিউল আউওয়াল মাসের ফযীলত /১৮০
❖ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ কে প্রেরণের কারণ এবং প্রেক্ষাপটঃ/১৮০
❖ রবিউল আউয়াল মাসের শিক্ষা/১৮২
❖ রাসূল সা্ঃ এর জন্মের সময়কার আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী ও তার শিক্ষা /১৮২
❖ রাসূল সা্ঃ এর জন্মের পর প্রকাশিত হওয়া বারাকাত সমূহঃ/১৮৩
❖ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর আগমনকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কোন দিবসে খুশি উদযাপন করা যাবে কি?/১৮৪
❖ নির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিকের মত/১৮৫
❖ রাসূল সা্ঃ এর আগমণ কিভাবে উদযাপন করা উচিৎ/১৯৬
❖ বর্তমানে প্রচলিত সিস্টেমে রাসূল সা্ঃ এর আগমনকে উদ্দেশ্য করে খুশি উদযাপন করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত/১৯৮
❖ করণীয় আমল/২০০
❖ বর্জনীয় আমল/২০১

❖ **রবীউস সানী মাস/২০২**
❖ এমাস কেন্দ্রিক উদ্ভট কিছু আমল ও পর্যালোচনা/২০২
❖ এ মাস কেন্দ্রিক শিয়াদের আমল সমূহ ও পর্যালোচনা
❖ ফাতিহা ইয়াযদাহম /২০৭
❖ ইসলামে জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান/২০৭
❖ জন্ম দিবস পালনের ইতিহাস/২১১
❖ কবর জিয়ারত করার সুন্নত তরিকাহ কি?/২১৪

❖ সাওয়াব রেসানীর ভুল পদ্ধতি/২১৭

❖ **জুমাদাল উলা মাস: /২১৮**

❖ **জুমাদাল উখরা মাস:/ ২১৮**

❖ জয়ীফ হাদিস সম্পর্কে কিছু কথা /২১৯

❖ জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার হুকুম কী ? /২১৯

❖ **রজব মাস**:/২২৪

❖ রজব মাসের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়/২২৮

❖ করণীয় আমল/২২৬

❖ রজবে প্রবেশের দু‘আ/২২৭

❖ রজবের প্রথম রাতে দু‘আ কবুল হয়/২২৮

❖ বর্জনীয় আমল: /২২৯

❖ রজব মাসকে কেন্দ্র করে কতিপয় নতুন আবিষ্কৃত আমল বিদ‘আত/২২৯

❖ সালাতুর রাগায়েব আদায় করা ও পর্যালোচনা/২২৯

❖ রোজা রাখা ও পর্যালোচনা/২৩১

❖ ওমরা করা ও পর্যালোচনা/২৩৩

❖ যাকাত দেওয়া ও পর্যালোচনা/২৩৩

❖ রজব মাসের ২৭ তারিখ রজনীকে লাইলাতুল মিরাজ মনে করে জমায়েত হওয়া এবং মাহফিল করা ও এপ্রসঙ্গে পর্যালোচনা/২৩৪

❖ মেরাজের ঘটনা থেকে অর্জনের বিষয়/২৩৫

❖ পশু জবাই করা ও পর্যালোচনা/২৩৬

❖ **শাবান মাস**/২৩৯

❖ শাবান মাসের ফযীলত /২৩৯

❖ শাবান মাসের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ আমল/২৪০

❖ শবে বারাআত’ কাকে বলে? ও পর্যালোচনা/২৪০

❖ **করণীয় আমল** /২৪৫

❖ শবে বারাআতের ফযীলত ও পর্যালোচনা/২৪৫

❖ এই রাতে যাদের দো‘আ কবুল হয় না/২৫০

❖ **বর্জণীয় আমল**/২৫১

❖ **রমাদ্বান মাস**/২৫২
❖ রমাদ্বান মাসের ফযীলত/২৫৩
❖ করণীয় আমল/২৫৫
❖ কুরআন তিলাওয়াত করা/২৫৫
❖ আকাবিরদের জীবনী থেকে রমজানুল মোবারকে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব/২৫৬
❖ রোযা রাখা/২৫৭
❖ রোযার হুকুম/২৫৭
❖ রোযার ফযীলত/২৫৮
❖ দু'আ করা /২৬২
❖ বর্জনীয় বিষয়/ ২৬২
❖ রোযা অবস্থায় যে সকল কাজ করলে রোজা ভাঙ্গে না/২৬৫
❖ রোযা অবস্থায় যে সকল কাজ মাকরূহ। তবে এতে রোযা নষ্ট হয় না/২৭০

❖ **শাওয়াল মাস/২৭০**
❖ করণীয় আমল/২৭০
❖ ঈদুল ফিতরের দিন পূর্বের ও পরের করণীয় বিষয়/২৭০
❖ ঈদুল ফিতরের দিনের করণীয় আমল/২৭১
❖ সদকাতুল ফিতরের পরিচয়/২৭১
❖ সদকাতুল ফিতর আদায় করা/২৭১
❖ ঈদুল ফিতরের সুন্নাত সমূহ/২৭২
❖ শাওয়ালের ৬ রোযা/২৭৪
❖ হজ্জের প্রস্তুতি গ্রহণ/২৭৬

❖ **যুলকদ মাস**/২৭৭
❖ জুলহিজ্জাহ মাসের চাঁদ উদয়ের পূর্বেই নখ, চুল, শরীরের অবাঞ্চিত পশম কেটে ফেলার ফযীলত /২৭৭

❖ **জুলহিজ্জাহ মাস**/২৭৯
❖ কুরআন হাদিসের আলোকে জুলহিজ্জাহ মাসের গুরুত্ব/২৭৯
❖ হজ্জের ফযীলত/২৮০
❖ করণীয় আমল/২৮৩
❖ বেশি বেশি তাসবীহ, তাহলীল, যিকির-আযকার করা/২৮৫
❖ আরাফার রোযা রাখা /২৮৫
❖ তাকবীরে তাশরীক/২৮৭
❖ দশ'ই জুলহিজ্জাহ ঈদের দিনের করণীয় আমল/২৮৭
❖ ঈদুল আযহার দিনের সুন্নত সমূহ/২৮৭
❖ দশ, এগারো, বারো'ই জুলহিজ্জাহ সামর্থ্যবান নর-নারী নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা/২৮৯
❖ কুরবানী করার ফযিলত/২৯০
❖ কোরবানী না করার উপর ধমকি/২৯১
❖ ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা/২৯২
❖ বর্জনীয় আমল/২৯৩
❖ পুরো বারো মাসেই করণীয় আমল/২৯৪
❖ পুরো বারো মাসেই বর্জনীয় আমল/২৯৫

চতুর্থ অধ্যায়

বাৎসরিক আমল

❖ **দিন আর বছর গণনার পটভূমি:/** ২৯৮
❖ হিজরীসন গণনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/২৯৯
❖ **বাৎসরিক করণীয় আমল:**/৩০২
❖ রমাদ্বান মাসের রোজা রাখা /৩০২
❖ হজ্জ পালন করা/৩০২
❖ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করলে তার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর বাণী/৩০৩
❖ যাকাত আদায় করা/৩০৪
❖ যাকাত আদায়ের ফযীলত/৩০৬

❖ যাদের উপর যাকাত ফরয/৩০৭
❖ যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়/৩০৭
❖ যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে/৩০৮
❖ শবে কদর অন্বেষণ করা/৩০৯
❖ শবে কদর চেনার আলামত/৩১৩
❖ শবে কদর পেয়েছে মনে হলে কোন দো'আ পড়বে? /৩১৩
❖ শবে ক্বদরের বর্জনীয় বিষয় /৩১৪
❖ ঈদের দুই রাত্রি /৩১৬
❖ পুরো বৎসরে ৫টি রাত জাগ্রত থেকে আমল করা প্রাসঙ্গে/৩২১
❖ শবে বারাআত পালন করা/৩২২
❖ শবে বারাআতের ফযীলত/৩২২
❖ বাৎসরিক বর্জনীয় আমল/৩২৩
❖ পুরো বৎসর পাঁচদিন রোজা রাখা হারাম/৩২৩

প্রথম অধ্যায়ঃ

দৈনন্দিন আমল

সকাল-সন্ধ্যার আমল

ঘুমানোর পূর্বের দো'আ ও যিকির-আযকার:

শয়নের পূর্বে যা আমল করতে হয়।

ক- দু'আ-: (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ)

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহাল আজিমাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুমু ওয়াআতুবু ইলাইহি। (ঘুমানোর পূর্বে ৩বার)

ফযীলত: হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ কোন লোক (শোয়ার জন্য) বিছানাগত হয়ে তিনবার বলেঃ "আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফের আবেদন করি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, এবং তাঁর নিকট তাওবা করি", আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমতুল্য হয়ে থাকে, যদিও তা গাছের পাতার মত অসংখ্য হয়, যদিও তা টিলার বালিরাশির সমান হয়, যদিও তা দুনিয়ার দিনসমূহের সমসংখ্যক হয়।[11]

[11] তিরমিজি, হা. ৩৩৯৭, আল-কালিমুত-তায়্যিব, পৃ.৩৯, তা'লীকুর রাগীব ১/২১১।

খ- দু‘আ-:

(بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)

উচ্চারণ: বিসমিকা রাব্বী ওয়াদা ‘তু জানবী, ওয়াবিকা আরফা’উহু, ফাইন আমসাকতা নাফসী, ফারহামহা, ওয়াইন আরসালতাহা ফাহফাজহা, বিমা তাহফাজুবিহী ইবাদাকাস সালেহীন। (ঘুমানোর পূর্বে ১বার)

ফযীলত: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ তার বিছানা হতে উঠার পর আবার বিছানায় প্রত্যাবর্তন করলে সে যেন তার লুঙ্গীর শেষাংশ দিয়ে বিছানাটি তিনবার পরিষ্কার করে নেয়। কারণ সে জানে না, তার অনুপস্থিতিতে তাতে কি পতিত হয়েছে (ময়লা বা ক্ষতিকর কিছু)। আর যখন সে শুয়ে পড়ে সে সময় যেন বলেঃ (بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) “হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ আমি বিছানায় সোপর্দ করলাম এবং আবার তোমার নামেই তা উঠাব। যদি আমার জান তুমি রেখে দাও (মৃত্যু দান কর) তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তা সেভাবে প্রতিরক্ষা কর যেভাবে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রতিরক্ষা কর"।[12]

গ- দু‘আ-: (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

উচ্চারণ: সূরা ইখলাস,সূরা ফালাক,সূরা নাস, এই তিনটি সূরা সম্পূর্ণ ১বার পাঠ করা।

[12] তিরমিজি, হা. ৩৪০১, আল-কালিমুত তাইয়্যিব, পৃ. ৩৪।

ফযীলত: আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা; প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, সে সময় "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরব্বিন নাস" (সূরা তিনটি) পাঠ করে নিজের উভয় হাতের তালু একসাথে করে তাতে ফুঁ দিতেন, তারপর উভয় হাত যথাসম্ভব সারা শরীরে মুছে দিতেন। তিনি মাথা, চেহারা ও দেহের সম্মুখের অংশ হতে আরম্ভ করতেন। তিনি তিনবার এরূপ করতেন।[13]

ঘ- দু'আ-: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

উচ্চারণ: সূরা কাফিরুন সম্পূর্ণ সূরা ১বার পাঠ করা।

ফযীলত: ফরওয়াহ ইবনু নাওফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি নবী সা; এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি বিছানায় যাওয়ার সময় পড়তে পারি। তিনি বললেনঃ তুমি "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন" সূরাটি তিলাওয়াত কর। কারণ তা শিরক হতে মুক্তির ঘোষণা।[14]

ঙ- দু'আ-: (سبحان الله – الحمد لله – الله أكبر)

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার।

ফযীলত: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা; বলেছেনঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। জেনে রাখ!

---

[13] বুখারী, হা. ৫০১৭, তিরমিজি, হা. ৩৪০২।

[14] তিরমিজি, হা. ৩৪০৩, তা'লীকুর রাগীব ১/২০৯।

উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করা সহজ। সে অনুসারে অনেক অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তা 'আমল করে থাকে।

(এক) প্রতি ওয়াক্তের (ফরয) নামাযের পর দশবার 'সুবহানাল্লাহ', দশবার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' ও দশবার 'আল্লাহু আক্‌বার' বলবে। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা্ঃ কে আমি নামাযের পর স্বীয় হস্তে গণনা করতে দেখেছি। তারপর রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেনঃ (পাঁচ ওয়াক্তে) মুখের উচ্চারণে একশত পঞ্চাশবার এবং মীযানে (দাঁড়িপাল্লায়) দেড় হাজার হবে।
(দুই) আর (ঘুমাইতে) শয্যা গ্রহণকালে তুমি 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আক্‌বার' ও 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' একশত বার বলবে, ফলে তা মীযানে এক হাজারে রূপান্তর হবে। তোমাদের মাঝে কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচশত গুনাহে লিপ্ত হয়? (অর্থাৎ এতগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হবে)। সাহাবীগণ বলেন, কোন ব্যক্তি সব সময় এরূপ একটি 'ইবাদাত কেন করবে না! রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেনঃ তোমাদের কেউ নামাযে অবস্থানরত থাকাকালে তার কাছে শয়তান এসে বলতে থাকে, এটা মনে কর ওটা মনে কর। ফলে সেই নামাযী (শয়তানের ধোঁকাবাজির মাঝেই রত থাকা অবস্থায়) নামায শেষ করে। আর উক্ত তাস্‌বীহ 'আমল করার সে সুযোগ পায় না। পুনরায় তোমাদের কেউ শোয়ার জন্য শয্যা গ্রহণ করলে শয়তান তার নিকট এসে তাকে ঘুম পাড়ায় এবং সে তাসবীহ না পাঠ করেই ঘুমিয়ে পড়ে।[15]

[15] বুখারী, হা. ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিজি, হা. ৩৪১০, ইবনু মাজাহ, হা. ৯২৬।

চ- দু‘আ-: (اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া-আহয়া। নিদ্রা যাওয়ার সময় ১বার।

ফযীলত: হযরত হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ যখন রাসূলুল্লাহ সা্ঃ নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন : "হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি ও জীবন লাভ করি"। (ঘুমানোর সময় ১বার)।[16]

অপর হাদিসে আসছে, ঘুম ও মরণ ভাই ভাই।

ছ- ঘুমানোর সময় অজু-:

البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي/ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ " فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ: لاَ، «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»

বারা’ ইবনে আযিব)রাযিঃ (থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সা্ঃ আমাকে বললেনঃ যখন তুমি শোয়ার বিছানায় যেতে চাও, তখন তুমি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে। এরপর ডানপাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। আর এ দু‘আ পড়বে, "হে আল্লাহ !আমি আমার চেহারাকে) অর্থাৎ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে (তোমার কাছে সঁপে দিলাম। এবং আমার সকল বিষয় তোমারই নিকট সমর্পন করলাম এবং আমার পিঠখানা তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। আমি তোমার গযবের ভয়ে ভীত ও তোমার রহমতের আশায়

---

[16] তিরমিজি, হা. ৩৪১৭, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৮৮০।

আশান্বিত। তোমার নিকট ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই মুক্তি পাওয়ার স্থান। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ, আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তুমি যে নবী পাঠিয়েছ আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি। "যদি এ রাতেই তোমার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে তোমার মওত স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরই হবে। অতএব, তোমার এ দু'আ যেন তোমার রাতের সর্বশেষ কথা হয়।[17]

অন্য বর্ণনায় আসছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা্ঃ ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা তোমাদের দেহগুলোকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করুন। যদি কোনো বান্দা অজু অবস্থায় ঘুমায় তাহলে তার পোশাকের মধ্যে একজন ফেরেশতা শুয়ে থাকেন। রাতে যখনই এ ব্যক্তি নড়াচড়া করে তখনই এ ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ আপনি এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ সে অজু অবস্থায় ঘুমিয়েছে।'[18]

অপর বর্ণনায় আসছে, মু'আয ইবনে জাবাল রাযিঃ নবী করীম সা্ঃ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ যে মুসলমান রাতে পবিত্র অবস্থায় যিক্‌র করতে করতে শোয়, এরপর ঘুম ভেঙে গেলে সে আল্লাহর কাছে দুআ করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য, তখন আল্লাহ তাকে তা দান করেন।[19]

পাশাপাশি বর্ণনায় পাওয়া যায়,

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা্ঃ আমাকে বলেছিলেন, 'হে আমার বেটা! সম্ভব হলে সবসময় অজু অবস্থায় থাকবে।

---

[17] বুখারী, হা. ৬৩১১।

[18] সহিহ ইবনে হিব্বান :৩/৩২৮।

[19] আবু দাউদ ,হা .৫০৪২।

কেননা মৃত্যুর ফেরেশতা অজু অবস্থায় যার জান কবজ করেন তার শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হয়।’[20]

জ- ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুলুক ও সূরা সিজদাহ তিলাওয়াত করা।

বিস্তারিত আলোচনা ‘‘কোন নামাজের পর কোন সূরা পড়তে হয়’’ এই শিরোনামে আসবে।

২- ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের দো'আ ও যিকির-আযকার:

ক- দু‘আ-: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আহয়ানা (অথবা আহয়া নফসী) বা-দা,মা আমাতানা, ওয়া ইলাইহিন নুশুর। (ঘুম হতে জাগ্রত হলে ১বার)।

ফযীলত: হযরত হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: রাসূলুল্লাহ সা্ঃ ঘুম হতে উঠে বলতেন : "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি মৃত্যুদানের পর আমার এ দেহকে পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে"।[21]

খ- দু‘আ-: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ)

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী ‘আফা-নী, ফী জাসাদী, ওয়ারাদ্দা ‘আলাইয়া রুহী, ওয়াআযিনালী বিযিকরিহী। (ঘুম থেকে জাগ্রত হলে ১বার)

---

[20] শুয়াবুল ঈমান, (বায়হাকি (হা .২৭৮৩।

[21] তিরমিজি, হা. ৩৪১৭, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৮৮০।

অর্থ: "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমার দেহকে হিফাযত করেছেন এবং আমার জান আবার আমাকে ফেরত দিয়েছেন এবং তাকে স্মরণ করারও অনুমতি (তাওফিক) দান করেছেন।[22]

দো'আদ্বয়ের মাধ্যমে দিনের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় হয়। আর আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো, যারা নে'আমতের শুকরিয়া আদায় করে আমি তাদেরকে বারাকাত দান করি।[23] সুতরাং পুরোদিন আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাত অর্জনের জন্য উক্ত দো'আ দ্বয়ের বিকল্প নেই।

বাসা বাড়ী থেকে বের হওয়ার দো'আ

৩- দু'আ-: (بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ)

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ১বার।

ফযীলত: হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ ঘর হতে কেউ বাইরে রাওয়ানা হওয়াকালে যদি বলে, "আল্লাহ তা'আলার নামে, আল্লাহ তা'আলার উপরই আমি নির্ভর করলাম, আল্লাহ'তা আলার সাহায্য ব্যতীত বিরত থাকা ও মঙ্গল লাভ করার শক্তি কারো নেই", তবে তাকে বলা হয় (আল্লাহ তা'আলাই) তোমার জন্য যথেষ্ট, (অনিষ্ট হতে) তুমি হিফাযত অবলম্বন করেছ। আর তার হতে শয়তান দূরে সরে যায়।[24]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামুল্লাতে ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ

---

[22] তিরমিজি, হা. ৩৪০১, আল-কালিমুত তাইয়্যিব পৃ. ৩৪।

[23] সূরা ইব্রাহিম ১৪: ৭ আয়াত।

[24] তিরমিজি, হা. ৩৪২৬, আল-কালিমুত তাইয়্যিব পৃ. ৪৯/৫৮।

করবেনই।[25] (সুতরাং আমলকারী ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই আমল করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে নিরাপদেই আপন নীড়ে পৌছাবেন। ইনশাআল্লাহ)।

বাজারে প্রবেশকালের দো'আ:

৪- দু'আ-:

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, য়ুহয়ী ওয়ায়ুমীতু ওয়াহুওয়া হাইয়ুন লা-ইয়ামুতু, বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শায়`ইন ক্বাদীর।

ফযীলত: হযরত মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি মক্কায় পৌঁছালে আমার ভাই সালিম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তার বাবা হতে, তার দাদার সনদে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ যে লোক বাজারে প্রবেশ করে বলে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সকল ক্ষমতা তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনিই প্রাণ দান করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কক্ষনো মৃত্যুবরণ করবেন না, তাঁর হাতেই মঙ্গল এবং তিনিই সবসময় প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতার অধিকারি", তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলা **দশ লক্ষ নেকী**

[25] সূরা তালাক ৬৫: ৩ আয়াত।

বরাদ্দ করেন, তার **দশ লক্ষ গুনাহ** মাফ করেন এবং তার দশ লক্ষ গুণ সম্মান বৃদ্ধি করেন।[26]

পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পরের দো'আ ও যিকির-আযকার:

১- দু'আ-: (الِاسْتِغْفَارَ)

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহ।[27] (৩বার)।

ফযীলত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সবসময় ইস্তেগফার করে (ক্ষমা চায়), আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে বের হয়ে আসার পথ খুলে দেন এবং প্রত্যেক দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেন। আর তাকে এমন রিযক দান করেন, যা সে কখনো ভাবতেও পারেনি।[28]

২- দু'আ-: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবরাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। তুমি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও মহানুভব)। (১বার)।[29]

---

[26] তিরমিজি, হা. ৩৪২৮, ইবনু মাজাহ, হা. ২২৩৫।

[27] মুসলিম, হা. ৫৯১, তিরমিজি, হা. ৩০০, আবূ দাঊদ, হা. ১৫১২, আহমাদ, হা. ২১৯০২, দারিমী, হা. ১৩৪৮।

[28] আবূ দাঊদ, হা. ১৫১৮, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৮১৯, রিয়াযুস সলিহীন, হা. ১৮৮২, আহমাদ, হা. ২২৩৪, মু'জামুল কাবীর (লিত্ব ত্ববারানী) হা.১০৬৬৫, মুসতাদারাক হাকিম, হা. ৭৬৭৭, সুনানুল কুবরা, (বায়হাক্বী) হা. ৬৪২১।

[29] মুসলিম হা. ৫৯১, তিরমিযী হা. ৩০০, আবূ দাঊদ হা. ১৫১২, আহমাদ হা. ২১৯০২, দারিমী হা. ১৩৪৮।

ফযীলত: হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি রাসূলুল্লাহ সা ঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! যে যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, সে যাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।[30]

৩- দু‘আ-: (سبحان الله–الحمد لله–ألله أكبر)

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার।

ফযীলত: হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের শেষে তেত্রিশবার আল্লাহর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে, তেত্রিশবার আল্লাহর তামহীদ বা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তেত্রিশবার তাকবীর বা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করবে আর এভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে-“লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া ‘আলা-কুল্লি শাই`য়িন ক্বদীর” (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।

[30] তিরমিজি, হা. ৩৫৪০, রিয়াদুস সলেহিন, হা. ৪৪৭।

তিনি সবকিছু করতে সক্ষম-তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হলেও ক্ষমা করে দেয়া হয়।[31]

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়:
আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারি হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে, যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে, যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত মাল আছে, ফলে তারা হজ্জ করছে, উমরাহ করছে, জিহাদ করছে ও সাদকাহ করছে, (আর আমরা করতে পারছি না)।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস (আমল) শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।)' তিনি বললেন, "প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।"

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী আবু সালেহ বলেন, 'কিভাবে পাঠ করতে হবে, তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। যেন প্রত্যেকটি বাক্য ৩৩ বার করে

[31] মুসলিম, হা. ১২৩৯, ই.ফা. ১২২৮।

হয়। (এছাড়াও আরো অনেক ফযীলত হাদিসের কিতাব সমূহে পাওয়া যায়)।[32]

পাশাপাশি বর্ণনায় আসছে:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। জেনে রাখ! উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করা সহজ। সে অনুসারে অনেক অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তা 'আমল করে থাকে। (এক) প্রতি ওয়াক্তের (ফরয) নামাযের পর দশবার 'সুবহানাল্লাহ', দশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও দশবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা্ঃ কে আমি নামাযের পর স্বীয় হস্তে গণনা করতে দেখেছি। তারপর রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেনঃ (পাঁচ ওয়াক্তে) মুখের উচ্চারণে একশত পঞ্চাশবার এবং মীযানে (দাঁড়িপাল্লায়) দেড় হাজার হবে।

(দুই) আর (ঘুমাতে) শয্যা গ্রহণকালে তুমি 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' একশত বার বলবে, ফলে তা মীযানে এক হাজারে রূপান্তর হবে। তোমাদের মাঝে কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচশত গুনাহে লিপ্ত হয়? (অর্থাৎ এতগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হবে)। সাহাবীগণ বলেন, কোন ব্যক্তি সব সময় এরূপ একটি 'ইবাদাত কেন করবে না! রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেনঃ তোমাদের কেউ নামাযে অবস্থানরত থাকাকালে তার কাছে শয়তান এসে বলতে থাকে, এটা মনে কর ওটা মনে কর। ফলে সেই নামাযী (শয়তানের ধোঁকাবাজির মাঝেই রত থাকা

---

[32] বুখারী, হা. ৮৪৩, মুসলিম, হা. ৫৯৫, আবূ দাউদ, হা.১৫০৪, আহমাদ, হা.৭২০২, দারেমী, হা.১৩৫৩, রিয়াদুস সলেহিন, হা.১৪২৬।

অবস্থায়) নামায় শেষ করে। আর উক্ত তাস্‌বীহ ‘আমল করার সে সুযোগ পায় না। পুনরায় তোমাদের কেউ শোয়ার জন্য শয্যা গ্রহণ করলে শাইতান তার নিকট এসে তাকে ঘুম পাড়ায় এবং সে তাসবীহ না পাঠ করেই ঘুমিয়ে পড়ে।[33]

৪- দু‘আ-:

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدّ)

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা-মানি‘আ, লিমা ‘আতাইতা, ওয়ালা মু’তিয়া লিমা মানা’তা, ওয়ালা য়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দ। (উক্ত দো‘আর প্রথম অংশ পৃথক ভাবেও অনেক বর্ণনায় পাওয়া যায়)

ফযীলত: হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ “লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়্যিন কদীর।” অর্থাৎ- ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই; তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা; তিনিই সব বিষয়ের উপর শক্তিধর’- যে লোক এ দু‘আ প্রতিদিনে একশ’ বার পাঠ করে সে দশজন গোলামমুক্ত করার পুণ্য অর্জন হয়, তাঁর (‘আমালনামায়) একশ’ নেকী লেখা হয় এবং তাঁর হতে একশ’ পাপ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর তা ঐ দিন বিকাল পর্যন্ত শয়তান (তার কুমন্ত্রণা) হতে তার জন্যে রক্ষাকারী হয়ে যায়। সেদিন সে

---

[33] তিরমিজি, হা. ৩৪১০, ইবনু মাজাহ, হা. ৯২৬।

যা পুণ্য অর্জন করেছে তার চেয়ে বেশি পুণ্যবান কেউ হবে না। তবে কেউ তার চাইতে বেশি 'আমাল করলে তার কথা আলাদা। আর যে লোক দিনে একশ' বার "সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবি হাম্দিহী"। অর্থাৎ- 'আমি আল্লাহর প্রশংসা সহ তার পরিবত্রতা বর্ণনা করছি' পাঠ করবে, তার সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে, যদি ও তা সমুদ্রের ফেনার সম পরিমাণ হয়।[34]

৫- দু'আ-:

(اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

উচ্চারণ: আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, লাতা'খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নাউম, লাহু মা-ফিস সামাওয়াতি ওয়ামাফিল আরদ, মান যাল্লাযি ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহু ইল্লা বি ইজনিহ, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা য়ুহীতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াসি'আ কুরসি' য়ুহুসসামাওয়াতি ওয়ালআরদ, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা, ওয়াহুওয়াল আলিইউল আজীম। (১বার)।

আয়াতুল কুরসীর শ্রেষ্ঠত্ব:

ইবনে কাসীর রহ. তার তাফসীরে লিখেছেনঃ কুরআন শরীফের মধ্যে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আয়াত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতের মর্যাদা সব আয়াতের চেয়ে উচ্চে।

[34] মুসলিম, হা. ৬৭৩৫, ই.ফা. ৬৫৯৮।

হযরত আবু যর (রা.) থেকে ধারাবাহিকভাবে উবাইদ ইবন খাশখাশ ...... আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, আবু যর জুনদুব ইবনে জানাদাহ ((রা.) বলেছেনঃ একদিন আমি নবী সা্ঃ এর কাছে আসলে তাঁকে মসজিদে বসা দেখতে পাই, আর আমিও গিয়ে তাঁর কাছে বসি, ... এরপর আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ সা্ঃ আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাযিল হয়েছে ?" রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বললেন, "আয়াতুল কুরসী।" ("...." এর পর পূর্ণ হাদিসটির শেষ অংশ উল্লেখ করা হয়েছে)

উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইবন রিবাহ ..... আহমাদ বর্ণনা করেছেনঃ একদিন উবাই ইবন কাব'কে নবী সা্ঃ জিজ্ঞেস করেন – কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ? তিনি বলেন – আল্লাহ ও তার রাসুল'ই সা্ঃ তা বেশী জানেন। রাসুলুল্লাহ সা্ঃ আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন – আয়াতুল কুরসী। এরপর রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেন – হে আবুল মানযার, তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার আত্মা, এটির একটি জিহবা ও দুটো ঠোঁট রয়েছে যা দিয়ে সে আরশের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করে।

আবু সালীল (রহ.) থেকে ধারাবাহিকভাবে উসমান ইবন ইতাব ...... আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, আবু সালীল বলেছেনঃ নবী সা্ঃ এর কোন এক সাহাবীর সাথে লোকজন কথা বলছিলো। কথা বলতে বলতে তিনি ঘরের ছাদের উপর উঠেন। তখন তিনি বলেন – রাসুলুল্লাহ সা্ঃ একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, বলতে পারো, কুরআন শরীফের কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ? তখন জনৈক সাহাবী বললেন – اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (এই আয়াতটি সবচেয়ে বড়)

এরপর সেই লোকটি বলেন – আমি এই উত্তর দেওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সা্ঃ আমার কাঁধের উপর হাত রাখেন আর আমি সেটির শীতলতা বুক পর্যন্ত অনুভব করছিলাম। অথবা তিনি সা্ঃ বুকে হাত রেখেছিলেন আর আমি সেটির শীতলতা কাঁধ পর্যন্ত অনুভব করছিলাম। এরপর রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বললেন – হে আবু মানযার, তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

উমার ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে ধারাবাহিকভাবে ইবনে উমার (রা.) ...... ইবন মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেনঃ উমার (রা.) একবার শহরতলীর কতগুলো লোককে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে দেখলেন আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন – তোমাদের মধ্যে কেউ বলতে পারো, কুরআন শরীফের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত কোনটি ? তখন ইবন মাসউদ (রা.) বললেন – এটি আমার ভালো জানা আছে। কেননা, রাসুলুল্লাহ সা্ঃ কে বলতে শুনেছি যে, "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" হলো কুরআনের সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত।[35]

ফযীলত:

আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান থেকে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইবন হাওশাব ...... আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবন সাকান বলেছেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ সা্ঃ'কে বলতে শুনেছি – "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ" এবং "الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ" এই দুই আয়াতে ইসমে আযম রয়েছে।

[35] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা ২: ২৫৫ ২য় খণ্ড দ্র:ব:।

আবু ইমামা থেকে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইবনে আবদুর রহমান ..... ইবন মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন যে, আনু ইমামা বলেছেন, "আল্লাহ'র ইসমে আযম দিয়ে দুয়া করলে তা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। আর সেটি সূরা বাকারা, সূরা আলি ইমরান ও সূরা তো-হা'র মধ্যে রয়েছে।"

দামেস্কের খতীব ইবন হিশাম ইবন আম্মার বলেছেনঃ সূরা বাকারার মধ্যে ইসমে আযমের আয়াত হলো "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ", সূরা আলি ইমরানের মধ্যে আয়াতটি হলো "الم ﴿١﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾" এবং সূরা তো-হা'র মধ্যে আয়াতটি হলো "وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ"।[36]

এছাড়াও হাদীস শরীফে আয়াতুল কুরসীর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে নিম্নে কয়েকটি পেশ করা হল- হযরত আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স্াঃ বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পড়বে, তাঁর জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ব্যতিত আর কোন বাঁধা থাকবে না।[37]

অন্য বর্ণনায় আসছে:
হযরত উবাই বিন কা'ব (রা(. থেকে বর্ণিত, তাঁর এক খেজুর রাখার থলি ছিল। সেটায় ক্রমশ তার খেজুর কমতে থাকত। একরাতে সে পাহারা দেয়। হঠাৎ যুবকের মত এক জন্তু দেখা গেলে, তিনি তাকে সালাম দেন। সে সালামের উত্তর দেয়। তিনি বলেন, তুমি কি? জিন না মানুষ? সে বলে, জিন। উবাই রাযি. তার হাত দেখতে চান। সে তার হাত দেয়। তার হাত ছিল

---

[36] তাফসীরে ইবনে কাসির, সূরা বাকারা ২: ২৫৫ ২য় খণ্ড দ্র:ব:।

[37] নাসায়ী, হা. ৯৪৪৮ তাবারানী, হা. ৭৮৩২।

কুকুরের হাতের মত আর চুল ছিল কুকুরের চুলের মত। তিনি বলেন, এটা জিনের সুরত। সে (জন্তু) বলে, জিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি সবচেয়ে সাহসী। তিনি বলেন, তোমার আসার কারণ কি? সে বলে, আমরা শুনেছি আপনি সাদকা পছন্দ করেন, তাই কিছু সাদকার খাদ্যসামগ্রী নিতে এসেছি। সাহাবী বলেন, তোমাদের থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? সে বলে, সূরা বাকারার এই আয়াতটি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুআল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ....যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এটি পড়বে, সকাল পর্যন্ত আমাদের থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর যে ব্যক্তি সকালে এটি পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের থেকে নিরাপদে থাকবে। সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর কাছে আসেন এবং ঘটনার খবর দেন। রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ বলেন, খবীস সত্য বলেছে।[38]

পাশাপাশি বর্ণনায় আসছে:
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ যাকাতের সম্পদ পাহারা দেয়ার দায়িত্ব এক রমজান মাসে দিয়েছিলেন। তখন দেখতে পেলাম একজন আগন্তুক সদকার মাল চুরি করছে তখন আমি আগন্তুকের হাত ধরে ফেললাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম ,আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাব। তখন আগন্তুক বলল, আমি খুব অভাবী আর আমার অনেক প্রয়োজন। তার এ কথা শুনে দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল তোমার অপরাধী কী করেছে? আমি উত্তর দিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, লোকটি নাকি অনেক অভাবী তাই তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ বললেন, অবশ্যই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে আর সে আবার আসবে। পরদিন আমি আবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন সে আবারও চুরি করতে আসল

[38] সহীহ ইবন হিব্বান, হা. ৭৯১।

তখন তাকে পাকড়াও করে বললাম, এবার অবশ্যই ,আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খুব অভাবী, আমার পরিবার আছে, আমি আর আসব না। তখন আমি তাকে দয়া করে এবারও ছেড়ে দিলাম। পরদিন আবারও রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল তোমার অপরাধী কী করেছে? আমি এবারও উত্তর দিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, লোকটি নাকি অনেক অভাবী তাই তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। এবারও রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ বললেন, অবশ্যই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে আর সে আবার আসবে। তৃতীয় দিনও আমি চোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন সে আবারও চুরি করতে আসল তখন তাকে পাকড়াও করে বললাম, এবার অবশ্যই ,আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাব, তুমি বার বার ওয়াদা কর আর চুরি করতে আস। তখন অবস্থা বেগতিক দেখে সে বলল, আমাকে মাফ কর। আমি তোমাকে এমন কিছু কথা বলে দিব যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন। আমি বললাম, সেগুলো কী? তখন সে বলল, যখন ঘুমাতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে ঘুমাবে তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করবেন যে তোমার সাথে থাকবে আর কোন শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে আসতে পারবে না। এটা শুনে আবু হুরায়রা রাযি. তাকে ছেড়ে দিলেন । পরদিন রাসূল সা্ঃ আবার অপরাধীর কথা জানতে চাইলে তিনি আগের রাতের কথা বললেন। তখন রাসূল সা্ঃ বললেন, যদিও সে চরম মিথ্যাবাদী কিন্তু সে সত্য বলেছে। রাসূল সা্ঃ আবু হুরায়রা রাযি. কে আরো বললেন, তুমি কি জান সে কে? আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, না। রাসূল সা্ঃ আবু হুরায়রা (রা.) কে বললেন, সে হচ্ছে শয়তান।[39]

[39] বুখারী, হা. ২৩১১।

৬- দু‘আ-: (بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ)

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রু মা‘আসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম। (৩বার)।

ফযীলত: হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই দু‘আ তিনবার করে পড়বে, ‘বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রুহু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরযি ওলা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম।’ অর্থাৎ আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা। কোন জিনিস সে ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবে না।[40]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি রাতে এই আমল করবে, সকাল পর্যন্ত কোন আকস্মিক বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।[41]

৭- দু‘আ-:

(اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহদিকা অ অ’দিকা মাসতাত্বা’তু, আঊযুবিকা

---

[40] তিরমিজি, হা. ৩৩৮৮, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৮৬৯, আহমাদ, হা. ৪৪৮, ৫২৯, রিয়াদুস সলেহিন, হা. ১৪৬৫।

[41] আবু দাউদ, হা. ৫০৮৮।

মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা। (১বার)।

ফযীলত: শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সা্ঃ তাকে বলেছেনঃ তোমাকে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'আ) আমি কি বলে দিব না? তা হলঃ "হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমাকে তুমিই সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার দাস। যথাসাধ্য তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারে আমি দৃঢ় থাকব। আমি আমার কার্যকলাপের খারাপ পরিণতি হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি তোমার নিআমাতের কথা স্বীকার করি। আমি আরও স্বীকার করি আমার গুনাহের কথা। কাজেই আমার গুনাহগুলো তুমি ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই "

রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেনঃ তোমাদের কেউ সন্ধ্যাবেলায় এ কথাগুলো বললে, তারপর ভোর হওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হলে তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়। একইভাবে তোমাদের কেউ ভোরবেলায় তা বললে, তারপর সন্ধ্যার পূর্বেই তার মৃত্যু হলে তার জন্যও জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।[42]

৮- দু'আ-: (رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا)

উচ্চারণ: রাদিতু বিল্লাহি রাব্বাও, ওয়াবিল ইসলামি দিনাও, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা। (১বার)।

ফযীলত: নবী সা্ঃ এর খাদেম (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেনঃ কোন মুসলমান বা কোন মানুষ বা কোন বান্দা

[42] বুখারী, হা. ৬৩০৬, ৬৩২৩, তিরমিযী, হা. ৩৩৯৩, নাসায়ী, হা. ৫৫২২, মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৬৬৬২, ১৬৬৮১।

সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে “আল্লাহ্ আমার প্রভু, ইসলাম আমার দ্বীন এবং মুহাম্মদ সা্ঃ আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বান্তঃকরণে সন্তুষ্ট আছি” এ কথা বললে, কিয়ামতের দিন তার উপর সন্তুষ্ট হওয়া আল্লাহ্‌র কর্তব্য হয়ে যায়।[43]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তাকে খুশী করবে।[44]

অপর বর্ণনায় আসছে, যে ব্যক্তি উপরোক্ত তিন কালিমা পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[45]

কাছাকাছি বর্ণনায় আসছে, উক্ত কালিমা পাঠকারী ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করবে।[46]

৯- দু‘আ-: (حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আরশিল আজীম। (৭বার)।

ফযীলত: হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সাতবার বলেঃ “আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের রব’- আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে, চাই যেন সত্যিকারভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে বলুক না কেন।[47]

---

[43] আবূ দাউদ, হা. ৫০৭২, ইবনে মাজাহ, হা. ৩৮৭০।

[44] মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৮৯৬৭।

[45] মুসনাদে আহমাদ, হা. ১১১০২।

[46] মুসলীম, হা. ৩৪, আন্তর্জাতিক নাম্বার।

[47] আবু দাউদ, হা. ৫০৮১, আমলুল ইয়াউমী ওয়াল লাইলাহ (ইবনে সুন্নি)১/৬৭, হা. ৭১।

১০-১১- দু‘আ-: (সকাল-সন্ধার গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ আমল)

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم﴾

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

উচ্চারণ: “আউজুবিল্লাহিস সামীয়িল আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম”। (৩বার)।

উচ্চারণ: হুওয়াল্লাহুল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুওয়ার রাহমানুর রাহীম। হুয়াল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলমালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু‘মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির, সুবহানাল্লাহি আম্মা য়ুশরিকুন। হুওয়াল্লাহুল খালিক্বুল, বারি‘উল, মুসাউয়িরু লাহুল আসমাউল হুসনা। য়ুসাব্বিহু লাহু মা-ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াহুওয়াল আজীজুল হাকিম। (১বার)।

ফযীলত: হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিন বার পড়বে “আউজুবিল্লাহিস সামী‘য়িল আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম”। তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত [হুয়াল্লাহুল্লাজী লা-ইলাহা শেষ পর্যন্ত] তিলাওয়াত করবে। তাহলে আল্লাহ তা‘আলা উক্ত ব্যক্তির জন্য ৭০ হাজার ফেরেস্তা নিযুক্ত করেন। যারা উক্ত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর এ সময়ের মাঝে যদি লোকটি মারা যায়, তাহলে সে শহীদের মৃত্যু লাভ করে। আর যে ব্যক্তি এটি সন্ধ্যার সময় পড়বে, তাহলে তার একই মর্যাদা রয়েছে। [তথা মাগরিব থেকে সকাল পর্যন্তের

জন্য ৭০ হাজার ফেরেস্তা গুনাহ মাফীর জন্য দু'আ করে, আর সে সময়ে মারা গেলে শহীদের সওয়াব পাবে]।[48]

অন্য বর্ণনায় আসছে, যে ব্যক্তি সকালে "আউজুবিল্লাহিস সামী'য়িল আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম" দো'আটি পাঠ করবে সে সন্ধা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদ থাকবে।[49]

১২- দু'আ-: (ঋণগ্রস্থদের জন্য কার্যকরি আমল)

(اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিক, ওয়াআগনিনী বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াক। (১বার)।

ফযীলত: হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একটি চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার নিকটে এসে বলে, আমার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে আমি অপারগ হয়ে পড়েছি। আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর সীর (সাবীর) পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেনঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! তোমার হালালের মাধ্যমে আমাকে তোমার হারাম হতে বিরত রাখ বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে আত্মনির্ভরশীল কর"।[50]

---

[48] তিরমিজী, হা. ৩০৯০, কানযুল উম্মাল, হা. ৩৫৯৭, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা: ৩৭, দারেমী, হা. ৩৪২৫, শুয়াবুল ঈমান, হা. ২৫০২, আহমাদ, হা. ২০৩০৬, মুসনাদুস সাহাবাহ, হা. ২৯৭৯৫, মিশকাতুল মাসাবীহ, হা. ২১৫৭।

[49] আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ (ইবনে সুন্নি) পৃ. ৪৯।

[50] তিরমিজি, হা. ৩৫৬৩, তালীকুর রাগীব ২/৪০, আল -কালিমুত তাইয়্যিব, পৃ. ১৪৩/৯৯।

১৩- দু'আ-:

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, য়ুহয়ী ওয়ায়ুমীতু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। (১০বার)।

ফযীলত: হযরত উমারাহ্ ইবনু শাবীব আস্-সাবায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন: মাগরিবের নামাযের পর যে লোক দশবার বলে: আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সমস্ত কিছুই তাঁর এবং তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারি, তিনিই জীবন দান করেন ও মুত্যু দেন এবং প্রতিটি জিনিসের উপর তিনিই মহা ক্ষমতাশালী' আল্লাহ তা'আলা তার নিরাপত্তার জন্য ফেরেশতা পাঠান যারা তাকে শয়তানের ক্ষতি হতে ভোর পর্যন্ত নিরাপত্তা দান করেন, তার জন্য (আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ) অবশ্যম্ভাবী করার ন্যায় দশটি পূণ্য লিখে দেন, তার দশটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ বিলুপ্ত করে দেন এবং তার জন্য দশটি ঈমানদার দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।[51]

অন্য বর্ণনায় আসছে:

হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায় (তাশাহুদের অবস্থায়) কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার বলে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[51] তিরমিজি, হা. ৩৫৩৪, আত্-তারগীব ওয়াত্তারহীব ১/১৬০, হা. ৪৭২।

তার আমলনামায় দশটি সাওয়াব লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হয় এবং তার সম্মান দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে ঐ দিন সব রকমের সংকট হতে নিরাপদ থাকবে এবং শয়তানের ধোঁকা হতে তাকে পাহারা দেয়া হবে এবং ঐ দিন শিরকীয় গুনাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের গুনাহ তাকে সংকটাপন্ন করতে পারবে না।[52]

এই আমলটির সার-সংক্ষেপ ফযীলত হলো, ১- ১০০শত নেকি। ২- ১০০শত গুনাহ মাফ। ৩- ১০০শত মর্যদা বৃদ্ধি। ৪- প্রত্যেক প্রকারের বিপদাপদ থেকে মুক্তি। ৫- বিতাড়িত শয়তান হতে মুক্তি। ৬- শিরকের গুনাহ ছাড়া কোন গুনাহ তাকে ধ্বংস করতে পারবেনা। ৭- ঐদিন আমলকারীদের মধ্যে সর্বত্তোম গণ্য হবে, একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে এটি বেশি বেশি পাঠ করেছে।[53]

১৪- দু‘আ-:

(اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আসবাহনা, নুশহিদুকা, ওয়ানুশহিদু হামালাতা আরশিকা ওয়ামালাইকাতাকা, ওয়াজামীয়া খাল‘ক্বিকা, বিআন্নাকাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লা-শারীকালাকা ওয়া‘আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়ারাসুলুক। (৪বার)

(তবে এই দু‘আটি মাগরিবের পর পড়লে ‘‘আল্লাহুম্মা আমসা-ই-না’’ বলবে ‘‘আল্লাহুম্মা আসবাহনার’’ স্থলে।)

---

[52] তিরমিজি, হা. ৩৪৭৪, তা’লীকুর রাগীব ১/১৬৬।

[53] মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৭৯৯০।

ফযীলত: হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলায় উপনীত হয়ে বলেঃ ‘হে আল্লাহ! আমরা ভোরে উপনীত হলাম, আমরা তোমাকে সাক্ষী বানালাম, আরও সাক্ষী বানালাম তোমার আরশ বহনকারীদেরকে এবং তোমার ফেরেশতাগণকে ও তোমার সকল সৃষ্টিকে এই বিষয়ে যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তুমি এক, তোমার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ তোমার বান্দা ও রাসূল”, আল্লাহ তা‘আলা তার সে দিনে সম্পাদিত সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আর সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ঐ কথা বলে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তার সেই রাতের কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেন।[54]

১৫- দু‘আ-: (اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার।(৭বার।

ফযীলত: রাসূলে আকরাম সা্ঃ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজর বা মাগরিবের নামাজের পর কোন প্রকার কথা ছাড়া উপরোক্ত দো‘আ ৭বার পাঠ করবে, সে ঐদিন মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা’আলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।[55]

---

[54] তিরমিজি, হা. ৩৫০১, আলকালিমুত তায়্যিব ২৫, মিশকাত, হা. ২৩৯৮।

[55] সুনানুল কুবরা (ইমাম নাসায়ী) হা. ৮৬৭৭, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, আবু দাউদ, হা. ৫০৭৯, আহমদ, হা. ১৭৩৬২, ইবনে হিব্বান, হা. ২০২২, এই হাদিসের ব্যপারে কালাম আছে তবে এর শাওয়াহেদ পাওয়া যায়, তিরমিজি, হা. ২৫৭২, ইবনে মাজাহ, হা. ৪৩৪০, (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (দীর্ঘ হাদিস) আহমাদ, হা. ১৮৫৩৪, ইবনু আবী শায়বাহ্, হা. ১২০৫৯, মুসতাদরারক হাকিম, হা. ১০৭, আত্ তারগীব, হা. ৩৫৫৮, আল জামি‘ উস সগীর, হা. ১৬৭৬।

১৬- দু‘আ-: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)
উচ্চারণ: সুবহানাল্লহি ওয়া-বিহামদিহী, ‘আদাদা খালকিহী, ওয়া-রিযা‘আ-নাফসিহী, ওয়া-যিনাতা ‘আরশিহী, ওয়া-মিদা-দা কালিমা-তিহী। (৩বার)
ফযীলত: হযরত উম্মুল মু’মিনীন জুওয়াইরিয়্যাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদিন নাবী সা্ঃ ফজরের সলাতের পর খুব ভোরে তাঁর নিকট হতে বের হলেন। তখন জুওয়াইরিয়্যাহ্ নিজ সলাতের জায়গায় বসা। তারপর তিনি সা্ঃ যখন ফিরে আসলেন তখন সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। আর জুওয়াইরিয়্যাহ্ তখনো সলাতের জায়গায় বসে আছেন। তিনি সা্ঃ তাঁকে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় যে অবস্থায় তুমি ছিলে, এখনো কি সে অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নাবী সা্ঃ বললেন, তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি মাত্র চারটি কালিমাহ্ তিনবার পড়েছি, যদি তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছ তার সাথে আমার পড়া কালাম ওযন দেয়া হয় তাহলে এর ওযনই বেশি হবে।[56]

১৭- দু‘আ-: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)
উচ্চারণ: আউযূ বিকালিমাতিল্লাহিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মা-খালাক। (৩বার)।
ফযীলত: হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ একটি বিছা এক ব্যক্তিকে দংশন করলে ঐ রাতে সে আর ঘুমাইতে পারেনি। নবী সা্ঃ কে বলা হলো, অমুক ব্যক্তিকে বিছায় দংশন করায় সে গত রাতে ঘুমাতে পারেনি। তিনি বলেনঃ আহা, সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতো, “আউযূ

---
[56] মুসলিম, হা. ২৭২৬, আদ্ দা‘ওয়াতুল কাবীর, হা. ১২৭, শু‘আবূল ঈমান, হা. ৫৯৬, আদাবুল মুফরাদ, হা. ৫০৪/৬৪৭, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১২, আত্ তারগীব, হা. ১৫৭৪, ইবনু খুযায়মাহ্, হা. ৭৫৩।

বিকালিমাতিল্লাহিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মা খালাক” (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের ওয়াসিলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই), তাহলে বিছার দংশন সকাল পর্যন্ত তার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।[57]

অন্য বর্ণনায় আসছে, এই দো'আটি পাঠকারী সকল প্রকারের কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে রক্ষা পাবে। চাই সে যে স্থানে অবতরণ করুক। এবং কি কাউকে কোন বিষাক্ত প্রাণী কামড় দিলে, উক্ত আমলের বরকতে সে প্রশান্তি লাভ করবে ।[58]

১৮- দু'আ-: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ই্লমান নাফিআ,ওয়া রিযকান ত্বায়্যিবা, ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালা। (১বার)।

ফযীলত: হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নাবী সা্ঃ ফজরের নামাজ পড়ে সালাম ফিরিয়ে উক্ত দো'আ পাঠ করতেন "অর্থ হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবুল হওয়ার যোগ্য কর্মতৎপরতা প্রার্থনা করি। অর্থাৎ রাসূল সা্ঃ নামাজ আদায়ের পর এই কালিমাগুলো পড়তেন)।[59]

---

[57] ইবনে মাজাহ, হা. ৩৫১৮,মুসনাদে আহমদ, হা. ১৫৭০৯।

[58] তিরমিজি, হা. ৩৬০৪, আবু দাউদ, হা. ৩৮৯৯, আদ দা'ওয়াতুল কাবীর, হা. ৪৭০।

[59] ইবনে মাজাহ, হা. ৯২৫, আহমাদ, হা. ২৫৯৮২, ২৬০৬২, ২৬১৬০, ২৬১৯১।

১৯- দু‘আ-:

(اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাস‘আলুকা মিন খাইরি মা-সা‘আলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন (সা:), ওয়ানাউজুবিকা মিন শাররি মাসতাআযাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন **সা্ঃ** ওয়াআনতাল মুসতাআন ওয়াআলাইকাল বালাগ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুও ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (১বার)।

ফযীলত: হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ **সা্ঃ** অনেক দু’আই করেছেন কিন্তু আমরা তার কিছুই মনে রাখতে পারিনি। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি অনেক দু’আই করেছেন কিন্তু আমরা তার কিছুই মনে রাখতে পারিনি। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিব না, যা সেই সকল দু’আর সমষ্টি হবে? তোমরা বলঃ “হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমার নিকট সেই কল্যাণ আশা করি যা তোমার নবী রাসুলুল্লাহ **সা্ঃ** তোমার নিকট আশা করেছেন এবং আমরা তোমার নিকট সেই অনিষ্ট হতে রক্ষা চাই যে অনিষ্ট হতে তোমার নবী **সা্ঃ** আশ্রয় চেয়েছেন। তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং তুমিই (কল্যাণ) পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহ্‌ তা’আলা ছাড়া অনিষ্ট রোধ করার এবং কল্যাণ পৌঁছানোর আর কোন ক্ষমতাবান নেই”।[60]

২০- দু‘আ-: (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ)

উচ্চারণ: সুবাহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি, সুবাহানাল্লাহিল আযীম। (যত বেশি পাঠ করা যায়)।

[60] তিরমিজি, হা. ৩৫২১, আদাবুল মুফরাদ, হা. ৬৭৯।

ফযীলত: হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ **সাঃ** বলেছেনঃ এমন দু'টি বাক্য আছে যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, ওজনে খুবই ভারী এবং করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি প্রিয়ঃ "সুবাহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি, সুবাহানাল্লাহিল আযীম" (মহা পবিত্র আল্লাহ তাআলা, তিনি মহামহিম, মহা পবিত্র আল্লাহ তাআলা, সকল প্রশংসা তাঁর জন্য)।[61]

অপর একটি বর্ণনায় আসছে:

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সাঃ বলেছেনঃ যে লোক সকালে ও বিকেলে একশত বার বলেঃ সুবাহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী", কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম (আমালকারী) আর কেউ হবে না। তবে যে লোক তার ন্যায় কিংবা তার চাইতে অধিক পরিমাণ তা আমল করে (সে উত্তম 'আমালকারী বলে গণ্য হবে)।[62]

২১- দু'আ-: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি, ওয়াল হুযনি, ওয়াল আজযি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি, ওয়াজিলাইদ্দাইনি, ওয়া গালাবাতির রিজাল। (১বার)।

ফযীলত: হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি অনেকবার নবী সাঃ কে নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে দু'আ করতে শুনেছিঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা

---

[61] বুখারি, হা. ৬৬৮২, তিরমিজি, হা. ৩৪৬৭।

[62] তিরমিজি, হা. ৩৪৬৯, মুসলীম, হা. ৬৮৪৩।

হতে, অক্ষমতা ও অলসতা হতে, কৃপণতা ও ঋণের বোঝা হতে এবং মানুষের প্রাধান্য থেকে"।[63]

এই দো'আটি হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনামতে রাসূল সাঃ বেশি বেশি পাঠ করতেন, নিয়মিত পাঠের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদ দূর হয়ে যায়।[64]

২২- দু'আ-: (اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা, ওয়াবিকা আমসাইনা, ওয়াবিকা নাহয়া ওয়াবিকা নামুতু, ওয়া ইলাইকাল মাসীর। (১বার)।

(তবে দো'আটি সকালে পড়লে "আসবাহনা" হবে, তবে বিকেলে তথা মাগরিবের পর পড়লে "আমসাইনা" হবে)।

ফযীলত: হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন: তোমাদের কেউ যখন ভোরে উপনীত হয় তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তোমার হুকুমে আমরা ভোরে উপনীত হই এবং তোমার নির্দেশেই সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নির্দেশেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার নির্দেশেই মারা যাই। তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।" আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখন যেন বলে : "হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমেই সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার নির্দেশেই সকালে উপনীত হই, তোমার নির্দেশেই জীবন ধারণ করি এবং তোমার নির্দেশেই মারা যাই। আবার তোমার কাছেই পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে যেতে হবে"।[65]

---

[63] তিরমিজি হা. ৩৪৮৪।

[64] ইসলাম ওয়েব, ফতোয়া নং ১২০৫৩৮।

[65] তিরমিজি, হা. ৩৩৯১, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৮৬৮।

২৩-দো'আ-: (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ুম, বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ, আসলিহলী শানী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা 'আইন।[66] (১বার)।

ফযীলত: হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ কোন বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লে বলতেন, "ইয়া- হাইয়্যু, ইয়া কইয়ূমু বিরহমতিকা আস্‌তাগীস" (অর্থাৎ- হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের সাথে আমি প্রার্থনা করছি)।[67]

অন্য বর্ণনায় আসছে, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ হযরত ফাতেমা (রা.) কে এই কালিমাটি শিখিয়েছেন এবং সকাল সন্ধায় পড়ার ওসিয়তও করেছেন।[68]

অপর বর্ণনায় আসছে, হযরত ফাতেমা (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সা্ঃ তাকে এই দো'আটি পড়ার নির্দেশ দেন।
কাছাকাছি বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ কে যখন কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখন তিনি এই দো'আটি পাঠ করতেন।[69]

আকাবির আসলাফদের আমল থেকে বুঝা যায় যে, এই আমলটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে কোন মুসিবত ইত্যাদিতে অনেক ফলপ্রসূ।

---

[66] সুনানুল কুবরা ৬/১৪৭, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হা. ৪৬, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৭৩০।

[67] তিরমিযী, হা. ৩৫২৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব, পৃ. ১১৯, মিশকাতুল মাসাবিহ, হা. ২৪৫৪।

[68] মুসতাদরাকে হাকেম, হা.২০০০।

[69] তিরমিজি, হা. ৩৫২৪।

২৪- দো'আ-: (حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

উচ্চারণ: "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির"[70] (৭বার)।

ফযীলত: ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ কথাটি ইবরাহীম ('আ.) বলেছিলেন, যখন তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ সা্ঃ বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, "নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা বিরাট সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ করেছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। এ কথা তাদের ঈমানের তেজ বাড়িয়ে দিল এবং তারা বললঃ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক"[71]

(উল্লিখিত আমলটির ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীন অনেক ধরনের কথা (আমল) বলে থাকেন, যা নিছক তাদের তাজরিবাহ (অভিজ্ঞতা) দ্বারাই প্রমাণিত। অবশ্যই এর স্ব-পক্ষে কোরআন ও হাদীসের সারনির্যাস পাওয়া যায়।)

তথাঃ

- ❖ফেতনা ও বিপদ হতে মুক্তির জন্য **৩৪১** বার পাঠ করার কথা বলে থাকেন।
- ❖বিশেষ কোন মাকছুদ পূরণের জন্য **১১১** বার পাঠ করার কথা বলে থাকেন।
- ❖বিভিন্ন পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য ১৪০ বার পাঠ করার কথা বলে থাকেন।
- ❖রিজিকের প্রশস্ততা , অভাব অনটন দূর করা এবং কর্জ আদায়ের জন্য ৩০৮ বার পাঠ করার কথা বলে থাকেন।

---

[70] আল ইমরান: আয়াত ১৭৩।

[71] আলে ইমরান: আয়াত ১৭৩। বুখারী, হা. ৪৫৬৪, ই.ফা. ৪২০৪।

‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি‘মাল ওয়াকীল’-অংশটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে এবং রাসূল সা্ঃ (মুশরিকদের হামলা হবে এমন খবর শুনে হামরাউল আসাদে) উক্ত দো‘আটি পাঠ করেন[72]। অন্যত্র রাসূল সা্ঃ এ দো‘আটি পাঠ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন[73]। তবে **‘নি‘মাল মাওলা ওয়া নি‘মান নাছীর’** বাক্যটি আল্লাহর প্রশংসাসূচক কুরআনের আয়াত[74], যা কোন দো‘আর সাথে যুক্ত করে পাঠ করায় কোন বাধা নেই। যেকোন দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, দুশ্চিন্তায় আল্লাহর উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল প্রকাশের জন্য উপরোক্ত দো‘আটি পাঠ করা যায়।

২৫- দো‘আ-: (حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আরশিল আজীম। (৭বার)।

ফযীলত: আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সাতবার বলেঃ ”আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের রব” আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে চাই সে সত্যিকারভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে বলুক না কেন।[75]

২৬- দো‘আ-: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً)

---

[72] বুখারী, হা. ৪৫৬৩, আলে ইমরান: আয়াত ১৭৩।

[73] তিরমিযী, হা. ৩২৪৩।

[74] আনফাল: আয়াত ৪০, হজ্জ: আয়াত ৭৮।

[75] আবু দাউদ, হা. ৫০৮১।

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী ‘আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়াফাদ্দালানী ‘আলা কাসীরিম মিম্মান খালাক্কা তাফদিলা। (১বার)।

ফযীলত: উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে লোক কোন বিপদগ্রস্থ লোককে প্রত্যক্ষ করে উপরোক্ত দো‘আ পাঠ করে, সে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত অনিষ্ট হতে হিফাযাতে থাকবে। তা যে কোন বিপদেই হোক না কেন।[76]

২৭- দো‘আ-: যে কোন বিপদ-আপদ ও মুসিবতে কার্যকরি আমল:

(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যোয়া-লিমীন।(যত বেশি পড়া যায়)

ফযীলত: হযরত সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ মাছওয়ালা নবী ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে গিয়ে যখন দু‘আ পড়েছিলেন তা হলো এই ‘‘লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যোয়া-লিমীন’’ অর্থাৎ- ‘‘তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা‘বূদ নেই। তুমি পবিত্র, আমি হচ্ছি যালিম বা অত্যাচারী অপরাধী’’।[77]

যে কোন মুসলিম যে কোন ব্যাপারেই এ দু‘আ পাঠ করবে, তার দু‘আ নিশ্চয়ই গৃহীত হবে।[78]

বি:দ্র: উক্ত আমলের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা শুনা যায়, মূলত এমন সংখ্যা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রমাণিত। স্পষ্ট করে কোন

---

[76] তিরমিজি, হা. ৩৪৩১, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৮৯২।

[77] সূরা ইউনুস: আয়াত ৮৭।

[78] তিরমিজি, হা. ৩৫০৫, আহমাদ, হা. ১৪৬২, মুসতাদারাক লিল হাকিম, হা. ১৮৬২, শু‘আবূল ঈমান, হা. ৬১১।

সংখ্যার কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। তাই রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যা না মনে করে তাদের কথা অনুযায়ী আমল করা যেতে পারে।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় কার্যকরি আমল:

২৮- দো‘আ-: (أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ) – (بِاسْمِ اللَّهِ)

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ। (৩বার)।

উচ্চারণ: ‘আউজু বি,‘ইজ্জাতিল্লাহি ওয়াকুদরাতিহী মিন শার্রি মা-আজিদু ওয়া উহাযিরু। (৭বার)।

ফযীলত: ‘উসমান ইবনু আবুল ‘আস-সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ ‘উসমান ইবনু আবুল ‘আস-সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সা্ঃ এর নিকট একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার দেহে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে অংশ ব্যথাযুক্ত হয়, তার উপরে তোমার হাত রেখে তিনবার ‘বিসমিল্লা-হ’ বলবে এবং সাতবার বলবে-“আল্লাহ এবং তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি-যা আমি অনুভব করি এবং যা ধারণা করি তার অনিষ্ট হতে।”[79]

বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থানে মর্দন করেছিলাম আর ৭বার এ দো‘আ পড়লাম। তাতে আল্লাহ তা‘আলা আমার পুরো ব্যথাই নিরাময় করে দিলেন। আমি এরপর থেকে আমার পরিবারের লোকদের এবং অন্যান্যদেরও এ নিয়মে আমল করার জন্য বলে আসছি।[60]

[79] মুসলিম, হা. ৫৬৩০ ই.ফা. ৫৫৫১, আবু দাউদ, হা. ৩৮৯১, তিরমিজি, হা. ৩৫৮৮, ইবনে মাজাহ, হা. ৩৫২২।

অন্য বর্ণনায় আসছে,

২৯-দো'আ-: (بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا. بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا)

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরীক্বাতি বা'দিনা, য়ুশফা সাক্বিমুনা বি-ইজনি রাব্বিনা।

ফযীলত: (নিয়মঃ মাটিতে থুথু ফেলে তা নিয়ে ব্যথার স্থানে এই দো'আটি পড়তে পড়তে মর্দন করা) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ রোগীর জন্য (মাটিতে ফুঁ দিয়ে) দু'আ পড়তেনঃ আল্লাহর নামে আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথু, আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশে আমাদের রোগীকে আরোগ্য দান করে।[80]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ব্যথা-বেদনায় নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতে থাকা: امْسَحْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَه"إِلاَّ أَنْت

উচ্চারণ: ইমসাহিল বা'সা রাব্বান্নাসি, বিয়াদিকাশ শীফাউ, লা-কাশিফা লাহু ইল্লা আনতা।

আম্মাজান 'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ ঝাড়-ফুঁক করতেন। আর এ দু'আ পাঠ করতেনঃ ব্যথা দূর করে দাও, হে মানুষের পালনকর্তা। আরোগ্যদানের ক্ষমতা কেবল তোমারই হাতে। এ ব্যথা তুমি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারে না।[81]

৩০- দো'আ-:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

---

[80] বুখারী, হা. ৫৭৪৫, ই.ফা.৫২২১, আহমাদ, হা. ২৪৬৭১।

[81] বুখারী, হা. ৫৭৪৪, ই.ফা.৫২২০।

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্কতানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাসতাত্বা‘তু, আ‘ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা‘তু, আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

ফযীলত: হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি এই কালিমাগুলোর অর্থের প্রতি ধ্যান রেখে আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে এর মাধ্যমে সকালে একবার এস্তেগফার করবে, রাত আসার আগে দিনে দিনে যদি সে মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে সন্ধায় এই কালিমাগুলির মধ্যমে তওবা করবে, ভোরের আগে ঐ রাতে যদি সে মারা যায়, তবে সে জান্নাতী হবে।[82]

অন্য বর্ণনায় আসছে, যদি কোন ব্যক্তি উক্ত আমল করে রাত্রে মৃত্যু বরণ করে, সে শহীদি মৃত্যু লাভ করবে।[83]

৩১- দো‘আ-: (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)

উচ্চারণ: লা-হাওলা ওয়ালা কুও ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (যত বেশি জিকির করা যায়)

ফযীলত: আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নাবী সা্ঃ এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর বলতাম। তখন নাবী সা্ঃ বললেনঃ তোমরা তোমাদের নফসের উপর একটু দয়া কর। কেননা, তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না।

---

[82] বুখারী, হা. ৬৩০৬।

[83] আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, ৪৩।

বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং ঘনিষ্ঠতমকে। এরপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ বলছিলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ হে ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু কায়স! বল لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ কেননা এটি জান্নাতের ভান্ডার সমূহের একটি ভান্ডার। অথবা তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে সেই সম্পর্কে জানিয়ে দেব না (যা হচ্ছে জান্নাতের খাজানা)?[84]

আরো কিছু ফযিলতঃ

১- যদি কোন বান্দা এই দো‘আটি (لا إِلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ وسبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ) পাঠ করে আল্লাহ তা‘আলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।[85]

২- উক্ত দো‘আ গুনাহ সমুহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।[86]

৩- যে ব্যক্তি উক্ত দো‘আ দৈনন্দিন ১০০বার পাঠ করবে তাকে কোনদিন দারিদ্রতা স্পর্শ করবেনা।[87]

৪- যে ব্যক্তি উক্ত দো‘আর শুরুতে “বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ” বাড়িয়ে পরবর্তী অংশ মিলিয়ে পাঠ করে ঘর হতে বের হবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে নিজ কুদরতে হিফাজত করবেন।[88]

---

[84] বুখারী, হা. ৭৩৮৬, ই.ফা. হা. ৬৮৮৩।

[85] আলহাওকালাতু মাফহুমুহা ওয়াফাজাইলুহা ওয়াদালালতুহাল আকিদিয়্যাতু (আব্দুর রাজ্জাক বিন আলমুহসিন আল বদর) ৬৭—৭১ পৃ.

[86] মুসনাদে আহমদ, (আহমদ আশ শাকের) হা. ১৯৪।

[87] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা. ৮৫১।

[88] ফসলুল খেতাবি ফিয যুহদি ওয়ার রাক্বাইকি ওয়াল আদাবি, পৃ.২৩২-২৩৩, সহীহুল জামে, হা. ৪৯৯।

৫- যে ব্যক্তি উক্ত দো'আর শেষে "ওয়ালা মানজায়া মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি" (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ) (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ওয়ালা মানজায়া মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি" ওয়ালা মানজায়া মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি") মিলিয়ে পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার হতে সত্তর প্রকারের অনিষ্ট অপসারণ করেন এবং এগুলোর মাঝে সাধারণ বা ক্ষুদ্র বিপদ হল দরিদ্রতা।[89]

অজুর ফযীলত

مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ....سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَقُولُ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: «أَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ، فَأَنْقَيْتَهُمَا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِكَ وَأَنَامِلِكَ، فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ، فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»

মুআবিয়া ইব্ন সালেহ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ.........আমরা আবু উমামা বাহিলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমর ইব্নে আবাসা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অজু কিরূপ করতে হয়? তিনি বললেন, অজু! তুমি যখন অজু কর এবং তোমার হস্ত তালুদ্বয় ধৌত কর এবং পরিস্কার করে ধৌত কর তখন তোমার পাপসমূহ তোমার নখের ভেতর হতে এবং তোমার অঙ্গুলির অগ্রভাগ হতে বের হয়ে যায়। আর যখন তুমি কুলি কর এবং নাকের ভেতরকার অংশ ধৌত কর এবং তোমার মুখমন্ডল ধৌত কর এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ কর এবং গোড়ালি পর্যন্ত পা ধৌত কর, তখন তুমি তোমার সাধারণ পাপসমূহ ধুয়ে ফেললে। আর যখন তুমি তোমার মুখমণ্ডল আল্লাহ

---

[89] তিরমিজি, হা. ৩৬০১। (ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসের সনদ মুত্তাসিল সুত্রে প্রমাণিত নয় মাক্বতু। মাকহুল রহ. সরাসরি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিসটি শুনেননি।

তা'আলার জন্য স্থাপন কর, তখন তুমি পাপ হতে ঐ দিনের মত মুক্ত হয়ে যাও, যেদিন তোমার জননী তোমাকে জন্ম দিয়েছিল।[90]

অপর বর্ণনায় আসছে:
আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ (সাহাবীগণের উদ্দেশ্য করে) বললেনঃ আমি কি তোমাদের এমন একটি কথা বলব না আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দিবেন এবং (জান্নাতেও) পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন? সাহাবীগণ আবেদন করলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই। তখন তিনি সা্ঃ বললেন, কষ্ট হলেও পরিপূর্ণভাবে অজু কর, মাসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ রাখা এবং এক ওয়াক্ত আদায়ের পর আর এক ওয়াক্তের সালাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হল 'রিবাত্ব' (প্রস্তুতি গ্রহণ)।[91]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়:
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ বলেছেনঃ আমার উম্মতের কিছু লোক কিয়ামতের দিন আমার কাছে হাওযে কাওসারে উপস্থিত হবে। আর আমি তাদেরকে তা থেকে এমনভাবে বিতাড়িত করব, যেভাবে কোন ব্যক্তি তার উটের পাল থেকে অন্যের উটকে বিতাড়িত করে থাকে। (একথা শুনে) লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ আল্লাহর নবী! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের এমন এক চিহ্ন হবে যা অন্য কারোর হবে না। অজুর প্রভাবে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত-পায়ের দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়বে। উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত অবস্থায় তোমরা আমার নিকট আসবে। আর

[90] নাসাঈ, হা. ১৪৭।

[91] মুসলিম, হা. ২৫১, মিশকাতুল মাসাবিহ, হা.২৮২।

তোমাদের একদল লোককে জোর করে আমার থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাই তারা আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। তখন আমি বলব, হে আমার প্রভু! এরাতো আমার লোক। এর জবাবে একজন ফেরেশতা আমাকে বলবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে (ইনতিকালের পরে) তারা কি কি নতুন কাজ (বিদ‘আত) করেছে।[92]

অজুর শেষে দো‘আর ফযীলত:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

উচ্চারণ:: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু লা-শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসুলুহু। আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্তাও ওয়াবীনা, ওয়াজ আলনী মিনাল মুত্বাত্বাহহিরীন।

ফযিলতঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করার পর উপরোক্ত দো‘আ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছামত যে কোন দরজা দিয়েই তাতে যেতে পারবে।[93]

মসজিদে বসে থাকার দ্বারাও গুনাহ মাফ হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي

---

[92] মুসলিম, ৪৭০, ই.ফা. ৪৭৩।

[93] তিরমিজি, হা. ৫৫।

مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ . حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ " . قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের জন্য বসে অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজরত থাকে আর মালায়িকাহ্ও ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে রহম করো। (আর মালায়িকাহ্) ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ সে সেখান থেকে উঠে চলে না যায় কিংবা যতক্ষণ অজু নষ্ট না করে। হাদীস বর্ণনাকারী রাফি' বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম 'হাদাস বা অজু নষ্ট করা কাকে বলে? তিনি বললেনঃ নিঃশব্দে বা স-শব্দে বায়ু নিঃসরণ করা।[94]

আজানের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا "

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেছেনঃ মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর যতদুর পর্যন্ত যায় তাকে ততদুর ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাজা ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিসই (ক্বিয়ামাতের দিন) তার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে। আর কেউ জামা'আতে হাজির হলে তার জন্য পঁচিশ ওয়াক্ত সলাতের সাওয়াব লিখা হয় এবং এক সলাত থেকে আরেক সলাতের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[95]

---

[94] মুসলিম, ১৩৯৫ ই.ফা. ১৩৮১।

[95] আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১৫।

প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ের ফযীলত:

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً .

ইরবাদ বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ প্রথম কাতারের লোকের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকের জন্য একবার।[96]

জামাতে নামাজ আদায়ের ফযীলত:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল সা্ঃ বলেছেনঃ জামা'আতে নামাজ আদায়ের ফযীলত একাকী আদায়কৃত নামাজ অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী।[97]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ

إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

---

[96] নাসায়ী, হা. ৮১৭, আহমাদ, ১৬৬৯১, ১৬৬৯৮, ১৬৭০৬; দারিমী, হা. ১২৬৫, ইবনে মাজাহ, হা. ৯৯৬।

[97] বুখারী, হা. ৬৪৫, ৬৪৯, ই.ফা. ৬১৭, মুসলিম ৫/৪২, হা. ৬৫০, আহমাদ, হা. ৫৩৩২।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তির জামা'আতের সাথে নামাযের সওয়াব, তার নিজের ঘরে ও বাজারে আদায়কৃত নামাযের সওয়াবের চেয়ে পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে অজু করলো, অতঃপর একমাত্র নামাযের উদ্দ্যেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করল তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। নামায আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ নামাযের স্থানে থাকে, ফেরেশতাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন- "হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজে রত বলে গণ্য হয়।[98]

পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায আদায়ের ফযীলত:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ- أُولٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ

আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে, তারাই হবে (জান্নাতের) অধিকারী।[99]

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমীনগণ,যারা তাদের নামাযে ভীত-অবনত।[100]

হাদিসে আসছে:

---

[98] বুখারী, হা. ৬৪৭, ই.ফা. ৬১৮।

[99] সূরা মুমিনুন: আয়াত ৯-১০।

[100] সুরা মুমীনুন: আয়াত ১-২।

إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي

হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছি। আর আমি আমার পক্ষ হতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে এসব সলাতের হিফাযাত করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি এর হিফাযাত করবে না তার জন্য আমার পক্ষ হতে কোন প্রতিশ্রুতি নেই।[101]

অপর বর্ণনায় আসছে:

আবদুল্লাহ ইবনুস সুনাবিহী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন,...আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ কে বলতে শুনেছিঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ্ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে নির্ধারিত সময়ে পূর্ণরূপে রুকু’ ও পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন অন্যথায় শাস্তি দিবেন।[102]

অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়:

---

[101] আবু দাউদ, হা. ৪৩০।

[102] আবু দাউদ, হা. ৪২৫।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, মিরাজের রাতে নবী সা্ঃ এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হল, হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট কথার কোন অদল বদল নাই। তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব রয়েছে।[103]

পাশাপাশি বর্ণনায় আসছে,

عن أبي ذر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء ، والورق يتهافت ، فأخذ بغصنين من شجرة . قال : فجعل ذلك الورق يتهافت قال : فقال : يا أبا ذر قلت : لبيك يا رسول الله قال : إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه ، كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة

হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে নবী করিম সা্ঃ এক সময়ে শীতকালে বাহিরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন বৃক্ষ হতে পাতা ঝরতে ছিলো। হুজুর সা. বৃক্ষের একটি শাখা হাত দিয়া ধরলেন ফলে উহার পাতা আরো বেশি করে ঝরতে লাগিল। অতঃপর তিনি বললেন হে আবুজর! আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল আমি হাজির আছি! তখন তিনি বলেন, যখন কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করে, তখন তার থেকে গোনাহ এভাবেই ঝরে পড়ে।[104]

কাছাকাছি বর্ণনায় আসছে,

---

[103] তিরমিজি, হা. ২১৩।

[104] মুসনাদে আহমাদ, হা. ২১৫৫৬।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমু'আহ্ থেকে আরেক জুমু'আহ্ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারাহ্ স্বরূপ।[105]

ফাতিহা পাঠ শেষে আমীন বলার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " آمِينَ ".

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেছেনঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা, যার 'আমীন' (বলা) ও ফেরেশতার 'আমীন' (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[106]

আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু বলার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল সা্ঃ বলেছেনঃ ইমাম যখন 'سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه' বলেন, তখন তোমরা 'اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ' বলবে। কেননা, যার এ উক্তি ফেরেশতাগণের উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার

---

[105] মুসলিম, হা. ৪৩৯, ই.ফা. ৪৪২।

[106] বুখারী, হা. ৭৮০।

পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[107]

রুকু দ্বারা গুনাহ মাফ হয়:

مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা্ঃ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি একবার রুকু করে কিংবা একবার সিজদাহ্ করে। এর দ্বারা তার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করা হয়। এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[108]

সিজদার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়:

رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلَمِيُّ، قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

রাবী'আহ ইব্নে কা'আব আল আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর সাথে রাত যাপন করছিলাম। আমি তাঁর অজুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেনঃ কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেনঃ এছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদাহ্ করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো।[109]

অন্যত্র বর্নীত আছে,

---

[107] বুখারী, হা. ৭৯৬।

[108] আহমাদ, হা. ২১৩০৮।

[109] মুসলিম, হা. ৯৮১ ই.ফা. ৯৭৬।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেনঃ বান্দার সাজদাহরত অবস্থায়ই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের সর্বোত্তম অবস্থা (বা মুহুর্ত)। অতএব তোমরা অধিক পরিমাণে দু'আ পড়ো।[110]

ফজরের নামাযের ফযীলত:

১.ফজরের নামাযে দাঁড়ানো, সারা রাত দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সমান।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তার জন্য অর্ধরাত্র (নফল) নামায আদায়ের সাওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি 'এশা ও ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তার জন্য সারারাত (নফল) নামায আদায়ের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।[111]

২. ফজরের নামায আদায়কারী পুরোদিন আল্লাহর জিম্মায় থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করবে।

جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

হযরত জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো। আর আল্লাহ তোমাদের কারো কাছে তাঁর

[110] মুসলিম, হা. ৯৭০, ই.ফা. ৯৬৫।

[111] মুসলিম, হা.১৩৭৭, আবূ দাঊদ, হা. ৫৫৫, তিরমিজি, হা. ২২১।

রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তাদানের বিনিময়ে কোন অধিকার দাবী করেন না। যদি করেন তাহলে তাকে এমনভাবে পাকড়াও করবেন যে, উল্টিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[112]

৩. ফজরের নামায আদায়কারীর জন্য কেয়ামতের দিন নূর হয়ে দেখা দেবে।

عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

বুরাইদা আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেনঃ যারা অন্ধকার পার হয়ে মসজিদে যায় তাদেরকে কিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুখবর দাও।[113]

৪. ফজরের নামায আদায়কারী জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ লাভ করবে।

عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

উমারা ইব্‌নে রুওয়াইবা সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সা্ঃ কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বের (ফজরের) নামায এবং সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বের (আসরের) নামায আদায় করবে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[114]

৫ .ফজরের নামায আদায়কারী মুনাফেকি থেকে মুক্তি পাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

---

[112] মুসলিম, হা. ১৩৭৯।

[113] তিরমিজি, হা. ২২৩, ইবনু মাজাহ, হা. ৭৭৯-৭৮১।

[114] আবু দাউদ, হা. ৪২৭, নাসায়ী, হা. ৪৭১, আহমদ, হা. ১৬৭৬৯, ১৭৮৩৩ ।

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ ‘ইশা ও ফজরের নামায আদায় করা মুনাফিকদের নিকট সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ দু’টি সলাতের পুরষ্কার বা সাওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এ দু’ওয়াক্ত জামা‘আতে উপস্থিত হত।[115]

৬. ফজরের নামায আদায়কারীর নাম সরাসরি আল্লাহর দরবারে আলোচিত হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: আল্লাহর রাসূল সা্ঃ বলেছেনঃ ফেরেশতাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। ‘আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাজআদায়রত অবস্থায় ছিলেন।[116]

৭. ফজরের নামায আদায়কারীর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের উত্তম বস্তু অর্জিত হবে।

---

[115] বুখারী, হা. ৬৫৭, মুসলিম, হা. ১৩৬৮।

[116] বুখারী, হা. ৫৫৫,৩২২৩,৭৪৮৬, মুসলীম, হা. ১৩১৮।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সা্ঃ বলেছেন, ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামাজ দুনিয়া ও তার সব কিছুর থেকে উত্তম।[117]

৮. ফজরের নামায আদায়কারী পরিপূর্ণ এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ করবে, যদি আদায়কারী সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক'আত নামায আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও উমরার সাওয়াব)।[118]

৯. ফজরের নামায আদায়কারী তুলনাহীন গণীমত লাভ করবে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلاَ أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً قَوْمٌ شَهِدُوا صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً

---

[117] মুসলিম, হা. ১৫৭৩, ই.ফা. হা. ১৫৫৮।

[118] তিরমিজি, হা. ৫৮৬।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা ঃ নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গনীমতের সম্পদ অর্জন করে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সাথে যায়নি এমন এক লোক বলল, অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে উত্তম গনীমত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোন সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সা ঃ বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক দলের কথা বলব না যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গনীমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাযের জামা'আতে হাযির হয়, (নামায শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গনীমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী।[119]

১০ .ফজরের নামাজ আদায়কারী কেয়ামতের দিন সরাসরি আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। আর এটি হচ্ছে সর্বোত্তম পুরস্কার।

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ . أَوْ لاَ تُضَاهُونَ . فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

হযরত জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, এক রাতে নবী সা ঃ এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন! এটি যেমন দেখতে পাচ্ছো- তোমাদের প্রতিপালককেও তোমরা তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার পূর্বের নামাযও সূর্য ডুবার পূর্বের নামাজ আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই কর। অতঃপর

---

[119] তিরমিজি, হা. ৩৫৬১, তা'লীকুর রাগীব ১/১৬৬।

তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ “সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাসবীহ্ পাঠ করুন”।[120] আবূ ‘আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (রহঃ) বলেন, ইবনু শিহাব (রহঃ).... জারীর (রাঃ) হতে আরো বলেন, নবী সা্ঃ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে খালি চোখে দেখতে পাবে।[121]

ইশারের নামাজ আদায়ের ফযীলত:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ

উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা’আতের সাথে আদায় করে তার জন্য অর্ধরাত্র (নফল) নামায আদায়ের সাওয়াব রয়েছে।[122]

জানাযার নামায আদায়ের ফযীলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা্ঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির ওপর জানাযার নামাজ আদায় করে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি লাশ কবরস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব, দুই কীরাত সওয়াব এর পরিমাণ হল দুইটি বিরাট পাহাড়ের সমপরিমাণ।[123]

---

[120] সূরাহ্ ত্ব-হা: আয়াত ১৩।

[121] বুখারী, হা. ৫৭৩।

[122] তিরমিজি, হা. ২২১, আবূ দাঊদ, হা. ৫৫৫।

[123] তিরমিজি, হা. ১০৪০, নাসাঈ, হা. ১৯৯৪, থেকে ১৯৯৭, ৫০৩২, আবু দাউদ, হা. ৩১৬৮, ইবন মাজাহ, হা. ১৫৩৯।

অপর বর্ণনায় আসছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রাসূল সা্ঃ ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার নামাজের জানাযা আদায় করে ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।[124]

পাশাপাশি বর্ণনায় পাওয়া যায়:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যদি কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর একশত জনের একদল মুসলমান তার জানাযার নামায আদায় করে এবং তারা তার জন্য সুপারিশ করে, তবে তার জন্য তাদের সুপারিশকে ক্কবূল করা হবে।[125]

অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়:

---

[124] বুখারী, হা. ৪৭, ই.ফা ৪৫।

[125] তিরমিজি, হা. ১০২৯।

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ

মারসাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, যখন মালিক ইবনু হুবাইরা (রাঃ) জানাযার নামায আদায় করতেন তখন লোকজনের উপস্থিতি অল্প হলে তাদেরকে তিনি তিন সারিতে ভাগ করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তির জানাযার নামায তিন কাতার লোক আদায় করেছে তার জন্য (জান্নাত) অবধারিত হয়েছে।[126]

সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামায আদায়ের ফযীলত:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

উম্মে হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাকা'আত নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। জোহরের নামাযের পূর্বে চার রাকা'আত ও পরে দুই রাকা'আত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকা'আত, 'ইশার নামাযের পরে দুই রাকা'আত এবং ভোরের ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকা'আত।[127]

অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

[126] তিরমিজি, হা. ১০২৮, আহকামুল জানায়িয পৃ. ১২৮।

[127] তিরমিজি, হা. ৪১৫, ৪২৭, ৪২৮ ইবনু মাজাহ, হা. ১১৪১, ১১৬০।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।[128]

সুন্নতে যায়েদা ও নফল নামায আদায়ের ফযীলত:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেনঃ যে ব্যক্তি 'আসরের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।[129]

এই ফযীলতটি আসরের সুন্নাতের সাথে নির্দিষ্ট। তবে অন্যান্য সুন্নাতে যায়েদা (তথা মুস্তাহাব) যদিও সাওয়াবের দিক থেকে এই পর্যায়ের না। কিন্তু মুস্তাহাব আদায় করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নাজাত পায়।

হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ – عَزَّ وَجَلَّ: أُنْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্কুল্লার মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায । সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে । আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে

[128] তিরমিজি, হা. ৪১৬।

[129] তিরমিজি, হা. ৪৩০, আবূ দাঊদ, হা. ১১৫৪, মিশকাত, হা. ১১৭০।

সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে । যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, (ফেরেশতাদেরকে) ‘দেখ তো ! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে ?’ অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে ।[130]

তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ফযীলত:

আল্লাহ তা’আলা বলেন, **وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا** এবং তারা রাত্র অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে। অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদারত অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদাতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামাযও ইবাদাতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো নামযের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল থাকে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের জীবনের এ দিকগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন অন্য সূরায় বলা হয়েছেঃ “তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, নিজেদের রবকে ডাকতে থাকে আশায় ও আশংকায়।”[131]

---

[130] তিরমিজি, হা. ৪১৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, আবূ দাঊদ, হা. ৮৬৪, নাসায়ী, হা. ৪৬৭ , ইবনু মাজাহ, হা. ১৪২৫, ১৪২৬, আহমাদ, হা. ৭৮৪২, ৯২১০, ১৬৫০১, সুনানে দারেমী, হা. ১৩৫৫, রিয়াদুস সলেহিন, হা. ১০৮৮।

[131] সূরা আস-সাজদাহ: আয়াত ১৬।

অন্যত্র আরো বলা হয়েছেঃ “এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দো‘আ করতো।”[132]

আরো বলা হয়েছেঃ “যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান” [133]

হাদীস শরীফে তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ “নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় কর। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সকল নেককারদের অভ্যাস ছিলো। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা’আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্তকারী।”[134]

রাসূলুল্লাহ সা্ঃ আরো বলেনঃ “যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা‘আতে আদায় করে, সে যেন অর্ধরাত্রি ইবাদাতে অতিবাহিত করে এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা’আতের সাথে আদায় করে, তাকে অবশিষ্ট অর্ধরাত্রিও ইবাদাতে অতিবাহিতকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।”[135]

ইশরাকের নামায আদায়ের ফযীলত:

---

[132] সূরা আয-যারিয়াত: আয়াত ১৭-১৮।

[133] সূরা আয যুমার: আয়াত ৯।

[134] ইবনে খুযাইমাহ, হা. ১১৩৫।

[135] মুসলিম, হা. ৬৫৬।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي، ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ

আবু দারদা ও আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাক'আত নামায আদায় কর, আমি তোমার দিনের শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন পূরণ করে দিব।[136]

তোহফাতুল আহওয়াযী "শরহে তিরমিযি" গ্রন্থ প্রণেতা বলেন হাদীসে বর্ণিত "দিনের প্রথম ভাগের চার রাকাত" দ্বারা উদ্দেশ্য এক বর্ণনা অনুযায়ী ইশরাকের নামায, আরেক বর্ণনা অনুযায়ী চাশতের নামায, তবে ফজরের নামাযের দুই রাকাত সুন্নত, ও দুই রাকাত ফরয ও বলা যায়, কারণ শরয়ী দিনের শুরু হয় সকালের মাধ্যমে।

তিনি আরো বলেন: আমার মত অনুযায়ী ইমাম তিরমিযি রহ. ও আবু দাউদ রহ. উক্ত চার রাকাত দ্বারা ইশরাকের নামাযই উদ্দেশ্য নিয়েছেন, কারণ তারা উক্ত হাদীসটি ইশরাক নামাজের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[137]

অপর এক বর্ণনায় আসছে:
আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক'আত নামায আদায় করে- তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব

[136] তিরমিজি, হা. ৪৭৫।

[137] তোহফাতুল আহওয়াযী: ২/৪৭৮।

রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)।[138]

চাশতের নামায আদায়ের ফযীলত:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقةٌ: فَكُلُّ تَسْبيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْميدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহ্মীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশতের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে।[139]

অপর বর্ণনায় আসছে:

আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু আমাকে তিনটি কাজ করতে আদেশ করেছেন। আমার জীবদ্দশায় তা কখনো পরিত্যাগ করব না। (তিনি আমাকে আদেশ করেছেন) প্রতি মাসে

---

[138] তিরমিজি, হা. ৫৮৬, মিশকাত, হা. ৯৭১।

[139] মুসলিম, হা. ৭২০, আবূ দাউদ, হা. ১২৮৫, ১২৮৬, রিয়াদুস সলেহিন, হা. ১৪৪০।

তিনটি করে সিয়াম পালন করতে 'যুহা' বা চাশ্‌তের নামাজ আদায় করতে আর বিত্‌র নামাজ আদায় করার আগে না ঘুমাতে।[140]

(বিশুদ্ধ বর্ণনামতে[141] চাশতের নামাজের অপর নাম আওয়াবীন নামাজ। তবে শাফেয়ীদের আরেকটি মত হলো, মাগরিবের পরের নামাজকে আওয়াবীনের নামাজ বলা হয়।[142])

তাহিয়্যাতুল অজু ও নামাযের ফযীলত:

উত্তমরূপে অজু করার পর দুই রাকাত নামায আদায় করার নামই হলো তাহিয়্যাতুল অজু ও নামায, এই নামাযের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হুমরান (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি 'উসমান ইব্‌নু আফ্‌ফান (রাঃ)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর মাথা মাসেহ করলেন। অতঃপর দুই পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। পরে

---

[140] মুসলিম, হা. ১৫৬০, ই.ফা.১৫৪৫।

[141] শরহে মুসলীম: (ইমাম নববী) ৬/৩০।

[142] মউসু'আতুল ফিকহীয়্যাহ: ২৭/১৩৪,১৩৫, মুসলীম, হা. ৭৪৮।

বললেন, আল্লাহর রাসূল সা: বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম অজু করবে, অতঃপর দু’রাক’আত নামায আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[143]

অপর বর্ণনায় আসছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা: একদা ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তুষ্টিব্যঞ্জক যে ‘আমল তুমি করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে (মি’রাজের রাতে) আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রাঃ) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে (অধিক) সন্তুষ্টিব্যঞ্জক হয় এমন কিছুতো আমি করিনি। দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তাহারাত ও পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাত দ্বারা নামাজ আদায় করেছি, যে পরিমাণ নামাজ আদায় করা আমার তাক্দীরে লেখা ছিল।[144]

মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল নামাযের ফযীলত:

---

[143] বুখারী, হা. ১৫৯, আহমাদ হা. ৪৯৩, ৫১৩।

[144] বুখারী, হা. ১১৪৯।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত নামায আদায় করে এবং তার মাঝখানে কোন অশালীন কথা না বলে, তাঁকে এর বিনিময়ে বার বছরের ইবাদাতের সমান সাওয়াব দেয়া হবে।[145]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়:
আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাক'আত নামায আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন।[146]

সালাতুত তাসবীহের নামাযের ফযীলত:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে বললেনঃ হে 'আব্বাস! হে আমার চাচা ! আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপহার দিবো না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দিবো না? আপনি যখন সে কাজগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড় এবং প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত

[145] ইবনু মাজাহ, হা. ১১৬৭।

[146] তিরমিজি, হা. ৪৩৫।

গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[147] (বিস্তারিত সাপ্তাহিক আমলের আলোচনায় আসবে ইনশা-আল্লাহ)

সালাতুল হাজত নামায আদায়ের পদ্ধতি:

সালাতুল হাজাত অর্থাৎ 'প্রয়োজনের নামায' কোন হালাল চাহিদা পুরনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করাকে 'সালাতুল হাজত' বলা হয়।[148]

আদায়ের পদ্ধতি : এটি স্বাভাবিক নামাযের মতোই। উত্তমভাবে অজু করে , সুরা কেরাত মিলিয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। নামায শেষে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা) প্রসংসা (এবং রাসূল সা: এর ওপর দরূদ পাঠ করে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করত: কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দো'আ করবে।

এ নামায প্রসঙ্গে এক হাদিসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ্ ইবনু আবী আওফা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সা: ইরশাদ করেন যে, আল্লাহর কাছে বা কোন আদম সন্তানের কাছে কারো যদি কোন প্রয়োজন হয়, তবে সে যেন অজু করে এবং খুব সুন্দরভাবে যেন তা করে।

---

[147] আবু দাউদ, হা. ১২৯৭, ইবনে মাজাহ, হা. ১৩৮৭, সহীহ ইবনে খুজাইমা, হা. ১২১৬, সুনানে বায়হাকী কুবরা, হা. ৪৬৯৫।

[148] ইবনু মাজাহ, হা. ১৩৮৫।

পরে যেন দু'রাকা'আত নামায আদায় করে, এরপর যেন আল্লাহর হামদ করে ও রাসূল সাঃ এর উপর দরূদ সালামের পর এই দো'আটি পড়ে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাহুল হালীমুল কারীমু, সুবহানাল্লাহী রাব্বিল আরশীল আজীমি, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা, আস'আলুকা মু'জিবাতি রাহমাতিকা, ওয়া'আযাইমা মাগফিরাতিকা, ওয়াল গাণিমাতা মিন কুল্লি বিররিন, ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইছমিন, লা-তাদা'আলী যানবান ইল্লা গাফারতাহু, ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু, ওয়ালা হাজাতা হিয়া লাকা রিজান, ইল্লা কাজাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ: -আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি সহিষ্ণু ও দয়ালু, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র তিনি, মহান আরশের প্রভু। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সারা জাহানের রব। আপনার কাছেই আমরা যাঞ্ছা করি, আপনার রহমত আকর্ষণকারী সকল পূণ্যকর্মের ওয়াসীলায়, আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত আকর্ষণকারী সকল ক্রিয়াকাণ্ডের বরকত, সকল নেক কাজ সাফল্য লাভের এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে নিরাপত্তা লাভের। আমার কোন গুনাহ যেন মাফ ছাড়া না থাকে। কোন সমস্যা যেন সমাধান ছাড়া না যায় আর আমার এমন প্রয়োজন যাতে রয়েছে আপনার সন্তুষ্টি তা যেন অপূরণ না থাকে, হে আর রাহমানুর রাহিমীন; হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[149]

সুতরাং দো'আর ক্ষেত্রে হাদিস শরিফে বর্ণিত উপরোক্ত দো'আটি অন্যান্য দো'আর সাথে নামাযের শেষে বিশেষভাবে পড়া যেতে পারে। তবে

[149] ইবনু মাজাহ হা .১৩৮৪, তিরমিজী হা .৪৭৯।

পড়তেই হবে–এমন নয়। নিজের মত করে দো‘আ করলেও কোনো অসুবিধা নেই।

সালাতুল ইস্তিখারা

'ইস্তেখারা' শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো, কল্যাণ কামনা করা, সঠিক দিক-নির্দেশনা চাওয়া।

ইস্তেখারা বলা হয়, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে না পৌঁছাতে পারলে অথবা কোনো বিষয় বাছাই/ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য পেতে চাইলে উল্লেখিত পদ্ধতিতে দো‘আ করাকে ইস্তিখারা বলে। যাতে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। যদি এটি নামাযের মাধ্যমে করা হয় তাহলে তাকে ‘‘সালাতুল ইস্তিখারা’’ বলা হয়। নামায বিহীন করা হলে, তাকে শুধু ‘‘ইস্তিখারা’’ বলে।

ইস্তেখারার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। [150]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী ত্বাকী উসমানী দা.বা. তার কিতাবে’[151] বলেন: কি চমৎকার নির্দেশনা !চিন্তা-চেতনায় এ শিক্ষা জাগরুক রাখলে জীবন বড় শান্তিময় হতে পারে। অনেক সময়ই মানুষ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, কিন্তু কোন কারণে যদি তা ব্যর্থ

[150] সূরা বাকারা ২১৬

[151] তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

হয়, মন খারাপ করে ও হতাশ হয়ে বসে পড়ে। আবার অনেক সময় কোন একটা বিষয় তার কাছে অপ্রীতিকর মনে হয় এবং তা থেকে বাঁচার জন্য সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু বাস্তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টির সম্মুখীন তাকে হতেই হয়। তখনও সে ভেঙ্গে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তোমার প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণ কিসে তা তুমি জান না, আল্লাহ তা'আলা জানেন। তুমি যা কামনা করছ বাস্তবে তা তোমার জন্য দুঃখজনকও হতে পারে, আর যা অপছন্দ করছ তা হতে পারে প্রভূত সুফলবাহী। কাজেই এর ফয়সালা আল্লাহ তা'আলারই উপর ছেড়ে দাও। সর্বান্তকরণে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং নিয়তি অনুযায়ী যা ঘটে তাতে খুশি থাক। অনেক সময়ই বাস্তব কল্যাণ তোমার দৃষ্টির আড়ালে থাকে বলে তুমি বুঝতে পার না। তা না-ই বোঝ, হাসিল হওয়াটাই বড় কথা। অন্ততপক্ষে এই সান্তনা তো লাভ করতেই পার যে, তোমার কাঙ্খিত জিনিস না পাওয়া আর অনাকাঙ্খিত বিষয় দেখা দেওয়ার ফলে তুমি যে সবর করবে, আখিরাতে সে জন্য মহাপুরস্কার আছেই। সুতরাং জিহাদসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ মূলমন্ত্র মাথায় রেখ।

প্রিয় আমল পিপাসু ভাই! আমাদের উচিত, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসলে ইস্তেখারা করা।

জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূল সা্ঃ আমাদেরকে যেমন কুরআন করীমের সূরা শিখাতেন, তেমনিভাবে সকল বিষয়ে ইস্তিখারা করতেও শিখাতেন।[152]

অন্য হাদিসে আসছে, নবীজি সা্ঃ বলেছেন, 'বনি আদমের সৌভাগ্য হলো, আল্লাহর কাছে ইস্তেখারা করা। বনি আদমের আরো সৌভাগ্য হলো,

---

[152] তিরমিজি, হা.৪৮০।

আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা। আর বনি আদমের দুর্ভাগ্য হলো, আল্লাহর নিকট ইস্তেখারা বন্ধ করে দেওয়া। বনি আদমের আরও দুর্ভাগ্য হলো, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া।[153]

ইস্তেখারা করার নিয়ম/পদ্ধতি:

প্রথমে উত্তমরুপে অজু করবে। তারপর ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। নামাযের পর দুই হাত উত্তোলন করে, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে, মনোযোগ সহকারে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে। দো'আর মধ্যে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীজির উপর দরুদ পাঠ করত: এই দোয়া পড়তে হবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي ومعاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي ومعاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

বাংলা উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখিরুকা বি-ইলমিকা, ওয়া আস্তাকদিরুকা বি-কুদরাতিকা, ওয়াআসআলুকা মিনফাদলিকাল আযীম। ফা-ইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু, ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু, **আন্না হা-যাল আমরা** খাইরুনলী, ফীহ- দ্বীনী ওয়া মা'আশী, ওয়া আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাকদুরহুলী, ওয়া-ইয়াসসিরহু লী। ছুম্মা বা-রিকলী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু, **আন্না হা-যাল আমরা**, শাররুনলী, ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী, ওয়া আ-ক্বিবাতি

---

[153] মুস্তাদরাক হাকেম, হা. ১৯০৩

আমরি, ফাসরিফহু আন্নী, ওয়াসরীফনী আনহু। ওয়াকদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কানা। সুম্মা আরদিনী বিহী।"

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্য চাচ্ছি, আপনার শক্তির সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহ চাচ্ছি। আপনি শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী। আমার কোনো জ্ঞান নেই। আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত।
হে আল্লাহ! আপনি যদি এ কাজটি আমার জন্য দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপন ও কাজের পরিণামের দিক থেকে ভালো মনে করেন, তাহলে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিন এবং সহজ করে দিন। তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন।
আর যদি আপনি এ কাজটি আমার জন্য দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপন ও কর্মের পরিণামের দিক হতে ক্ষতিকর মনে করেন, তাহলে আপনি আমার থেকে তা দূরে সরিয়ে দিন এবং আমাকে তা থেকে বিরত রাখুন। আর যেখান থেকেই হোক আপনি আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করে দিন ও তার ওপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।[154]

উক্ত দো'আ শেষ করে কারো সাথে কথা না বলে কিবলামুখী হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম থেকে জাগার পর মন যেদিকে সায় দিবে, বা যেদিকে আগ্রহী হয়ে উঠবে, সেটিই ফলাফল মনে করবে।[155]

উস্তাজে মুহতারাম মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী হাফি. বলেন, উল্লেখিত পদ্ধতি সিহাহ সিত্তার (হাদীসের) কিতাবে পাওয়া যায়। এছাড়া যত পদ্ধতি রয়েছে, রাসূল সা্ঃ থেকে প্রমাণিত পদ্ধতি বলা যাবে না। বাকি একদম

---

154 তিরমিজি, হা. ৪৮০, ইবনে মাজাহ, হা. ১৩৮০, রিয়াদুস সলিহীন, হা. ৭২২।

155 তুহফাতুল আলমায়ী: ২/৩৩৮।

বাতিল পদ্ধতিও বলা ঠিক নয়। কারণ এটি জানার পদ্ধতি যেহেতু কোন দ্বীনী বিষয় নয়। বরং দুনিয়াবী বিষয়ের ফায়সালা জানতে এমনটি করা হয়ে থাকে, তাই এটির ক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতার একটি দখল রয়েছে।

যেমন ডাক্তারী বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তখন অসুখ হলে নির্ধারিত পদ্ধতির চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। যেমন গলা বসে গেলে গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা ইত্যাদি। এসব হল অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। তেমনি কারো অভিজ্ঞতায় যদি এমন আমল করার দ্বারা ইস্তেখারাকৃত বিষয়ের ফলাফল স্পষ্ট হয়, আর সেটিকে তারা সুন্নত না মনে করে, সওয়াবের কারণ মনে না করে, তাহলে এটিকে বিদআত বলা যাবে না।
এর উপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু যদি এ পদ্ধতিকে সুন্নত মনে করে তাহলেই কেবল বিদআত হবে।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, 'এ দো'আর যেখানে **'হা-জাল আমরা'** শব্দটি আসবে, সেখানে যে কাজটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাওয়া হচ্ছে, সেটি মনে মনে উল্লেখ করা। পুনরায় সে বিষয়টি ভেবে নেওয়া। তারপর দরুদ পাঠ করে দো'আ শেষ করা।[156] ইস্তেখারা সমাপ্ত করে সিদ্ধান্তের ভার আল্লাহর উপর সোপর্দ করে নির্ভার হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ তাআলা কল্যাণকর ফায়সালা করবেন, এই বিশ্বাসে অটল থাকা।

ইস্তিখারার সংক্ষিপ্ত দোয়া

শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী ত্বাকী উসমানী হাফি. বলেন, অনেক সময় দেখা যায়, ইমারজেন্সি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় হাতে এই পরিমাণ সময়ও থাকে না যে, দুই রাকাত নামায

---

[156] তুহফাতুল আলমায়ি: ২/৩৩৮।

পড়ে ইস্তেখারার লম্বা দো'আ পড়া যায়। তখন হাদীসে বর্ণিত এই সংক্ষিপ্ত দো'আ পড়ে নিলেও ইস্তেখারা আদায় হয়ে যাবে।

১- (اللهم خرلي واخْتَرْلِي)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জন্য কোন পথ নির্বাচন করা উচিত, তা আপনিই পছন্দ করে দিন।[157]

উচ্চরণ: আল্লাহুম্মা খিরলী, ওয়াখতারলী।

২- (اللهم اهدِنِي وَسَدِّدْنِي)

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন।[158]

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাহদিনী, ওয়াসাদ্দিদনী।

❖কোন নামাযের পর কোন সূরা আমল করতে হয় এবং ফযীলত কি?

বিভিন্ন দ্বীনি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ফরজ নামাযের পর গুরুত্বের সাথে কিছু ফযীলতপূর্ণ সুরার আমল হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহে কি পাওয়া যায়, তা আমরা জানার চেষ্টা করবো।

এ বিষয়ে প্রথমত কথা হচ্ছে যে, কোন নামাযের পর কোন সূরা পড়তে হয় সুস্পষ্টভাবে কুরআন সুন্নাহের কোথাও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে হাদীস শরীফে নামাযের পরে বিভিন্ন সময়ের কিছু আমল পরিলক্ষিত হয়, যার সাওয়াব আকাশচুম্বি।

[157] ফাতহুল বারি: ১১/১৮৭।

[158] মুসলিম, হা. ২৭২৫।

এক. ফজরের নামাযের পরে সূরা ইয়াসিনের তেলোয়াত করা:
ফজরের পর নির্দিষ্ট কোনো সূরা পাঠের কথা যদিও সুস্পষ্টভাবে কোনো হাদীসে নেই। তবে একটি হাদীস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন,
مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة
যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে পড়ে। তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে। তারপর দুই রাকাত নামায পড়ে। সেই ব্যক্তির একটি হজ ও একটি উমরার সাওয়াব লাভ হয়। পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।[159]

আর কোরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম যিকির এবং সূরা ইয়াসিন কোরআনের রূহ। সুতরাং দিনের শুরুটা যদি সূরা ইয়াসিন দিয়ে করা হয় তাহলে তা অবশ্যই বরকতপূর্ণ হবে। এ জন্য বিশিষ্ট তাবিঈ ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে-স্বস্তিতে থাকবে। যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। (বর্ণনাকারী ইবনে যুরাইস)[160]

এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে সূরা ইয়াসিনের অনেকগুলো ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে,

[159] তিরমিজি, হা. ৫৮৬, তা'লীকুর রাগীব: ১/১৬৪, ১৬৫, মিশকাত, হা. ৯৭১।

[160] ফাযায়েলুল কুরআন, বর্ণনা নং ২১৮ পৃষ্ঠা: ১০১।

১- যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন ১বার পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা এর পরিবর্তে তার জন্য দশবার কুরআন পাঠের সাওয়াব দান করবেন। [161]

২- যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন দিনের শুরুভাগে পাঠ করবে তার প্রয়োজন পূরণ করা হবে।[162]

৩- রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করো।[163]

৪- যে ব্যক্তি রাতে সর্বদা সূরা ইয়াসীনের তিলাওয়াত করবে সে উক্ত রাত্রিতে মৃত্যুর পর শহীদি মর্যাদা লাভ করবে। [164]

সূরা ইয়াসীনের আরো অনেক ফযীলত পাওয়া যায়। যা একত্রিত করেছেন ‘‘তাফসীরে দুররে মানসুরে’’ আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতী রহ. (৯১১হি.)।

দুই. জোহরের নামাযের পর সূরা ফাতহের তিলাওয়াত করা:

জোহরের পরেও নির্দিষ্ট কোনো সূরা পাঠের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। আমরা সূরা ফাতহ্ তিলাওয়াত করি, কারণ এটি কোরআনের একটি ফজিলতময় সূরা। এই সূরার ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ ওমর রাযি.-কে বলেছেন,আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্যালোকিত সকল স্থান হতে উত্তম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ পাঠ করলেন, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ‘নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।[165]

---

[161] তিরমিজি, হা. ২৮৮৭।

[162] মিরকাত: ৫/৬৪, ফাতহুল মান্নান: ১০/৫২৮, সুনানে দারেমী, হা. ৩৪৬২, মু’জামুল আউসাত, (তাবরানী) হা. ৩৯০৩।

[163] আবু দাউদ, হা. ৩১২১, মিশকাত, হা. ১৬২২।

[164] মু’জামুল আওসাত, (তাবরানী) হা. ১০১০।

[165] বুখারি, হা. ৪১৭৭, ই.ফা.৩৮৬৪।

অন্য বর্ণনায় আসছে, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এরশাদ করেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে প্রিয়। তথা সূরা ফাতহ।[166]

তিন. আসরের নামাযের পর সূরা নাবার তিলাওয়াত করা:
আসরের পরেও নির্দিষ্ট কোনো সূরা পাঠের কথা হাদীসে নেই। আমরা সূরা নাবা তিলাওয়াত করি, কারণ এটি কোরআনের একটি ফজিলতময় সূরা। সূরা নাবা'র ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে,
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَرْدَ الشَّرَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
যে ব্যক্তি সূরা নাবা পাঠ করবে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন ঠাণ্ডা পানীয় দ্বারা তৃপ্ত করবেন।[167]

চার. মাগরিবের পরে বা রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসিরের কিতাবে অন্তিম রোগশয্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন এসেছে, ইবনে কাসীর, ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমীরুল মু'মিনীন ওসমান (রা.) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ যে কথোপকথন হয় তা নিম্নরুপ:
হযরত ওসমান (রা.): আপনার অসুখটা কি?
হযরত আ. ইবনে মাসউদ (রা.): আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

[166] মুসনাদে আহমাদ: ১/১১৪, আত তাফসীরুল মুনীর: (যুহিইলী রহ.) পৃ. ২৪৪।
[167] তাফসিরে কাশশাফ: ৬/৩০৩, তাফসীরে মাজমাউল বয়ান: ১০/২৩৭।

হযরত ওসমান : আপনার বাসনা কি?

হযরত আ. ইবনে মাসউদ: আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

হযরত ওসমান: আমি আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডাকব কি?

হযরত ইবনে মাসউদ: চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

হযরত ওসমান: আমি আপনার জন্যে সরকারী বায়তুল মাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?

হযরত ইবনে মাসউদ: এর কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত ওসমান: উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

হযরত ইবনে মাসউদ: আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র ও উপবাসে পতিত হবে। আমি তো আমার কন্যাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতিরাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করে।

এরপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ কে বলতে শুনেছি,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ ، لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, তাকে কখনও দারিদ্রতা স্পর্শ করবে না।[168]

পাঁচ. এশারের নামাযের পরে বা রাতে সূরা মুলক পাঠ সম্পর্কে হাদীস শরিফে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন,

من قَرَأَ تبَارك الَّذِي بِيَدِهِ الْملك كل لَيْلَة مَنعه الله بهَا من عَذَاب الْقَبْر ، وَكُنَّا فِي عهد رَسُول الله ﷺنسميها الْمَانِعَة ، وَإِنَّهَا فِي كتاب الله سُورَة من قَرَأَ بهَا فِي كل لَيْلَة فقد أَكثر وأطاب

---

[168] তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন: ৮/১০৬, সাফয়াতুত তাফাসীর: ৩/৩০৪, ইবনে কাসীর: ৪/২৮১, তারিখে দামিশক: ৩৬/৪৪৪, বাইহাকি: ৪/১১৯, হা. ২৪৯৮।

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তাবারাকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুলকু “সূরা মূলুক” পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,) আমরা রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর যুগে সূরাটিকে মানেআ’ বা বাঁধাদানকারী সূরা বলে আখ্যা দিতাম। এটি আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের মাঝে এমন একটি সূরা, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে পাঠ করবে সে অধিক ও উৎকৃষ্ট আমল করবে।[169]

অন্য বর্ণনায় আসছে, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এরশাদ করেন, কোরআনের মধ্যে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে, যা তার তিলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত তার জন্য সুপারিশ করতেই থাকবে। আর সূরাটি হলো তাবারাকাল্লাযী... তথা সূরা মুলুক।[170]

পাশাপাশি বর্ণনায় আসছে,
সূরা মুলুক তিলাওয়াতকারীর জন্য উক্ত সূরা সুপারিশ করতে থাকবে। এমন কি মাথার দিক, পায়ের দিক, সামনে ও পিছনের দিক থেকে কবরের আজাবকে দূরে সরিয়ে রাখবে।[171]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

জাবির রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তেলাওয়াত করা ছাড়া ঘুমাতেন না।[172]

---

169 নাসাঈ, হা. ১০৫৪৭।

170 তিরমিজি, হা. ২৮৯১, আবু দাউদ, হা. ১৪০০, মিশকাত, হা. ২১৫৩।

171 মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৮৩, মু’জামুল কাবীর ৯/১৩১।

172 তিরমিজি, হা. ২৮৯২, মিশকাত, হা. ২১৫৫।

প্রিয় আমল পিপাসু ভাই ও বোনেরা! উল্লেখিত সূরা গুলোকে সময়ের সাথে নির্দিষ্ট না করেও তিলাওয়াত করা যায়। অথবা যেহেতু স্পষ্ট আকারে নির্দিষ্ট করে কুরআন সুন্নাতে বলা হয়নি। তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃত হলেও ছেড়ে দেওয়া উচিত। অথবা কেউ এই আমল না করলে তাকে ভর্ৎসনা না করা উচিৎ।

দৈনন্দিন কোরআন তেলোওয়াতের ফযীলত:

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

"যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[173]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন :

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন একটি গৃহে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন অধ্যায়নে লিপ্ত) থাকে, তখন তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে রাখে, ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখে এবং

---

[173] ফাতির: আয়াত ২৯-৩০।

আল্লাহ তাআলা নিকটস্থ ফেরেশতাদের সঙ্গে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেন।[174]

অন্য বর্ণনায় আসছে, আবু মালেক আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম সা্ঃ এরশাদ করেছেন :
(القرآن حجة لك او عليك) "কুরআন তোমার পক্ষের কিংবা বিপক্ষের দলীল।[175] (তথা কেউ যদি কোরআন মেনে চলে কোরআন তার পক্ষে সাক্ষী স্বরুপ হবে। অন্যথায় তার বিপক্ষে সাক্ষী স্বরূপ হবে)।

আরো বর্ণিত হয়েছে,
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
(القرآن شافع مشفع فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار)
"কুরআন (কিয়ামতের দিন) সুপারিশকারী এবং তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রেখে তার অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।[176]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়:
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ
আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি রাসূল সা্ঃ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কুরআন মাজীদ পাঠ কর। কেননা,

---

[174] মুসলিম, হা. ৬৭৪৬।

[175] মুসলিম, হা. ২২৩।

[176] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা. ১২৪।

কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।[177]

অপর বর্ণনায় আসছে:
আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, "কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক কমলা লেবুর মত; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত।"[178]

অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়:
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে । আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ ।" (অর্থাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মীম, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।[179]

---

[177] মুসলিম, হা. ৮০৪, আহমাদ, হা. ২১৬৪২, ২১৬৫৩, ২১৬৮১, ২১৭১০, রিয়াদুস সলেহিন, হা. ৯৯৮।

[178] বুখারী, হা. ৫০২০, ৫৪২৭, মুসলিম, হা. ৭৯৭, তিরমিজি, হা. ২৮৬৫, নাসায়ী, হা. ৫০৩৮, আবূ দাঊদ, হা. ৪৮২৯।

[179] তিরমিজি, হা. ২৯১০, রিয়াদুস সলেহিন, হা. ১০০৬।

পাশাপাশি বর্ণনায় পাওয়া যায়:

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, “পবিত্র কুরআনের পাঠক, হাফেয ও তার উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, ‘তুমি কুরআন কারীম পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি খতম হবে।[180]

কুরআন তিলাওয়াতে দারিদ্রতা দূর হয় :

বহু মানুষের পরীক্ষিত আমল সূরা ইখলাস। এ সূরা সবারই মুখস্থ আছে। বেশি বেশি পড়লে রাব্বুল আলামিন অভাব মোচন করে দেবেন। সাহল ইবনে সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সা্ঃ এর কাছে দারিদ্র্যের অভিযোগ করল, রাসূল সা্ঃ তাকে বলেন, যখন তুমি ঘরে যাও তখন সালাম দেবে এবং একবার সূরা ইখলাস পড়বে। সাহাবি লাগাতার ক’দিন আমল করেন। ফলে কিছু দিনের মধ্যে তার দারিদ্র্য দূরীভূত হয়ে যায়।[181]

[180] তিরমিজি, হা. ২৯১৪, আবূ দাঊদ, হা. ১৪৬৪, আহমাদ, হা. ৬৭৬০।

[181] কুরতুবি: ২০/১৮৫।

দৈনন্দিন সদকার ফযীলত:

সদকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

নিশ্চয়ই আমার রব তো তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।[182]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে, তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।[183]

অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে:

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তা তোমাদের জন্য আরো ভাল; এবং এতে তিনি তোমাদের জন্য কিছু পাপ মোচন করবেন(১) আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্মক অবহিত(২)।[184]

(১) অর্থাৎ গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষন্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার। (২) বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকমের দান-সদকাকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্ব

---

[182] সুরা সাবা: আয়াত ৩৯।

[183] ক্বুরতুবী: (উক্ত আয়াতের ব্যাখায়)।

[184] সুরা বাক্বারাহ: আয়াত২৭১।

প্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে দ্বীনী ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। দ্বীনী উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়।[185]

হাদীস শরীফে এসেছে,
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল সা্ঃ বলেছেন, ‘মানুষের প্রতিটি হাতের জোড়ার জন্য তার উপর সদকা রয়েছে। সূর্য উঠে এমন প্রত্যেক দিন মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সদকা।[186]

অন্য বর্ণনায় আসছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের প্রত্যেকটি গ্রন্থির উপর প্রতিদিনের সদাক্বাহ্ ধার্য রয়েছে। দু’ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করে দেয়াও একটি সদাক্বাহ্। কোন ব্যক্তিকে সওয়ারীর উপর আরোহণে সাহায্য করা অথবা তার মালামাল সওয়ারীর উপরে তুলে দেয়াও একটি সদাক্বাহ্। তিনি আরো বলেন, সকল প্রকার ভাল কথাই এক একটি সদাক্বাহ্, নামাজ আদায়ের জন্য মাসজিদে যেতে যতটি পদক্ষেপ ফেলা হয় তার প্রতিটিই এক একটি সদাক্বাহ্ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও

---

[185] মা'আরিফুল কুরআন: (উক্ত আয়াতের ব্যাখা)।

[186] বুখারী, হা. ২৭০৭।

একটি সদাক্বাহ্।[187]

অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, "আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদকাহ জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইল্‌ম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দু'আ করতে থাকে।[188]

পাশাপাশি বর্ণনায় আসছে,
আদী ইব্‌নু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ......... জাহান্নামকে ভয় কর এক টুকরো খেজুরের (দানের) বিনিময়ে হলেও।[189]

কাছাকাছি বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ প্রতারক-ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও উপকার করে তার খোটা দানকারী জান্নাতে যেতে পারবে না।[190]

---

[187] বুখারী, হা. ২৯৮৯, মুসলিম, হা. ২২২৫, ই.ফা. ২২০৪।

[188] মুসলিম, হা. ১৬৩১, তিরমিজি, হা. ১৩৭৬, নাসায়ী, হা. ৩৬৫১, আবূ দাউদ, হা. ২৮৮০, ৩৫৪০, আহমাদ, হা. ৮৬২৭, দারেমী, ৫৫৯।

[189] বর্ণনাকারী আ'মাশ (রহ.)...... খায়সামা (রহ.) থেকে অনুরূপই বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "যদি পবিত্র কথার বদলেও হয়" কথাটুকু যোগ করেছেন। মুসলিম, হা. ১০১৬, আহমাদ, হা. ১৮২৭৪। ই.ফা. ৭০০৪, বুখারী, হা. ৭৫১২।

[190] তিরমিজি, হা. ১৯৬৩।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ কোন ব্যক্তির নিজ জীবদ্দশায় এক দিরহাম সদাক্বাহ করা তার মৃত্যুর সময়ে একশো দিরহাম সদাক্বাহ করার চেয়েও উত্তম।[191]

অন্য হাদীসে আসছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সাঃ বলেছেনঃ প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।[192]

অপর হাদীসে আসছে:

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল সাঃ ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেনঃ হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদাক্বাহ করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেনঃ কী কারণে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেনঃ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদা সতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তারা বললেনঃ আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি

---

[191] আবু দাউদ, হা. ২৮৬৬, জামি'উস সাগীর, হা. ৪৬৪৩, মিশকাত, হা. ১৭৮০।

[192] বুখারী, হা. ১৪৪২।

কোথায়, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেনঃ একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কি নামাজও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।[193]

সদকার অন্যান্য ফযীলত সমূহ:

১- আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে শান্ত করে।[194]

২- গুনাহ মিটিয়ে দেয়।[195]

৩- মূসিবত দূরিভূতকারী। ৭০ প্রকারের বিপদকে প্রতিহত করে।[196]

৪- উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম।[197]

৫- সদকাহ করাতে সম্পদ হ্রাস পায় না।[198]

এমন অসংখ্য ফযীলত হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়।

---

[193] বুখারী, হা. ৩০৪, মুসলিম, হা. ৭৯-৮০, আহমাদ, হা. ৫৪৪৩।

[194] সহীহ আত্তারগীব, হা. ১০১৮, ইবনে হিব্বান, হা. ৩৩০৯, শু'আবুল ঈমান, হা. ৩০৮০।

[195] মুসনাদে আহমাদ, হা. ২২১৩৩, সহীহ আত্তারগীব, হা. ৯৮৩।

[196] জামেউস সাগীর, (সুয়ুতী রহ.) হা. ৭৯৮৪।

[197] বুখারী, হা. ১৪২৭।

[198] মুসলিম, হা. ৬৩৫৬।

দৈনন্দিন এস্তেগফারের গুরুত্ব ও ফযীলত

দৈনন্দিন যাবতীয় বিপদ-আপদ দূরিকরণে ইস্তেগফারের ভূমিকা অপরিসীম। যে যত বেশি আল্লাহ তা'আলার দরবারে ইস্তেগফার করবে তার মান-মর্যাদা ততই বাড়তে থাকবে। এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামুল্লায় সূরা নূহে এভাবে এরশাদ করেছেন।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ۝

অতঃপর (আমার কওমকে) বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন।

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।[199]

নুহ (আ.) আল্লাহর কাছে বন্যা থেকে নিজ ছেলেকে পরিত্রাণ দেয়ার আবেদন করেন। কিন্তু এটিকে আল্লাহ তা'আলা অন্যায় বলে গণ্য করলে নুহ (আ.) এ বলে ইস্তেগফার করেন, 'হে প্রভু, আমি আপনার কাছে এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে পানাহ চাই যার ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আপনি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না করলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।'[200]

---

[199] সূরা নুহ: আয়াত ১০-১১-১২।

[200] সূরা হুদ: আয়াত ৪৭।

হাদীসে বিশ্ব নবী সা. ইস্তেগফারের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তাওবাহ করে থাকি।[201]

এ ছাড়াও ভিবিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে (তারা মাসুম তথা গুনাহমুক্ত থাকা সত্ত্বেও) তাদের ইস্তেগফার করার বিষয়ে পাওয়া যায়। আর আমরাতো সাধারণ মানুষ প্রতি নিয়ত গুনাহে লিপ্ত সুতরাং আমাদেরতো আরো বেশিই ইস্তেগফার করা দরকার?

আদম আ. এর ইস্তেগফার

হজরত আদম আ. যখন (নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার দরুন) লজ্জিত হয়ে দুনিয়ায় আগমন করলেন, তখন তিনি তওবা ইস্তিগফারে লিপ্ত হয়ে গেলেন। সে সময়ও আল্লাহ তা'আলা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে পথ-নির্দেশনা দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কিছু বাক্য শিখিয়েছিলেন।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ : তারা দুই জন বলল- হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের নফসের উপর অত্যাচার করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। এটা বিশুদ্ধ ও অধিকাংশদের অভিমত।[202]

---

[201] বুখারী, হা. ৬৩০৭ ই.ফা. হা. ৫৭৫৪।

[202] সুরা আরাফ, ৭ : আয়াত ২৩।

দ্বিতীয় আরেকটি মত যা আল্লামা কাযী বায়যাবী রহ. তার আনওয়ারুত তানযিল ওয়া'আসরারুত তা-ওয়ীলে উল্লেখ করেছেন যে, কেউ কেউ এই বক্তব্যও নকল করেছেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ اَلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা যাদ্দুকা, লা ইলাহা ইল্লা আংতা জালামতু নাফসি ফাগফিরলি ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আংতা।[203]

মুসা (আ.) এক কিবতি মিসরিকে ঘুষি মেরে হত্যা করে ফেললে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়ে এ বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, 'হে রব, আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।[204]

ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, 'আল্লাহ তো তিনি যার ব্যাপারে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।[205]

ইউনুস (আ.) মাছের পেটে গিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন, (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী।।[206]

দাউদ (আ.) এর ব্যাপারে এসেছে, 'আর দাউদ মনে করল আমি তাকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছি। তখন সে তার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।[207]

---

[203] তাফসীরে বায়যাবী: ২৭২ পৃ.(মাকতাবাতুল ইসলাম), সূরা বাকারা ৩৭নং আয়াত দ্র:।

[204] তাফসীরে ইবনে কাসীর: সূরা কাসাস ১৬ নং আয়াত দ্র:।

[205] সূরা শুআরা: আয়াত ৮২।

[206] সূরা আম্বিয়া: আয়াত ৮৭।

ইস্তেগফারের ফযিলতঃ

ইস্তেগফারও আল্লাহ তা‘আলার একটি ইবাদত। খালেছ দিলে ইস্তেগফার করার কারনে গুনাহ মাফ হয়, রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ হয়, সন্তান ও সম্পদ দ্বারা সাহায্য করা হয় এবং জান্নাতের অধিকারী করা হয়। ইস্তেগফারের ফলে সর্বধিক থেকে শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ “তিনি তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন”।[208]

ইস্তেগফারের ফলে সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রাপ্য হক অর্জিত হয়। ইস্তেগফারের ফলে বালা-মুসিবত দুরীভূত হয়।

অসংখ্য আয়াত ও হাদীস থেকে ইস্তেগফারের যে ফযীলত বুঝে আসে, সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো;

১. এটি গোনাহকে মুছে ফেলে ও বান্দার মর্যাদা উন্নীত করে।[209]

২. এর মাধ্যমে বালা-মুসিবত দূর হয়।[210]

৩. রিজিক প্রশস্ত হয়।[211]

৪. সুখময় জীবন পায়। (পরিবারে শান্তি আসে)।[212]

৫. শরীরে ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়।[213]

৬. বিপদ-আপদ চিন্তা পেরেশানি দূর হয়।[214]

---

[207] সূরা সোয়াদ: আয়াত ২৪।

[208] সুরা হুদ: আয়াত ৫২।

[209] সূরা নূহ: আয়াত ১০।

[210] আবু দাউদ, হা. ১৫১৮, ইবনে মাজাহ, হা. ৩৮১৯।

[211] আবু দাউদ, হা. ১৫১৮, ইবনে মাজাহ, হা. ৩৮১৯।

[212] সূরা হুদ: আয়াত ৩।

[213] সূরা হুদ: আয়াত ৫২।

[214] আবু দাউদ, হা. ১৫১৮, ইবনে মাজাহ, হা. ৩৮১৯।

৭. আজাব ও গজব থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়।[215]

৮. রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়।[216]

খালেছ দিলে ইস্তেগফার পড়লে, তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

দৈনন্দিন মিসওয়াক করার গুরুত্ব ও ফযীলত

গুরুত্ব: মিসওয়াক করা আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মিসওয়াক প্রসঙ্গে প্রায় ৪০টি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন,

ما جاءني جبراءيل قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحفي مقدم في

যখনই জিবরাইল আ. আমার কাছে আসতেন, তখনই আমাকে মিসওয়াকের নির্দেশ দিতেন। এতে আমি আশঙ্কাবোধ করলাম যে মিসওয়াক করে আমি আমার মুখের সম্মুখ দিক ক্ষয় করে দেব।[217]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বা দিনে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন তখনই অজু করার আগে মিসওয়াক করতেন।[218]

অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,. لولا ان اشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة যদি আমি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর মনে

[215] আনফাল: আয়াত ৩৩।

[216] সুরা হুদ: আয়াত ৫২।

[217] মুসনাদ আহমদ, হা. ২২২৬৯।

[218] আবু দাউদ, হা. ৫৫।

না করতাম, তবে অবশ্যই তাদের এশার নামায বিলম্ব করার এবং প্রত্যেক নামাযের আগে মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।[219]

মেসওয়াক করার ফযিলতঃ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب। মিসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কার করার উপকরণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।[220]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গিয়েছেন, বারবার ঠাণ্ডা পানিতে হাত ভিজিয়ে চেহারায় মুছছিলেন, আর বলছিলেন, إن للموت سكرات 'নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে অনেক যন্ত্রণা।'

তিনি মিসওয়াকের কথা ভোলেননি। এমনকি অন্যের কাছ থেকে মিসওয়াক চেয়ে নিয়ে মিসওয়াক করেছেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজে মিসওয়াক চিবুতে পারছিলেন না। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) তা চিবিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি তা দিয়ে মিসওয়াক করেছেন। মিসওয়াকের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল এত যত্ন, এত আগ্রহ।[221]

দৈনন্দিন সালামের গুরুত্ব ও ফযীলত

যে অন্যের জন্য দো'আ করে, তার দো'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। অন্যের জন্য দো'আ করার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হলো, সালাম।

সালামের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন,

---

[219] বুখারি, হা .৮৮৭, মুসলিম, হা. ২৫২।

[220] নাসাঈ, হা. ৫, মিশকাত ,হা .৩৫০।

[221] বুখারী, হা. ৮৯০, ৪৪৪৯, ৫৬১০।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ !তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।"[222]

তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةٗ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗۚ﴾

অর্থাৎ "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন।"[223]

অন্য জায়গায় বলেন: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾

অর্থাৎ "যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়)সালাম দেওয়া হয়(, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর।"[224]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল, 'সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কী?' তিনি বললেন, "ক্ষুধার্তকে অন্নদান কর এবং পরিচিত পরিচিত অপরিচিত সকলকে ব্যাপকভাবে [225] সালাম পেশ করবে।

[222] সূরা নূর: আয়াত ২৭।

[223] সূরা নূর: আয়াত ৬১।

[224] সূরা নিসা: আয়াত ৮৬।

[225] বুখারী, হা. ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসলিম, হা. ৩৯, তিরমিজি, হা. ১৮৫৫, নাসায়ী, হা. ৫০০০, আবূ দাউদ, হা. ৫১৯৪।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عليه السلام، قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولئِكَ . نَفرٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ . فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيتِكَ . فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আল্লাহ যখন আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করলেন। তখন তাঁকে বললেন, ‘তুমি যাও এবং ঐ যে ফিরিশ্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কী জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি।’ সুতরাং তিনি (তাঁদের কাছে গিয়ে) বললেন, ‘আসসালামু আলাইকুম’। তাঁরা উত্তরে বললেন, ‘আসসালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহ’। অতএব তাঁরা ‘ওয়ারাহমাতুল্লাহ’ শব্দটা বেশী বললেন।[226]

সালামের ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, ‘‘তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে

---

[226] বুখারী, হা. ৩৩২৬, ৬২২৭, মুসলিম, হা. ২৮৪১, আহমাদ, হা. ৮০৯২, ১০৫৩০।

ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।"[227]

অন্য বর্ণনায় আসছে, ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, সালামের মাধ্যমে কথপোকথন আরম্ভকারী অহংকার থেকে মুক্ত।[228]

দৈনন্দিন দরুদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

গুরুত্ব: রাসূল সা্ঃ এর প্রতি দরুদ পাঠ করতে পারা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। রাসূল সা্ঃ এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার আদেশ, ও তার মাহাত্ম্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামুল্লাহতে ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ-সালাত পেশ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করো এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[229]

সালাত আরবি শব্দ তা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—রহমত, দো'আ, দরুদ, ইস্তিগফার, তাসবীহ ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হলে রহমত। বান্দার পক্ষ থেকে হলে দরুদ। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে হলে ইস্তিগফার, দো'আ ও সম্মান অর্থ বুঝায়।

---

[227] মুসলিম, হা. ৫৪, তিরমিজি, হা.২৬৮৮, আবূ দাউদ, হা. ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ, হা. ৬৮, ৩৬৯২, আহমাদ, হা. ৮৮৪১, ৯৪১৬, ৯৮২১।

[228] শুআবুল ঈমান, হা. ৮৪০৭, আত্তানওয়ীর শরহুল জামেউস সাগীর: ৪/৫৭৯, মিশকাত, হা. ৪৬৬৬।

[229] সূরা আহযাব: আয়াত ৫৬।

সালাম আরবী শব্দ অর্থ নিরাপত্তা, শান্তি। এর উদ্দেশ্য ত্রুটি, দোষ ও বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকা।

দরুদ পাঠের বিধানঃ মুসলমানের সন্তান বালেগ হওয়ার পর পুরো যিন্দেগিতে কমপক্ষে একবার রাসূল সা্ঃ এর উপর দরুদ পড়া ফরজ।[230] এক মজলিসে একাধিকবার রাসূল সা্ঃ এর নাম শুনলে প্রথমবার দরুদ পড়া ওয়াজিব। পরেরবার গুলোতে পাঠ করা মুস্তাহাব।[231]

হাদীস শরীফে আসছে,

عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, "প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।"[232]

অন্য বর্ণনায় আসছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ: করা হলে সে দরুদ পাঠ করে না।'[233]

দরুদ পাঠের ফযীলত

وَعَنِ ابنِ مَسعُود رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً

---

[230] তাফসীরে কুরতুবী: পৃ.২৩২।

[231] রদ্দুল মুহতার: ১/৫১৬, আল মউসুআতুল ফিক্বহিয়্যাহ: ২৭/২৩৪ পৃ.।

[232] তিরমিজি, হা. ৩৫৪৬, আহমাদ, হা. ১৭৩৮।

[233] তিরমিজি, হা. ৩৫৪৫,৩৫৪৬।

ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সব লোকের চাইতে আমার বেশী নিকটবর্তী হবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার উপর দরূদ পড়বে।”[234]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاص، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً

‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ কে বলতে শুনেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন।”[235]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,
“---এবং তার ১০টি পাপ মোচন হবে ও সে ১০টি মর্যাদায় উন্নীত হবে।”[236]

এছাড়া বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে দরুদ পাঠের অনেক **ফযীলতের** কথা বর্ণিত হয়েছে,

১: আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে রহমত, মাগফেরাত ও মর্যাদা লাভ হয়।[237]

২: ফেরেশতারা উক্ত ব্যক্তির জন্য মাগফেরাতের দো‘আ করতে থাকে।[238]

---

[234] তিরমিজি, হা. ৪৮৪।

[235] মুসলিম, হা. ৩৮৪, তিরমিজি, হা. ৩৬১৪, নাসায়ী, হা. ৬৭৮, আবূ দাউদ, হা. ৫২৩, আহমাদ, হা. ৬৫৩২।

[236] নাসায়ী, খন্ড ১ পৃ. ১৪৫, মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৩ পৃ. ১০২; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: খন্ড ২পৃ. ৪৩।

[237] মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৬৬৪, মুসতাদরাকে হাকেম, হা. ২০১৯, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড ২পৃ. ৪৩।

৩: পাঠকারীর জন্য রাসূলের শাফা‘আত অবধারিত হয়ে যায়।[239]

৪: দরুদ পাঠের মাধ্যমে চিন্তা দূরিভূত হয় ও গুনাহ মাফ হয়।[240]

৫: পাঠকারী বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।[241]

৬: পাঠকারী দরূদ পাঠের মাধ্যমে দো‘আ করলে তার দো‘আ কবুল হয়।[242] (অন্য বর্ণনায় আসছে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, যে পর্যন্ত তুমি তোমার নবী সা্ঃ উপর দরূদ না পড়বে ততক্ষণ দু‘আ আসমানে যাবে না, আসমান-যমীনের মাঝে লটকে থাকবে।[243]

৭: পাঠকারী কিয়ামতের দিন নবীজীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে।[244]

৮: পাঠকারীর উভয় জগতের সকল প্রয়োজন পূরণ হবে।[245]

৯: পাঠকারীর পাত্র ভরে দেওয়া হবে।[246]

১০: দান করার সামর্থ্য নেই এমন ব্যক্তি পাঠ করলে সদকার সাওয়াব পাবে।[247] উক্ত দরূদ হলো, (উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লী আলা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়ারাসূলিকা, ওয়াসাল্লি আলাল মু’মিনীনা ওয়াল মু’মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি)।

---

[238] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হা. ৬/৪০ , ইবনে মাজাহ, হা. ৯০৭।

[239] আবু দাউদ, হা.৫২৩, তিরমিজি, হা. ৩৬১৪, মু‘জামুল কাবীর, (তবারানী) ৫/৪৪৮১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২৫৪

[240] তিরমিজি, হা. ২৪৫৭, মিশকাত, হা. ৯২৯।

[241] তিরমিজি, হা. ৩৩৮০।

[242] আল মু‘জামুল আউসাত্ব, হা. ৭২১।

[243] তিরমিজি: ১/১১০।

[244] তিরমিজি: ১/১১০।

[245] তিরমিজি, ২/৭২, মাজমা‘উয যাওয়াইদ: ১০/২৪৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ: ৬/৪৫।

[246] আবু দাউদ: ১/১৪১।

[247] সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩/১৮৫।

শুক্রবার দরুদ পাঠের ফযীলত

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ ادَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْك وَقَدْ أَرَمْتَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: بَلِيْتَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

আওস ইবনু আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন: জুমু'আর দিন হলো তোমাদের সর্বোত্তম দিন। এ দিনে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁর রূহ কবয করা হয়েছে। এ দিনে প্রথম শিঙ্গা ফুৎকার হবে। এ দিন দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকার দেয়া হবে। কাজেই এ দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করবে। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের দরূদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে? অথচ আপনার হাড়গুলো পচে গলে যাবে? (বর্ণনাকারী বলেন, এ 'আরামতা' শব্দ দ্বারা সহাবীগণ [আরবি] 'বালীতা' অর্থ বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আপনার পবিত্র দেহ পঁচে গলে মাটিতে মিশে যাবে।) তিনি সা্ঃ বললেন, আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাটি তাদের দেহ নষ্ট করতে পারবে না)।[248]

দৈনন্দিন পাগড়ি পরিধানের বিধান

পাগড়ি পরিধান করাঃ

বলা হয় পোষাক আভিজাত্যের প্রতীক। অনেক সময় পোষাক মানুষকে খারাপ কাজ হতে দূরে রাখতে সহায়ক হয়। পোষাকের মধ্যে সবচেয়ে

[248] আবূ দাঊদ, হা. ১০৪৭, নাসায়ী, হা. ১৩৭৪, ইবনু মাজাহ্‌, হা. ১০৮৫, ১৬৩৬, ইবনু আবী শায়বাহ্‌, হা. ৮৬৯৭, আহমাদ, হা.১৬১৬২, সুনানে দারিমী, হা. ১৬১৩, ইবনু খুযায়মাহ্‌, হা. ১৭৩৩, ইবনু হিব্বান, হা. ৯১০।

উত্তম পোষাক বিশ্ব নবী সা্ঃ এর পোষাক। তথা পাঞ্জাবী, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদি। সাধারাণত এ ধরনের পোষাক পরিধান করে কোন ব্যাক্তি কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত যেসকল পোশাক ব্যবহার করতেন পাগড়িও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের নিকট পাগড়ি একটি পছন্দনীয় পোশাক ছিল এটি আরবের একটি ঐতিহ্যও বটে।

কিন্তু এটি সুন্নাতে আদিয়া, তথা ঐচ্ছিক বিষয়। পরিধান করাটা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় পাগড়ি ব্যবহার করেছেন, তা বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

আমাদের আকাবিরদের মাঝে অধিকাংশ আকাবীর পাগড়ি পরিধান করতেন। এখনও অনেকে পরিধান করেন। কেউ কেউ সবসময় পরিধান করেন। আর কেউ কখনও কখনও পরিধান করেন।

পাগড়ির প্রতি উৎসাহ দেওয়া জায়েজ। তবে তা ছেড়ে দিলে এটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, কটু মন্তব্য করা উচিত নয়। এবং এটাকে ওয়াজিব/ আবশ্যকীয় বিষয় মনে করা এবং যে পাগড়ি পরিধান করে না তাকে অপমান করা অনুচিত।

সুলাইমান ইবনে আবি আবদিল্লাহ রাহ. বলেন, আমি মুহাজির সাহাবীগণকে কালো, সাদা, হলুদ, সবুজ বিভিন্ন রঙের পাগড়ি পরতে দেখেছি।[249]

---

[249] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. ২৫৪৮৯।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে বের হলে সঙ্গে পাগড়ি নিতেন এবং তা পরিধান করতেন।[250]

জেনে রাখা দরকার যে, পাগড়ি নির্দিষ্ট কোনো সময়, স্থান বা বিশেষ ইবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। পাগড়িকে নামাযের জন্য অপরিহার্য মনে করা অথবা পাগড়িসহ নামায আদায় করলে বিশেষ ছওয়াব (যেমন, এক রাকাতে পঁচিশ রাকাত বা সত্তর রাকাতের সওয়াব) হবে-এমন ধারণা করা ভুল; বরং পাগড়ি পোশাকেরই একটি ঐচ্ছিক অংশ।

সুন্নত দুই প্রকার, ১- সুন্নতে হুদা। ২- সুন্নতে যায়েদা।
ইবাদাত ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত সুন্নত, সুন্নতে হুদা। যা সুন্নতে মু'আক্কাদা। সুন্নাতে মু'আক্কাদা ছেড়ে দিলে (কেয়ামতের দিন) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।
সুন্নাতে যায়েদা হুজুর সা. এর কাপড় ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত সুন্নত। এটি মুস্তাহাব পর্যায়ের। তা গ্রহণ করা উত্তম। কেউ ছেড়ে দিলে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না।[251]

বি: দ্র: শরীয়তে পাগড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন আকার আকৃতি এবং সাইজ (লম্বা, প্রস্ত) এর নির্ধারণ সহীহ কোন হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নেই। পরিধানকারী যে কোনভাবে পাগড়ি পরিধান করতে পারে। শর্ত হলো, কোন বিশেষ জাতির সাথে সাদৃশ না হতে হবে। (যেমন শিখদের পাগড়ির

---

[250] মুসলিম, হা. ২৫৫২।

[251] ফতোয়া শামী: (কিতাবুত তাহারাত সুন্নাতের সজ্ঞা ও তার উদ্দেশ্য) ১/২১৮ যাকারিয়া, যাদুল মাআদ: ১/১৩৫, দেওবন্দ ওয়েবসাইট https://darulifta-deoband.com/home/ur/hadith-sunnah/158386 ফতোয়া নং ১৫৮৩৮৬।

সাথে মিল থাকা) অবশ্যই সাদা পাগড়ি অনেক পছন্দনীয়। এমনিভাবে পাগড়িতে শামলাহ (প্রান্তস্থিত কারু) ঝুলানো সুন্নত ও পছন্দনীয়।[252]

তবে পাগড়িকে অবহেলার চোখে দেখারও সুযোগ নেই। কেননা বিভিন্ন হাদিস দ্বারা পাগড়ীর মর্যাদা বুঝা যায়। যেমন এক হাদীসে এসেছে : عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَا الْمَلَائِكَةِ অর্থাৎঃ তোমরা পাগড়ি বাঁধো; কেননা তা ফেরেশতাদের প্রতীক।[253]

সূরা আলে ইমরানে[254] উল্লেখ আছে, বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ তা'আলা পাঁচ হাজার ফেরেশতা মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে পাঠিয়েছিলেন, তাদের সবাই পাগড়িবাঁধা ছিল।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাগড়ি বেঁধে দিলেন। অতঃপর বললেন :

فاعتموا فإن العمامة سيما الإسلام وهى حاجز بين المسلمين والمشركين

অর্থাৎ: পাগড়ি বাঁধো; কারণ, পাগড়ি ইসলামের নিদর্শন এবং কুফর ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী।[255]

এ ছাড়াও আরো কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ পাগড়ির অনেক ইহতেমাম করতেন। যেমন: অজু অবস্থায় রাসূল

---

[252] ফতোয়ায়ে রহীমিয়া: ১০৭,১৫৫ দারুল ইশাআত,(খাসায়েলে নববী, ইমামাহ কি ফাযায়েল ওয়া মাসায়ল) দেওবেন্দ ওয়েব সাইট https://darulifta-deoband.com/home/ur/clothing-lifestyle/145681 ফতোয়া নং ১৪৫৬৮১।

[253] শুআবুল ইমান, হা. ৫৮৫১।

[254] আলে ইমরান: আয়াত ১২৫।

[255] জামেউল আহাদিস, হা. ৩৮৩৫৪।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথায় পাগড়ি ছিলো।[256] খুতবার সময় পাগড়ি ছিলো।[257] মক্কা বিজয়ের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথায় পাগড়ি ছিলো।[258]

বদ নজর থেকে রক্ষার আমল

কোন কিছুর প্রতি চোখের খারাপ দৃষ্টি বা কোন কিছু দেখে তার প্রতি হিংসাত্মক দৃষ্টিই হলো বদ নজর। বদ নজরের উৎপত্তি মানুষের চোখ থেকে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ার স্থান তার অন্তর।

মানুষের উপর বিভিন্ন কারণে বদ নজর হয়ে থাকে। বদ নজর শুধু মানুষের পক্ষ থেকে হয় এমনটি নয়, বরং বদ জিন্নাত থেকেও বদ নজর হয়ে থাকে। মানুষের কু-দৃষ্টিই মূলত বদনজর। এতে বেশি আক্রান্ত হয় শিশুরা। তবে বড়রাও এ থেকে মুক্ত নয়। তাই সবার উচিত বদ নজর থেকে বাঁচতে কুরআনী আমল ও দো'আ পাঠ করা।

নজর লাগা বা বদ নজর কি সত্য?

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাঃ এরশাদ করেনঃ

عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق

বদ নজর সত্য।[259] অর্থাৎ এর বাস্তবতা রয়েছে, এর কু-প্রভাব লেগে থাকে।

অপর বর্ণনায় আসছে, ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী সাঃ বলেছেনঃ العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين

---

[256] মুসলীম, হা. ২৭৪।

[257] মুসলীম, হা. ৩২০৩।

[258] মুসলীম, হা. ১৩৫৮।

[259] বুখারী: ১০/২১৩।

বদ নজর (এর খারাপ প্রভাব) সত্য এমনকি যদি কোন বস্তু ত্বাকদীরকে অতিক্রম করতঃ তবে বদ নজর তা অতিক্রম করত।[260]

কোন ব্যক্তি বদ নজরে আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে হলে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিম্নোক্ত আমলগুলো করা যেতে পারে:[261]

---

[260] মুসলিম: ১৪/১৭১, তিরমিজি, হা. ২০৫৯, আহমদ: ৬/৪৩৮।

[261] (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা যখন মিশরে পৌঁছবে তখন সকলে একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং বিভিন্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করিও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব না। কেননা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কেবল আল্লাহ। তার উপর আমার আস্থা রয়েছে। ভরসাকারীকে ভরসা করলে তার প্রতিই করতে হবে।
আর যখন তারা গিয়েছিলেন অথচ আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত কোন কিছু থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। তবুও ইয়াকুবের (আলাইহিস সালাম) অন্তরে একটি আশা ছিল যে, তিনি তা পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তিনি ইলমে (নবুওয়াতের) বাহক ছিলেন। অথচ অনেক লোক তা জানে না। (সূরা ইউসুফঃ ৬৭-৬৮)
হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত দু'টি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাই বিনইয়ামিনকে তার অন্য ভাইদের সাথে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। আয়াতে ইয়াকুবের (আলাইহিস সালাম) উক্ত নির্দেশনার ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) মুহাম্মাদ বিন কা'ব, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা এবং সুদী (রাঃ) প্রমূখ বলেছেন যে, এমনটি তিনি বদ নজরের ভয়ে বলেছিলেন। কেননা তার সন্তানরা খুবই সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের উপর লোকদের বদনজরের আশঙ্কা করে উক্ত নির্দেশ দেন । কেননা বদনজরের ক্রিয়া বাস্তব; কিন্তু পরে তিনি এও বলেনঃ তবে এ ব্যবস্থা আল্লাহর তাকদীরকে প্রতিহত করতে পারবে না। তিনি যা চাবেন তাই হবে----------- পরিশেষে তা তাদের জন্য বদনজর হতে প্রতিরোধক হিসেবেই আল্লাহর হুকুমে কাজ হয়েছিল------- সংক্ষিপ্ত ।
(তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ২/৪৮৫)
পরের পৃষ্ঠায়:

১- কোন ব্যক্তির নজর লেগেছে তা যদি সঠিকভাবে জানা যায়, তবে তাকে অজু করতে বলতে হবে। অতঃপর উক্ত অজুর পানি দ্বারা বদ নজরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোসল করাতে হবে।

আম্মাজান আয়শা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ যে ব্যক্তির বদ নজর অন্যের উপর লাগতো, তাকে অযু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো। এরপর ঐ পানি দিয়ে তাকে গোসল করানো হতো, যার উপর বদ নজর লাগতো।[262]

২- হাদীসে বর্ণিত দো'আগুলো পাঠ করে আক্রান্ত রোগীর উপর ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। যেমন,
আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, জিবরীল আ. রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (জিবরীল) বললেন,

দো'আ-:

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাই 'ইন য়ুযিকা, মিন শার্রি কুল্লি নাফসিন, আও আইনিন হাসিদিন, আল্লাহু য়াশফীকা, বিসমিল্লাহি আরক্বিকা।

(পূর্বের সাথে সম্পর্কিত): হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, (لَيُزْلِقُونَكَ) "তোমার প্রতি বদনজর দিবে।" অর্থাৎ তারা তোমাকে হিংসার প্রতিফলন ঘটিয়ে রুগী বানিয়ে দিবে, যদি আল্লাহর তোমার প্রতি হেফাযত না থাকে। আয়াতটি প্রমাণ বহন করে যে, বদনজরের কুপ্রভাবের বাস্তবতা রয়েছে, আল্লাহর হুকুমে।

[262] আবু দাউদ, হা. ৩৮৪০।

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি, সে সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদ নজর থেকে আল্লাহ আপনাকে শিফা দিন; আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।[263]

সুতরাং দো'আটি পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বার বার ফুঁ দিন। ইনশা-আল্লাহ, ধীরে ধীরে বদ নজর কেটে যাবে।

৩- রাসূলুল্লাহ সা: হাসান ও হুসাইন রাযি.-কে এই বাক্যগুলো দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন,

দো'আ-: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

উচ্চারণ: উ'য়ীযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়তানিন ওয়াহাম্মাতিন, ওয়ামিন কুল্লি 'আইনিন লাম্মাতিন।

অর্থাৎ, আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র কালামের আশ্রয়ে রাখতে চাই সব ধরনের শয়তান হতে, কষ্টদায়ক বস্তু হতে এবং সব ধরনের বদ-নজর হতে।

(দো'আটি এক সন্তানের জন্য পড়লে 'উয়ীযুকা', দুইজনের জন্য 'উয়ীযুকুমা' আর দুইয়ের অধিক হলে 'উয়ীযুকুম' বলতে হবে।)[264]

আক্রান্ত ব্যক্তিকে উক্ত দো'আ তিন বা ততোধিক বার পড়ে ফুঁ দিবেন। ইনশা-আল্লাহ, ধীরে ধীরে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

৪- সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস, তিনবার আক্রান্ত ব্যক্তি নিজে পড়ে অথবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে ফুঁ দিবেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[263] মুসলিম, হা. ৫৫১২।

[264] বুখারী, হা. ৩৩৭১।

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺيَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتْ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু’টি অবতীর্ণ হল, তখন ঐ সূরা দু’টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সব পরিহার করলেন।[265]

৫- সূরা কলমের শেষের দুটি আয়াত:

وَ اِنۡ یَّکَادُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لَیُزۡلِقُوۡنَکَ بِاَبۡصَارِهِمۡ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکۡرَ وَ یَقُوۡلُوۡنَ اِنَّهٗ لَمَجۡنُوۡنٌ ﴿۵۱﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۵۲﴾[266]

যে দো‘আগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সে দো‘আগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেই পানি পান করাবে। আর অবশিষ্ট পানি দিয়ে প্রয়োজনমত একবার বা একাধিক বার গোসল করাবে। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী আরোগ্য লাভ করবে। আলেমগণ এ আমলটির কথাও উল্লেখ করেছেন।

বিপদ-আপদের আমল

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেরেশানিতে লিপ্ত হই, কোন রাস্তা খুঁজে পাই না উক্ত পেরেশানি থেকে বের হওয়ার। সূরা ইউনুসে বিপদ-আপদ ও বিভিন্ন মুসিবত থেকে রক্ষা পেতে একটি আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আমলটি হলো,

দো‘আ-: (لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَکَ ٭ۖ اِنِّیۡ کُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ)

---

[265] তিরমিজি, হা. ২০৫৮

[266] সূরা কালাম: আয়াত ৫১-৫২।

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন।

ফযীলতঃ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এটি ইউনূস (আ.) এর দো'আ যা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় পাঠ করেছিলেন। জেনে রাখ! যে কোন মুসলিম যে কোন ব্যাপারে যখনই্ তার রবের কাছে এই দো'আটি করবে, তিনি তা কবুল করবেন।[267]

দৈনন্দিন বর্জনীয় বিষয়

- ❖গীবত-পরনিন্দা, পরচর্চা, চোগলখুরী ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।
- ❖ঝগড়া-ফেসাদ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।
- ❖রিয়া- লৌকিকতা থেকে বিরত থাকা।
- ❖হিংসা- বিদ্বেষ থেকে বিরত থাকা।
- ❖মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি থেকে বিরত থাকা।
- ❖ওযনে/মাপে কম দেওয়া থেকে বিরত থাকা।
- ❖গালিগালাজ, অশ্লীল কথা-বার্তা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।
- ❖চুরি- ডাকাতি, ছিন্তাই, রাহাজানি থেকে বিরত থাকা।
- ❖অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকা।
- ❖তাবিজ-কবজ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা।
- ❖জেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

---

[267] তিরমিজি: ৯/৪৭৯, নাসাঈ: ৬/১৬৮, আহমদ: ১/১৭০, তাফসীরে ইবনে কাসীর, পৃ. ৩৭৮, সূরা আম্বীয়া: আয়াত ৮৭ দ্র:।

❖মুখের দ্বারা বা হাতের দ্বারা কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

❖অপরের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকা। বিশেষভাবে দুর্বলব্যক্তি।

❖কুরআন ও হাদিসে তথা আল্লাহ ও রাসূল সাঃ যা কিছু হারাম বলেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

সাপ্তাহিক আমলসমূহ

সাত দিনের নামগুলো বাংলা ও আরবীতে নিম্নরূপঃ

শনিবার	ইয়ামুছ ছাবত	يَوم السبت
রবিবার	ইয়ামুল আহাদ	يَوم الأحَد
সোমবার	ইয়ামুল ইছনাইন	يَوم الإثنين
মঙ্গলবার	ইয়ামুছ ছুলাছা	يَوم الثلاثاء
বুধবার	ইয়ামুল আর’বিআ	يَوم الأربعاء
বৃহস্পতিবার	ইয়ামুল খামিছ	يَوم الخميس
শুক্রবার	ইয়ামুল জুমু‘আ	يَوم الجمعة

সাপ্তাহে সাতদিন। বাংলায় আমরা যে সাতদিনের নাম জানি, ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায়, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষীরা তাদের দেবতাদের নামে গ্রহের নাম এবং গ্রহের নামে সাপ্তাহের নামকরণ করেছে।

আমরা মুসলমান হিসেবে এবং আমাদের আমলগুলো আরবী তারিখের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় আমরা আরবী নামগুলোও উল্লেখ করেছি। বিস্তারিত জানার জন্য উকিপিড়িয়া সার্চ করতে পারি।[268]

[268] https://roar.media/bangla/main/history/seven-days-name

এ সাতদিনের করণীয় প্রসঙ্গে কুরআন সুন্নাহ তালাশ করলে ইয়াউমুল ইছনাইন, ইয়াউমুল খামিছ ও ইয়াউমুল জুমু'আর আমলের কথা পাওয়া যায়ঃ তথা সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার।

১-সোমবার ও বৃহস্পতিবারের আমল-:

সাপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবারের আমল তালাশ করলে নববী জিন্দেগীতে আমরা রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর রোজা রাখার আমল খুঁজে পাই।

সাপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার স্বয়ং বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ সা্ঃ রোজা রাখতেন বলে হাদীসে পাওয়া যায়। সুতরাং এ সকল দিনে রোজা রাখা সুন্নত।

হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সা্ঃ কে সোমবার দিনে রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এ দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, আর এদিনই আমার উপর “কুরআন” নাজিল হয়েছে।[269]

অপর বর্ণনায় আসছে:

হযরত রাবিআ ইবনুল গাজ (রহঃ) হযরত আয়েশা (রা.) এর কাছে রাসূল সা্ঃ এর রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেনঃ রাসূল

---

[269] মুসলিম, হা. ২৮০৭, সহীহ ইবনে খুজাইমা, হা. ২১১৭, আবু দাউদ, হা. ২৪২৮, মুসনাদে আহমাদ, হা. ২২৫৫০।

সা্ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার ব্যাপারে খুবই মনোযোগী ছিলেন।[270]

অপর আরেকটি বর্ণনায় আসছে: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সা্ঃ ইরশাদ করেছেনঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল উপস্থাপন করা হয় [আল্লাহর কাছে]। আর আমার আমল উপস্থাপন করার সময় রোযারত থাকাকে পছন্দ করছি।[271]

সপ্তাহের দিনসমূহের মাঝে শুধু একদিন রোযা রাখাতে কোন সমস্যা নেই। তবে শুধু শুক্রবার বা শুধু শনিবার রোযা রাখা মাকরূহে তানজিহী। হারাম বা মাকরূহে তাহরিমী নয়।[272] এটি মুশরিকদের বিরোধিতা করার জন্য। কারণ তারা এ দু'দিন রোযা রাখতো। হাদীসে নির্দিষ্ট করে শুধু এ দু'দিন আলাদা আলাদা রোযা রাখতে অপছন্দ করা হয়েছে। তবে আগে বা পরের দিনের সাথে মিলিয়ে একসাথে দু'টি রোযা হলে কোন সমস্যা নেই।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সা্ঃ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ জুমআর আগে অথবা পরে একদিন মিলানো ব্যতিত শুধু জুমআর দিন রোযা রেখো না।[273]

---

[270] ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৩৯, ইবনে হিব্বান, হা. ৩৬৪৩, নাসায়ী কুবরা, হা. ২৪৯৬, মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুয়া, হা. ১৬৬৫, মুসনাদুশ শামীন, হা. ৪৩৯, আল'মুজামুল আওসাত, হা. ৩১৫৪।

[271] তিরমিজি, হা. ৭৪৭, নাসায়ী কুবরা, হা. ২৬৬৭, মুসনাদে আহমাদ, হা. ২১৭৫৩, মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ২৬১৭, শুয়াবুল ঈমান, হা. ৩৫৪১, কানযুল উম্মাল, হা. ২৪১৯১।

[272] তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ: পৃ.৩১৫।

[273] বুখারী, হা. ১৮৮৪।

অপর বর্ণনায় আসছে:

عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس. قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا. قالت لا قال فأفطري

হযরত জুআইরিয়া বিনতে হারেস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শুক্রবার তার কাছে এলেন। সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি গতকাল রোযা ছিলে? তিনি বললেনঃ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার কি আগামীকাল রোযা রাখার ইচ্ছে আছে? তিনি বললেনঃ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেল।[274]

পাশাপাশি বর্ণনায় পাওয়া যায়:

قال يزيد الصماء – أن النبى –صلى الله عليه وسلم– قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه

ইয়াজিদ সাম্মা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল সা্ঃ ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা শনিবার দিন রোযা রেখো না আবশ্যকীয় রোযা ছাড়া। যদি তোমাদের কেউ কোন কিছু না পায় আঙ্গুরের বাকল বা গাছের কাঠ ছাড়া। তাহলে সে যেন এটাই চুষে নেয়।[275]

২- (জুম‘আবার) শুক্রবারের আমলঃ

---

[274] বুখারী, হা. ১৮৮৫, আবু দাউদ, হা. ২৪২৪, ইবনে হিব্বান, হা. ৩৬১১, ইবনে খুজাইমা, হা. ২১৬২।

[275] আবু দাউদ, হা. ২৪২৩, সুনানে দারেমী, হা. ১৭৪৯, নাসায়ী কুবরা, হা. ২৭৬২, ইবনে হিব্বান, হা. ৩৬১৫, ইবনে খুজাইমা,
হা. ২১৬৩, মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৭৬৮৬, মুসনাদুশ শামীন, হা. ৪৩৪।

সাপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো, জুম‘আর দিন। হাদীসের ভাষ্যমতে জুম‘আর দিনের ফযীলত ঈদের দিন হতেও বেশি বলে পাওয়া যায়।

জুমু‘আর দিন আল্লাহ্‌র নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে অধিক সম্মানিত। এর দলিল হচ্ছে:

১- আবু লুবাবা ইবনু আবদুল মুনযির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা্‌ঃ বলেছেন,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুম‘আর দিন হলো সপ্তাহের দিনসমূহের নেতা এবং তা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। এ দিনটি আল্লাহ্‌র নিকট কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে অধিক সম্মানিত। কেননা এ দিনে রয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য– **১.** এ দিন আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেন। **২ .**এ দিনই আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান। **৩ .**এ দিনই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দান করেন। **৪.** এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন বান্দা তখন আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন, যদি না সে হারাম জিনিসের প্রার্থনা করে। **৫ .**এ দিনই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই জুম‘আর দিন শংকিত হয়।[276]

২- অপর হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা্‌ঃ বলেছেন,

---

[276] ইবনে মাজাহ, হা. ১০৮৪, আহমাদ, হা. ১৫১২০, মিশকাত, হা. ১৩৬৩।

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا

যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জু‘মআর দিন। কেননা এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।[277]

৩- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজী সা্ঃ ইরশাদ করেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

‘‘যে কোনো মুসলমান জুম‘আর দিনে অথবা রাতে মৃত্যু বরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের ফিৎনা থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।[278]

জুম‘আর দিনের কয়েকটি আমল ও ফযীলত

মর্যাদাপূর্ণ এই দিনের অনেক আমল হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু আমল ধারাবাহিক উল্লেখ করা হচ্ছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ – إِنْ كَانَ عِنْدَهُ – ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَيَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) ও আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমু’আর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে, তারপর জুমু’আর নামায আদায়ের জন্য মাসজিদে যাবে,

---

[277] মুসলিম, হা. ৮৫৪।

[278] মুসনাদে আহমদ, ১১/১৪৭, তিরমিজি, হা. ১০৭৪।

সেখানে (সামনে যাওয়ার জন্য) লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত নামায আদায় করে ইমামদের খুতবার জন্য বের হওয়া থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত সময় নীরবতা অবলম্বন করবে- তাহলে এটা তার জন্য এ জুমুআহ্ ও তার পূর্ববর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আরো তিন দিনের গুনাহেরও কাফফারা হবে। কেননা নেক কাজের সাওয়াব (কমপক্ষে) দশ গুণ হয়।[279]

জুমআর দিনের আমলসমূহ:

১ .গোসল করা। ২ .উত্তম পোশাক পরিধান করা। ৩ .সুগন্ধি ব্যবহার করা। ৪ .মনোযোগের সঙ্গে খুতবা শোনা। ৫. যথাসম্ভব দ্রুত মসজিদে যাওয়াঃ

এই দিনের গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে দ্রুত মসজিদে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! জুম'আর দিনে যখন নামাযের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত ছুটে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝো।[280]

অপর এক বর্ণনায় আসছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى باب الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

---

[279] আবু দাউদ, হা. ৩৪৩, আহমাদ, ৩/৮১, ইবনু খুযাইমাহ্, হা. ১৭৬২।

[280] সুরা জুমআ: আয়াত ৯।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল সা্ঃ বলেছেন, জুম'আর দিন মসজিদের দরজায় ফেরেশতারা অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার আগে আসে সে ওই ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কোরবানি করে। এরপর যে আসে সে ওই ব্যক্তি যে একটি গাভী কোরবানি করে। এরপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগি দানকারীর ন্যায়। তারপর ইমাম যখন বের হন তখন ফেরেশতাগণ তাদের লেখা বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনতে থাকেন।[281]

৬ .সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করা: মর্যাদাপূর্ণ এই দিনের বিশেষ একটি আমল হচ্ছে সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করা। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা্ঃ বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সুরা কাহাফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুম'আ পর্যন্ত নূর উজ্জ্বল করা হবে।[282]

অপর বর্ণনায় আসছে:

عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেনঃ যে ব্যক্তি সূরাহ আল-কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জালের ফিত্বনাহ হতে মুক্তি পাবে।[283]

৭ .বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা: এই দিনের আরেকটি আমল হচ্ছে নবীজির ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা। এই মর্মে রাসুল সা্ঃ বলেন, দিনসমূহের মধ্যে জুম'আর দিনই সর্বোত্তম। এই দিনে হজরত আদম (আ(.কে সৃষ্টি করা

---

[281] বুখারি, হা. ৯২৯।

[282] আমালুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ, হা. ৯৫২।

[283] আবু দাউদ, হা. ৪৩২৩।

হয়েছে। এই দিনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এই দিনে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। এই দিনে সমস্ত সৃষ্টিকে বেহুশ করা হবে। অতএব তোমরা এই দিনে আমার ওপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়ে থাকে।[284] (বিশেষ দ্র:, দরূদের সতন্ত্র আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।)

৮. জুম'আর নামাযের পূর্বে (কাবলাল জুম'আ) চার রাকাত ও (বা'দাল জুম'আ) পরে ৪ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা: প্রিয় আমল পিপাসু ভাই! বর্তমান সমাজে এই আমলটি একেবারেই অবহেলিত বললেই চলে। এর কিছু কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো, কিছু নামধারী শায়েখ বলেন, জুম'আর নামাযের পূর্বে বা পরে ৪ রাকাত সুন্নাত নামে কোন নামায নাই। এটি স্পষ্ট মিথ্যা বৈ কিছুই নয়। এবিষয়ে মারফু হাদীস থাকা সত্বেও তারা কিভাবে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করে আমার বোধগম্য নয়। তাদের ফাঁদে পা দিয়ে অনেক সরলমনা মুসলমান ভাই এই নামাযটিকে পরিত্যাগ করেছে। অথচ এবিষয়ে স্পষ্ট মারফু (যে সনদ সহী সুত্রে রাসূল পর্যন্ত পৌছেছে)। আল্লাহর কাছে এর জবাবদিহিতা সম্পর্কে ভয়ে থাকা দরকার।

নিম্নে কয়েক্টি হাদিস ও সাহাবাদের আমল সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে;

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল:

১- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন,

كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع قبل الجمعة أربعا . لا يفصل في شيء منهن

[284] আবু দাউদ, হা. ১০৪৭।

রাসূলুল্লাহ সা঩ঃ জুমআর পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। মাঝে সালাম ফেরাতেন না।[285]

২- আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা.) বর্ণনা করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، قبل الظهر، وقال : إ
نها ساعةتُفْتَح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.

আল্লাহর রাসূল সা঩ঃ সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে চার রাকাত নামায পড়তেন। এবং বললেন ‘এই সময় (সূর্য ঢলার পর) আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়। আমি চাই, এ সময় আমার কোনো নেক আমল ওপরে যাক।[286]

এ হাদীসে সূর্য ঢলার পর চার রাকাত নামাযের কথা এসেছে। এটিই জুমার দিন ‘কাবলাল জুমা’, অন্যান্য দিন ‘কাবলায যোহর’। যেহেতু ছয়দিন তা কাবলায যোহর তাই একে বলা হয়েছে ‘কাবলায যোহর’। নতুবা এ নামাযের যে হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে (অর্থাৎ সূর্য ঢলার সময় আসমানের দরজা খোলা হয়, এ কারণে এ সময় কোনো নেক আমল পাঠানো উচিৎ’) তা তো জুমার দিনেও আছে। জুমার দিনও তো সূর্য ঢলে এবং আসমানের দরজা খোলে। সুতরাং ঐ দিন চার রাকাত রহিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। পরবর্তী হাদীস থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।[287]

৩- আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত-

---

285 ইবনে মাজাহ, হা. ১১২৯, আল মুজামুল কাবীর, হা. ১৬৪০। এর সনদ দুর্বল।

286 আশ শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ, তিরমিজি, হা. ২৯৫; তিরমিজি, হা. ৪৮২; মুসনাদে আহমদ খ. ৬, পৃ. ৪১১, হা. ১৫৩৯৬, ইমাম তিরমিযীর মতে, হাদীসটি ‘হাসান’।

287 তাকরীর: মুফতী লুৎফর রহমান ফরায়েজী হাফি.।

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت : يا رسول الله إنك تُدْمِنهذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، فقال : إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتىيُصَلي الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير؟ قلت : أفي كلهن قراءة؟ قال : نعم، قلت : هلفيهن تسليم فاصل؟ قال : لا.

নবী সা্ঃ সর্বদা সূর্য ঢলার পর চার রাকাত নামায পড়তেন। আমি আরজ করলাম, আল্লাহর রাসূল! আপনি সর্বদা সূর্য ঢললে চার রাকাত নামায পড়েন (এর তাৎপর্য কী?) ইরশাদ করলেন, সূর্য ঢলার পর আসমানের দরজা খোলা হয়, এরপর যোহর পড়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। আমি চাই, ঐ সময় আমার কোনো নেক আমল ওপরে যাক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রতি রাকাতে কি কুরআন পড়তে হবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। বললাম, এর মাঝে কি সালাম ফিরাতে হবে? তিনি বললেন, 'না'।[288]

এ হাদীস বিভিন্ন সনদে মুসনাদে আহমদ সহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদগত মান কমাজকম 'হাসান লিগায়রিহী'।[289]

সাহাবায়ে আজমাইন ও খায়রুল কুরুনের আমল:

১- জাবালা ইবনে সুহাইম (রাহ.) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,

عن جَبَلة بن سُحَيْم، عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام ثم بعدالجمعة ركعتين ثم أربعا ،.

'তিনি জুমার আগে চার রাকাত পড়তেন। মাঝে সালাম ফেরাতেন না।'[290]

---

288 আশ শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ, তিরমিজি, হা. ২৯৩; মুসনাদে আহমদ, হা. ২৩৫৩২।

289 (দ্র. টীকা, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: খ. ৪, পৃ. ২৭৩, (৫৯৯২); পৃ. ১১৫ (৫৪০৫) শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা। শায়খ শুআইব আরনাউত তো মুসনাদে আহমদের টীকায় (হাদীস ২৩৫৫১) একে 'সহীহ লিগায়রিহী' বলেছেন।

290 শরহু মাআনিল আছার: তহাবী পৃ. ১৬৪-১৬৫।

২-আবু ওবায়দা (রাহ.) বর্ণনা করেন,

عن أبي عُبَيْدة، عن عبد الله قال : كان يصلي قبل الجمعة أربعا.

(আববাজান) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জুমার আগে চার রাকাত পড়তেন।[291]

৩- তাবেয়ী ক্বাতাদা রাহ.ও একথাই বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জুমার আগে চার রাকাত পড়তেন, জুমার পরেও চার রাকাত পড়তেন।[292]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) শুধু নিজে চার রাকাত পড়তেন এমন নয়, তিনি অন্যদেরও চার রাকাত কাবলাল জুমা পড়ার আদেশ দিতেন।

৪- তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী (রাহ.) বর্ণনা করেন,

كان عبد الله يأمر أن نُصَلِّي قَبْلَ الجُمْعة أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعد ها ركعتينثم أربعا.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদেরকে জুমার আগে চার রাকাত এবং জুমার পরে চার রাকাত পড়ার আদেশ করতেন। পরে যখন আলী (রা.) আগমন করলেন তখন তিনি আমাদেরকে জুমার পরে প্রথমে দুই রাকাত এরপর চার রাকাত পড়ার আদেশ করেন।[293]

---

291 মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: খন্ড ৪, পৃ. ১১৪ (৫৪০২)।

292 -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক খন্ড ৩, পৃ. ২৪৭ (৫৫২৪)।

293 মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক খন্ড ৩, পৃ. ২৪৭ (৫৫২৫)

নফল নামাযের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া যায়, আদেশ দেওয়া যায় না। আদেশ করার অর্থ, এই নামায অন্তত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, যেমন পরের চার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

এ বর্ণনার সনদ সহীহ ও মুত্তাছিল।

উস্তাজে মুহতারাম মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী হাফি. বলেন, এই বর্ণনায় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, খলীফায়ে রাশিদ আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) যখন কুফায় এসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর শিক্ষা দেখলেন এবং তাঁর আদেশ সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি কাবলাল জুমার বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করেননি, শুধু বা'দাল জুমা চার রাকাতের সাথে আরো দুই রাকাত যোগ করার আদেশ করেছেন। ফলে পরবর্তী সময়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) সহ আরো অনেক ইমামের নিকটে, জুমার পরের সুন্নত সর্বমোট ছয় রাকাত। এ থেকেও প্রমাণিত হয় খলীফায়ে রাশিদ আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) এর নিকটেও কাবলাল জুমার সুন্নত চার রাকাত।

এ শুধু উপরোক্ত চার, পাঁচজন সাহাবীরই আমল নয়, খাইরুল কুরূনে সাহাবা-তাবেয়ীনের সাধারণ আমল এটিই ছিল।

৯ .দো‘আর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া: জুম‘আর দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ একটি আমল হচ্ছে, দো‘আর প্রতি মনোনিবেশ করা। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্াঃ বলেন, জুম‘আর দিনের বারো ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত এমন আছে যে, তখন কোনো মুসলমান আল্লাহর নিকট যে দো‘আ করবে আল্লাহ তা কবুল করেন।[294]

হাদিসে আসছে:

[294] আবু দাউদ, হা. ১০৪৮।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলে আকরাম সা্ঃ বলেনঃ জুমু'আর দিনের যে মুহূর্তে (দু'আ ক্ববূল হওয়ার) আশা করা যায় তা আসরের পর হতে সূর্যাস্তের মধ্যে খোঁজ কর।[295]

অপর একটি হাদিসে শুক্রবার আসরের নামাজের পর একটি দো'আ পাঠের ফযীলত উল্লেখ হয়েছে, তা হলো

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِه وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা।[296]

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি উম্মি নবী মুহাম্মদ সা্ঃ এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত ও প্রভূত শান্তি বর্ষণ করো।

ফযীলত: নবীজি সা্ঃ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আসরের নামাযের পর নিজ স্থানে বসে উক্ত দুরূদ আশি বার পাঠ করবে, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হবে এবং তার আমলনামায় আশি বছরের ইবাদত বন্দেগীর সওয়াব লেখা হবে। (বি:দ্র: এই হাদীসটি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ইহয়াউ উলুমুদ্দীন দেখা যেতে পারে, অথবা এই লিংকে প্রবেশ করুন।[297]

---

[295] তিরমিজি, হা. ৪৮৯, মিশকাত, হা. ১৩৬০।

[296] আদদুররুল মানযুদ ফিস সলাতি ওয়াস সালামি আলা সাহিবিল মাক্বামিল মাহমূদ: (ইবনে হাজর হায়তামী রহ. ৯৭১) পৃ. ১৬৯ দারুল মিনহাজ

[297] সূত্র ইসলাম ওয়েব: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/75386/

[297] **السوال**: سؤال عن ما صحة القول الذى يقول أن من صلى العصر يوم الجمعة وقال في مكان صلاته اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 80 مرة غفر الله ذنوبه ثمانين سنة وإن مات قبل الثمانين أو صلى أكثر

১০. সালাতুত তাসবীহের নামায আদায় করা:
আদায়ের পদ্ধতি ও ফযীলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ আব্বাস ইবনে আব্দিল মুত্তালিবকে বলেছেন, হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না? আমি কি আপনাকে প্রদান করব না? আমি কি আপনার নিকটে আসব না? আমি কি আপনার জন্য দশটি সৎ গুনের বর্ণনা করব না? যা করলে আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের ও পিছনের, নতুন ও পুরাতন, ইচ্ছায় ও ভুলবশত কৃত, ছোট ও বড়, গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন? আর সে দশটি সৎ গুন হলো: আপনি চার রাকাত নামায পড়বেন। প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। প্রথম

فإن ما بقي عنه يذهب إلى والديه أوأولاده وإذا كان هذا غير صحيح فهل فاعله يثاب على ما كان يفعله طلبا لجزاء الله أفيدونا ؟ جزاكم الله خيرا

الجواب :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فالحديث الذى سألت عنه أورده الغزالي فى إحياء علوم الدين حيث قال : يستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقد قال صلى الله عليه وسلم : من صلى علي في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة، قيل: يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة . انتهى . لكن بدون زيادة : وإن مات قبل الثمانين .. إلى آخره ، وقد علق الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب الإحياء قائلا:

حديث من صلى علي في يوم الجمعة ثمانين مرة الحديث أخرجه الدار قطني من رواية ابن المسيب قال أظنه عن أبي هريرة وقال حديث غريب وقال ابن النعمان حديث حسن . انتهى ، وقال المناوي في فيض القدير : وضعفه ابن حجر.

وعليه فالحديث قد اختلف في تحسينه وتضعيفه , وإذا افترضنا كونه ضعيفا فإن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم 19826 :، هذا بالإضافة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة يوم الجمعة كما أشار الغزالي فيما نقلناه عنه عاليه وفي الحديث : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه.. الحديث رواه أبوداود وغيره وصححه الألباني كما أن في يوم الجمعة ساعة إجابة وقد ورد أنها بعد العصر مطلقا ، والجمهور على أنها آخر ساعة قبل غروب شمس يوم الجمعة وذلك إنما يكون بعد العصر ، وراجع الفتوى رقم 4205 :، وبالتالى فيرجى إن شاء الله تعالى لمن عمل بما في الحديث المذكور الحصول على الثواب المشتمل عليه. والله أعلم.

রাকাতে যখন কিরাআত পড়া শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। এরপর রুকুতে যাবেন এবং রুকু অবস্থায় (উক্ত দু'আটি) ১০ বার পড়বেন। এরপর রুকু থেকে মাথা ওঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদায় যাবেন। সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন অতঃপর ১০ বার পড়বেন। এরপর আবার সিজদায় যাবেন এবং সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা ওঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এ হলো প্রতি রাকাতে ৭৫ বার। আপনি চার রাকাতেই অনুরূপ করবেন।

দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসবে তখন আগে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়বে তারপর তাশাহুদ পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাত ও চতুর্থ রাকাতেও উক্ত নিয়মে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। তাসবীহের বাংলা উচ্চারণ: হলো-"সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"

(যদি আপনি প্রতিদিন আমল করতে পারেন, তবে তা করুন। আর যদি না পারেন, তবে প্রতি জুম'আয় একবার। যদি প্রতি জুম'আয় না করেন তবে প্রতি মাসে একবার। আর যদি তাও না করেন তবে জীবনে একবার)।[298]

[298] আবু দাউদ, হা. ১২৯৭, ইবনে মাজাহ, হা. ১৩৮৭, সহীহ ইবনে খুজাইমা, হা. ১২১৬, সুনানে বায়হাকী কুবরা, হা. ৪৬৯৫।

কোন এক স্থানে উক্ত তাসবীহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম পড়লে পরবর্তী যে রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে তথাকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করে নিবেন। আর এই নামাযে কোন কারণে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে সেই সাজদা এবং তার মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। তাসবীহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা যাবে না, তবে আঙ্গুল চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে।

বিঃ দ্রঃ সালাতুত তাসবীহ পড়ার আরো একটি নিয়ম রয়েছে। তবে উল্লিখিত নিয়মটি উত্তম।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

মাসিক আমলসমূহ

ইংরেজি মাস: ইংরেজি মাস হিসেবে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়। আরবীতে ৩৫৪ দিনে একবৎসর হয়। তথা আরবী মাসের তুলনায় ইংরেজি মাসে ১১দিন বেশি হয়ে থাকে।[299]

ইংরেজিতে আমরা যে মাসগুলোর নাম জানি, ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায়, বর্তমানে আমরা যে ক্যালেন্ডার (ইংরেজি) ব্যবহার করি, তার নাম মুলত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার বা খ্রিস্টান ক্যালেন্ডার। ১৫৮২ সালে প্রথম এই ক্যালেন্ডার ব্যবহার শুরু করেন পোপ দ্বাদশ গ্রেগরি।

ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাস গুলোর নাম প্রধানত উঠে এসেছে রোমানদের জীবনধারা, দেব-দেবীর প্রতি মান্যতা এবং পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। বিস্তারিত জানার জন্য উকিপিড়িয়া সার্চ করতে পারি।[300]

আমরা মুসলমান হিসেবে এবং আমাদের আমলগুলো হিজরী সন তথা আরবী তারিখের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় আমরা আরবী নামগুলো উল্লেখ করেছি।

---

[299] আল মা'আঈরুশ শরঈয়াহ: ২/৮৮৪, আদ্দুররুল মুখতার মা'আ রদ্দিল মুহতার: ৩/২৬৬ আযহার প্রকাশণী।

[300] https://roar.media/bangla/main/history/origin-of-the-months-from-english-calender

হিজরী সন গণনার ইতিহাস:

ইসলাম ধর্মের শেষ বার্তাবাহক বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কুরাইয়শদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে মক্কা থেকে মদীনা চলে যান। তার এই জন্মভূমি ত্যাগ করার ঘটনাকে ইসলাম ধর্মে 'হিজরত' আখ্যা দেয়া হয়। তাঁর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই হিজরী সাল গণনার সূচনা হয়। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) এর শাসনামলে ১৭ হিজরী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর সাত বছর পর চন্দ্র মাসের হিসাবে এই পঞ্জিকা প্রবর্তন করা হয়। হিজরতের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ফলেই হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসনামলে যখন মুসলমানদের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র পঞ্জিকা প্রণয়নের কথা উঠে আসে তখন তারা সর্বসম্মতভবে হিজরত থেকেই এই পঞ্জিকা গণনা শুরু করেন। যার ফলে চান্দ্র মাসের এই পঞ্জিকাকে বলা হয় ‘হিজরী সন’।[301]

চান্দ্র মাস মোট ১২টি:

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কালামুল্লাতে এরশাদ করেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

নিশ্চয়ই আসমান সমূহ ও যমিনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাস বারটি।[302]

---

301 সূত্র উকিপিড়িয়া: https://bn.wikipedia.org/wiki/

302 সূরা ত্বাওবা: আয়াত ৩৬।

১-মুহাররম :এর অর্থ হারামকৃত, মর্যাদাপূর্ণ। জাহেলি যুগে যেহেতু এই মাসে কোনো ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত করা নিষিদ্ধ ছিল। তাই এই মাসকে 'মুহাররমুল হারাম' নামকরণ করা হয়েছে।

২-সফর :সফর শব্দটি সিফরুন থেকে নির্গত। এর অর্থ শূন্য হওয়া, জাহেলি যুগে সফর মাসে লোকেরা যুদ্ধের জন্য বের হয়ে গেলে ঘর শূন্য হয়ে যেত, তাই এ মাসের নাম 'সফর' রাখা হয়েছে।

৩-রবিউল আউয়াল: শাব্দিক অর্থ: বসন্তের শুরু। এই মাসের নামকরণকালে ফসলে রবি তথা বসন্তকাল ছিল। তাই তার নামকরণ হয়েছে রবিউল আউয়াল।

৪-রবিউস সানি: শাব্দিক অর্থ: বসন্তকালের শেষ পর্যায়। এর নামকরণকালে তৎকালীন আরবে বসন্তের শেষার্ধ চলছিল। তাই এর নাম রবিউল আখের বা শেষ বসন্ত রাখা হয়েছে।

৫-জুমাদাল উলা :জুমাদা শব্দটি এসেছে জুমুদ থেকে। এর অর্থ জমে যাওয়া, স্থবির হওয়া। আর 'উলা' অর্থ প্রথম। যখন এই মাসের নাম রাখা হয়, তখন আরবে ঠাণ্ডার মৌসুম শুরু হয়। আর ঠাণ্ডার কারণে অনেক জিনিস জমে যায়। এ জন্য এ মাসের নাম 'জুমাদাল উলা' রাখা হয়েছে।

৬-জুমাদাল উখরা: জুমুদ অর্থ জমে যাওয়া, আর উখরা অর্থ দ্বিতীয়, পুনরায় ও অনন্য।

আরবে যখন এই মাসের নাম রাখা হয়, তখন শীতের তীব্রতা আরেকবার বেড়ে যেত। এমনকি পানিও জমে যেত। তাই এর নাম 'জুমাদাল উখরা' রাখা হয়েছে।

৭-রজব :রজব শব্দটি রজিব থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো সম্মান করা। আরববাসী যেহেতু এ মাসকে সম্মান করত এবং 'আল্লাহর মাস' বলত, তাই এ মাসের নাম রজব বা সম্মানিত মাস রাখা হয়।

৮-শা'বান :শাবান 'শাব' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো বের হওয়া, প্রকাশ হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া। যেহেতু এ মাসে বিপুল কল্যাণ প্রকাশিত হয়, মানুষের রিজিক বণ্টিত হয় এবং তাকদিরের ফয়সালা নির্ধারিত হয়, তাই এ মাসের নাম শা'বান রাখা হয়েছে।

৯-রমাদ্বান :রামাদ্বান শব্দের মূল অর্থ জ্বালানো পোড়ানো। যেহেতু এই মাসে মুমিনের গুনাহ জ্বালিয়ে -পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়, তাই এ মাসের নাম রামাদ্বান রাখা হয়েছে।

১০-শাওয়াল :শাওয়াল শব্দটি 'শাওল' মূল ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ বাইরে গমন করা। এখানে আরববাসী নিজ ঘরবাড়ি ত্যাগ করে ভ্রমণে যেত। তাই 'শাওয়াল' নামে এর নামকরণ করা হয়।

১১-জুলকদ্বাহ/জিলকদ: 'জুল/জিল' অর্থ ওয়ালা আর 'কাদাহ' অর্থ বসা, যেহেতু এ মাস সম্মানিত মাসের একটি। আরবরা এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকত। এ জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে 'জুলকদ্বাহ'।

১২-জুলহিজ্জাহ: হজ্বের মাস হিসেবে এ মাসকে জুলহিজ্জাহ বলা হয়।[303]

---

303 তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৪৬-১৪৭, কাশফুস সুতুর আন আসামিল আইয়ামি ওয়াশ শুহুর: পৃ. ৩, https://ahlehaqmedia.com/7158/।

মুহাররাম মাস

হিজরী সনের প্রথম মাস মুহররাম। মুহাররাম শব্দের অর্থ হলো হারাম, নিষিদ্ধ ও পবিত্র।

আরবরা এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম মনে করত। এজন্য এ মাসকে হারাম মাস বলা হয়। এবং এ মাসের গুরুত্ব ও মহত্ত্বের কারণে এ মাসকে মুহাররম (সম্মানিত মাস) বলা হয়।

মুহাররাম মাসসহ আরো তিনটি মাস গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন মাস। এ মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ করেন:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি।

এর মধ্যে বিশেষ রূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম, অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।[304]

[304] সূরা ত্বাওবা: আয়াত ৩৬।

হাদীস শরীফে এসেছে, আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন হতে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যূল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব-ই-মুযারা, যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত।[305]

চারটি মাসকে সম্মানিত বা হারাম মাস বলার কারণঃ

১- এ মাসে কারো সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া নিষেধ।

২- এ মাসটি অত্যান্ত বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ। যে মাসে ইবাদত করলে প্রত্যাশার চেয়ে বেশিই সওয়াব পাওয়া যায়। অবশ্যই প্রথম হুকুমটি রহিত হয়ে গেলেও দ্বিতীয় হুকুমটি আজও বহাল রয়েছে।

মুহাররাম মাসের মর্যাদা ও ফযীলত:

১- ইসলামিক ক্যালেন্ডারের সূচনা এমাসের মাধ্যমেই হয়েছে।

২- ইসলাম পূর্বধর্ম জাহেলী যূগে এ মাসকে অনেক সম্মানের নজরে দেখা হতো।মক্কাবাসীরা এই মাসের মাধ্যমে নতুন বছর গণনা শুরু করতেন। হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফতকালে যখন ইসলামিক ইতিহাসের বিষয়/মাসআলা সামনে আসে, তখন সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতে মুহাররম মাসকে ইসলামিক বৎসরের প্রথম মাস নির্ধারণ করা হয়।

৩- এই মাসকে হাদীসে আল্লাহর মাস বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

---

305 বুখারী, হা. ৩১৯৭, মুসলিম, হা. ১৬৭৯, কুতুবুত তিস'আহ এফস।

আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রমাযানের রোজার পর সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহ্র মাস মুহাররমের রোজা এবং ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে রাতের নামায।[306]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়:
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযান মাসের রোযার পরে আল্লাহ্ তা'আলার মাস মুহার্‌রামের রোযাই সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ।[307]

পাশাপাশি বর্ণনায় পাওয়া যায়:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা আশুরার দিনে রোজা রাখ। তবে এক্ষেত্রে ইহুদিদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বন করত: তোমরা আশুরার পূর্বে অথবা পরে একদিনসহ রোজা রাখবে।[308]

৪- ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. লিখেন, যারা এ মাসে ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে ইবাদত করার তাওফিক পাবে, এবং যে এ মাসে গুনাহ বর্জন করার চেষ্টা করবে, সে অন্য মাসে গুনাহ বর্জন করার তাওফিক পাবে। এজন্য এ মাসে ইবাদত বাড়িয়ে দেওয়া এবং গুনাহ বর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।[309]

---

[306] মুসলিম, হা. ২৬৪৫।

[307] মুসলিম, হা. ১১৬৩, তিরমিজি, হা. ৪৭০, আবু দাউদ, হা. ২৪২৯, ইবনু মাজাহ, হা. ১৭৪২।

[308] মুসনাদে আহমাদ হা. ২১৫৪।

এই মাস বিষয়ে প্রচলিত জাল ফযীলত

এ মাসের দশে মুহাররম বিষয়ে সমাজে অনেক কথা প্রচলিত,
যা বিভিন্ন চটি বই, জুম'আর বয়ানে/ বিভিন্ন বক্তা, ওয়াজদের মুখে শুনা যায়।

যেমন-

- ১- আল্লাহ তা'আলা আশুরার দিনে আসমান, আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন।
- ২- হযরত আদম আ. এর সৃষ্টি ও তাঁর তাওবাহ কবুল করা হয়।
- ৩- হযরত ঈসা আ. এর জন্ম ও তিনাকে আসমানে উঠানো হয়।
- ৪- হযরত ইব্রাহিম আ. এর জন্ম এবং তিনাকে আগুন থেকে নাজাত দান করেন।
- ৫- হযরত নূহ আ. এর মুক্তিলাভ ও তার নৌকা জুদি পাহাড়ে আটকা পড়া।
- ৬- হযরত মূসা আ. এর জন্ম ও তাঁর ওপর তাওরাত নাযিল হয়, এবং বনী ইস্রাঈলের লোহিত সাগর
- পারাপারের মাধ্যমে মুক্তিলাভ ও ফেরআউনকে ডুবিয়ে মারা হয়।
- ৭- হযরত ইসমাইল আ. এর দুম্বা জবাইয়ের মাধ্যমে মুক্তি লাভ।
- ৮- হযরত ইউসূফ আ. জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।
- ৯- হযরত ইয়াকুব আ. চোখের জ্যোতি ফিরে পান।
- ১০- হযরত আইয়ুব আ. অসুস্থতা দূর করে শেফা লাভ করেন।
- ১১- ইউনুস আ. মাছের পেট থেকে মুক্তি পান এবং তাঁর ক্বাওমের তাওবাহ কবুল হয়।

---

[309] আহকামুল কোরআন: ৩/১১২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, সুরা তাওবাহ: ৩৬ নং আয়াত দ্র:।

- ১২- হযরত ইউনুস আ. এর কাওমের তাওবাহ কবুল হয়।
- ১৩-এইদিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম হওয়া ও আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনের পিছনের
- সকল গুনাহ মাফ করে দেয়ার ঘোষণা দেন।
- ১৪- হযরত ইদ্রিস আ. কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়।
- ১৫- হযরত দাউদ আ. কে ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়।
- ১৬- যে এই দিনে রোজা রাখবে, তার চল্লিশ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।
- ১৭- যে এই দিনে রোজা রাখবে তাঁর আমলনামায় ২বছর ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।
- ১৮- যে এই দিনে রোজা রাখবে তাঁর আমলনামায় ফেরেশতাদের ১০ বছর ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।
- ১৯- যে এই দিনে রোজা রাখবে, তাঁর আমলনামায় ১হাজার হাজী ও ওমরাকারীর সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।
- ২০- যে এই দিনে রোজা রাখবে, তাঁর আমলনামায় ১হাজার শহীদের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।
- ২১- যে এই দিনে রোজা রাখবে, তাঁর আমলনামায় সপ্তম আসমানের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।
- ২২- যে ব্যক্তি এই দিনে কোন রোজাদার কে ইফতার করালো সে জন্য সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদিকে ইফতার করালো।
- ২৩- যে এই দিনে কোন ব্যক্তিকে পেট ভরে খাওয়ালো সে উম্মতে মুহাম্মাদির সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে খাওয়ালো।

ইমাম বায়হাকী রহ. উল্লেখিত বিশাল বর্ণনাটি (যা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত) সম্পর্কে ফাযায়েলুল আওকাতে বলেন, এই সনদটি ত্রুটিযুক্ত, অগ্রহণযোগ্য।[310]

আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী রহ. উপরের বর্ণনা আলোচনা করার পর ইমাম বায়হাকী রহ. এর মত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অনেকে বলে এদিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই।[311]

উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে শুধুমাত্র একটি বর্ণনা সহীহ সনদে পাওয়া যায়। যথা হযরত মূসা (আ.) ও তার ক্বাওম অভিশপ্ত ফেরআউন থেকে মুক্তি পান।[312]

এছাড়া জয়ীফ সনদে আরো চারটি বিষয় পাওয়া যায়। যথা আদম আ. এর তাওবাহ কবুল হওয়া, নূহ আ. এর নৌকা জুদি পাহাড়ের সাথে আটকে পড়া[313], হযরত ঈসা আ. এর জন্ম লাভ[314], ফেরআউনের জাদুকরের তাওবাহ কবুল হওয়া। এছাড়া বাকি সকল বর্ণনা মনগড়া ও ভিত্তিহীন।

---

[310] ফাযায়েলুল আওকাত: (ইমাম বায়হাকী রহ.) পৃ.১২০ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

[311] আল আসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাউজুআ: পৃ.৯৫ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, মা ছাবাহা বিসসুন্নাহ ফী আয়্যামিস সানাহ: ২৫৩-২৫৭ পৃ., আল মউজুআত: (ইবনুল জাওজী রহ.) ২/১৯৯, আল ফাওয়াইদুল মাজমুআহ: (শাওকানী রহ.) পৃ.৯৬।

[312] বুখারী, হা. ৩৩৯৭, ৩৯৪৩, মুসলীম, হা. ২৫৪৬,২৫৪৮।

[313] মুসনাদে আহমাদ, ১৪/৩৩৫, তাফসীরে তাবারী: ১৫/৩৩৬।

[314] লাতায়েফুল মা'আরেফ: (ইবনে রজব হাম্বলী রহ.) পৃ. ১৩৯, দারু ইবনু খুযাইমা, আল আসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাউজুআ: পৃ.৯৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, মুসতাদরাকে হাকেম: ২/৬৩৮।

(আরো কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যে, আশুরার দিন সুরমা লাগানো, খেজাব লাগানো ও গোসল করা ইত্যাদি এধরনের কিছু বর্ণনা জয়ীফ যা জাল পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত)।[315]

করণীয় আমল

এ মাসের করণীয় আমল কুরআন সুন্নাহে তালাশ করলে আমরা কয়েকটি আমলের কথা স্পষ্টভাবে পাই:

- ❖কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তাওবাহ করা।
- ❖আশুরার আগে বা পরে মিলিয়ে দুটি রোজা রাখা।
- ❖আশুরার দিন জরুরী মনে না করে , সাধ্যমতে ভালো খাবারের আয়োজন করা।

১. বেশি বেশি তাওবা করা:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَىُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَهُ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ

عَنْ هَذَا إِلاَّ رَجُلاً سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَاعِدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ "

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, রামাযান মাসের পর কোন মাসের রোযা রাখতে আপনি আমাকে আদেশ করেন? তিনি তাকে বললেন, এই বিষয়ে আমি কাউকে রাসূলুল্লাহ সা্ঃ - এর নিকট প্রশ্ন করতে শুনিনি। তবে হ্যাঁ এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সা্ঃ -

[315] আল আসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাউজুআ: পৃ.৯৭-১০২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, আল লা-আলিল মাসনুআহ ফিল আহাদীসিল মাউজুআহ: (ইমাম সুয়তী রহ.) ২/২৬২।

এর নিকটে বসা ছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! রামাযান মাসের পর আর কোন মাসের রোযা পালনে আপনি আমাকে আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেনঃ রামাযান মাসের পর তুমি যদি আরো রোযা রাখতে ইচ্ছুক হও, তবে মুহাররামের রোযা রাখ। যেহেতু এটা আল্লাহ তা'আলার মাস। এই মাসে এমন একটি দিবস আছে যেদিন আল্লাহ তা'আলা এক গোত্রের তাওবা ক্কবুল করেছিলেন এবং তিনি আরোও অনেক গোত্রের তাওবাও এই দিনে কবুল করবেন।[316]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী তাঁর কিতাবে নকল করেন, হাদীসের এই অংশ " وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ "দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আশুরার দিন মানুষকে একনিষ্ঠ তাওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের তাওবাহ কবুল হওয়ার প্রতি আশান্বিত করা। যেহেতু এই দিনে আল্লাহ তা'আলা অন্য জাতিকে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[317]

হাদীসে কোন ক্বাওমের তাওবাহ কবুল হওয়ার দ্বারা কেউ উদ্দেশ্য নিয়েছেন ইউনুস আ. এর ক্বাওমের তাওবাহ কবুল হওয়ার কথা[318]। আর কেউ ফেরাউনের জাদুকরদের তাওবাহ কবুল হওয়ার কথা বলেন।[319]

২.রোজা রাখা:

মুহাররাম মাসের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিনকে আশুরার দিন বলা হয়। তথা মুহাররাম মাসের দশ তারিখের দিন। ইসলাম ধর্মে এই দিনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

---

316 তিরমিজি, হা. ৭৪১।

317 লাতায়েফুল মা'আরেফ: পৃ. ১৪০,(ইবনে রজব হাম্বলী) দারু ইবনু খুযাইমাহ।

318 আত্তানওয়ীর শরহুল জামেউস সগীর: (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল) ৪/২৪৬।

319 তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/২৮৯।

আশুরার তাৎপর্য :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা্ঃ মাদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ ‘আশুরার দিনে রোজা পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে রোজা পালন কর কেন?) তারা বলল, এটি অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা’আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে মুক্তি দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা (আ.) রোজা পালন করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে রোজা পালন করেন এবং রোজা পালনের নির্দেশ দেন।[320]

অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়:

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ...আর ‘আশুরার রোজা সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারাহ্‌ হয়ে যাবে।[321]

৩- সাধ্যানুপাতে ভালো খাবারের আয়োজন করাঃ

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, এই দিনে পরিবার পরিজনের সাথে সাধ্যানুপাতে ভাল খাবারের আয়োজন করতে পারবে। কিন্তু লক্ষ্য

---

[320] বুখারী, হা. ২০০৪/১৮৯৩।

[321] মুসলিম, হা. ২৬৩৬।

রাখতে হবে, যেন উক্ত কাজকে সাওয়াবের কাজ ও জরুরী না মনে করা হয়। বরং আল্লাহর কাছে সারা বছরের উত্তম রিজিকের আশা-আকাঙ্খার প্রতীকী পদ্ধতি হিসেবে নেকফালি মনে করবে।[322]

কেউ কেউ এ সম্পর্কিত হাদীসকে ভিত্তিহীন বলে, তা ঠিক নয়। এমন হাদীস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَنَتَهُ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিন তার পরিবারের উপর সচ্ছলতা দেখাবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য উক্ত বছরকে সচ্ছল করে দিবেন।[323]

স্মরণ রাখা উচিত যে, এ প্রসঙ্গে পাঁচজন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবের (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবু সাঈদ খুদরী (রা.), আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু সনদে, এবং ওমর (রা.) থেকে মউকুফ সনদে, এবং একজন তাবেয়ী থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। যা ইমাম বায়হাকী রহ. শুআবুল ঈমানে, ইবনে আবদুল বার রহ. আল আযকারে, ইমাম আবু যুরআ আত্ত্বাওসিআতু আলাল ই'য়ালে উল্লেখ করেন।

ইমাম বায়হাকী রহ. উক্ত হাদীসের একাধিক সনদ উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেনঃ

هَذِهِ الْأَسَانِيدُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَهِيَ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً،

---

322 ফাতাওয়ান নাওয়াজেল: ১/৫০৫, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/৩৯৫, ১/৫১৩।

323 মু'জাম ইবনুল আরাবী, হা. ২২৫, আলমুজামুল আওসাত, হা. ৯৩০২, আলমু'জামুল কাবীর, হা. -১০০০৭, শুয়াবুল ঈমান, হা. ৩৫১৩, ৩৫১৫, ৩৫১৬।

এই সনদগুলো যদিও জঈফ। কিন্তু এসব যখন একটি অন্যটির সাথে মিলেছে তখন তা শক্তিশালী হয়ে গেছে (আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য)।[324]

তা ছাড়া আল্লামা আবুল ফজল ইরাকী, আল্লামা সাখাবী, আল্লামা সুয়ুতী, আল্লামা ইবনুল ইরাক কিনানী, আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, ইমাম আজলুনী, আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী রহ. প্রমূখ উক্ত হাদীসকে আমলের উপযোগী বলেছেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছাড়াও চারো ফুকাহাগণের একি বক্তব্য।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

পুরো বছর পরিবারের জন্য যে খরচ করা হয়, যদি নিয়ত ঠিক থাকে তাহলে এর মাধ্যমে সদকার সাওয়াব পাওয়া যায়:

عنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ،............ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন হে সা'দ ....তুমি একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুক্‌মাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে।[325]

বর্জনীয় আমল

নিঃসন্দেহে মুহাররম অনেক ফযীলতপূর্ণ মাস। তার মাঝে দশে মুহাররম আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ। এ মাসটি বা দিনটি ফযীলতপূর্ণ হওয়ার কারণ কুরআন সুন্নাহে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যা ইতোপূর্বে

---

[324] শুয়াবুল ঈমান, (লিলবায়হাকী) ৫/৩৩৩, হা. ৩৫১৫, আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব: ২/১১৬ (ইমাম মুনুযিরী রহ.) ।

[325] বুখারী, হা. ৬৩৭৩।

আলোচনা হয়েছে। এ দিনের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকেই মনগড়া, ভিত্তিহীন ও নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন কথা বলে থাকেন, এইদিনের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক খতীবকে অগ্রহণযোগ্য বানোয়াট বর্ণনা করতে শুনা যায়, যা ইসলাম সমর্থিত নয়। (এ প্রসঙ্গে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।)

অনেকে আবার এ মাসকে শোকের মাস বানিয়ে হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে বিভিন্নভাবে শোক পালন করে থাকে। যেমন: ১. তাযিয়া বানানো তথা নকল কবর বানিয়ে তাতে হুসাইন (রা.) শরীর মুবারক উপস্থিত থাকার বিশ্বাস করা। ২. মর্সিয়া বা শোকগাঁথা পাঠ করা। ৩. হায় হুসাইন, হায় আলী বলে বিলাপ/মাতম করা, বা ছুরি দিয়ে নিজ শরীরে আঘাত/ক্ষত করা। ৪. এই দিনে খিচুড়ি ইত্যাদি পাক করে বিলানো। ৫. শোক পালন ও বিশেষ কাপড় পরিধান করা। ৬. মিছিল, বা শোকর‍্যালি বের করা ইত্যাদি।

দশে মুহাররমকে মাতমের দিন বানানো এটি রাফেজীদের কাজ।[326]
ইতিহাস ও বিভিন্ন ফতোয়াগ্রন্থে এধরনের বক্তব্য উল্লেখ করার পর বলা হয়: এগুলো সবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত হোসাইন (রা.) ও আহলে বাইতের আদর্শের পরিপন্থী কাজ। এসকল কাজ ইসলাম বহির্ভুত, যা ইসলাম কখনই সমর্থন করে না। এসকল কাজের মূল হোতাই হলো শিয়ারা।[327]

হাদীসে আসছে:

---

[326] লাতায়িফুল মা'আরিফ: পৃ. ১৩৮, (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫হি.) দারু ইবনু খুযাইমা।

[327] আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ৮/৫৯৯-৬০০, ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া: ৩/২২৪, ফতোয়ায়ে রশিদিয়া: পৃ. ১৩৯, আফকে মাসায়েল: ৮৫-৮৬, কিফায়াতুল মুফতি: ১/২৩৫।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যারা শোকে গণ্ডে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[328]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, অনেকে দশে মুহাররম মানেই কারবালা মনে করেন, তাদের এমন ধারণা সঠিক নয়। কেননা কারবালার ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের ৫০ বছর পর ৬১হি. তে সংঘঠিত হয়। কারবালাকে কেন্দ্র করে উদ্ভট বিষয়গুলো চালু হয় হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের ৩শ বছর পর। এর আগে এর কোন অস্তিত্ব দুনিয়ায় ছিলো না। অথচ মুহাররম মাস ফযীলতপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি যেদিন থেকে আসমান যমিন সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই। আর দশে মুহাররম ফযীলতপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা আছে, হযরত মূসা আ. ও তার ক্বাওমকে ফেরআউনের হাত থেকে নাজাতের কারণে।

এছাড়াও শরীয়তে মুহাম্মদীতে কোন সময়, দিন, মাস বা বছর সম্মানিত হওয়ার বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। অন্যথায় তা পরিত্যাজ্য। যেমনটি পাওয়া যায় রমজান মাস , শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদির বিষয়ে।

---

[328] বুখারী, হা. ১২৯৪, মুসলিম, হা. ১৬৫।

মূলত ৩৫২ হিজরিতে মুইযুদদৌলা দাইলামী (একজন শিয়া) সর্বপ্রথম বাগদাদে হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে মাতমের হুকুম জারি করেন।[329] পরবর্তিতে তা ধাপে ধাপে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যায়।

অতএব, শাহাদাতে হুসাইন (রাঃ)কে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া এবং সব ধরনের জাহেলী রসম-রেওয়াজ থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।
মোটকথা, এ মাসের করণীয় বিষয়গুলো যথা, তওবা-ইস্তেগফার, নফল রোযা এবং অন্যান্য নেক আমল করা। সব ধরনের কুসংস্কার, গর্হিত রসম-রেওয়াজ থেকে বেঁচে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক চলাই একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন

একাধিক হাদীসের ভাষ্যমতে এই দিন পরিবারের উপর সাধ্যানুপাতে খরচ করা জায়েজ আছে। তাই বলে এদিন সম্মিলিতভাবে খিচুরী পাকানো, বিশাল খাবারের আয়োজন করে বিলানো, এসবই খারেজী ও শিয়াদের সাথে মিলে যায়। যা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য ও নাজায়েজ।[330]

সফর মাস

হিজরী সনের দ্বিতীয় মাস সফর। আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টির প্রতিটি দিন-রাত-মাস-বছরই ফযীলতপূর্ণ। তাই সফর মাসও এর বাইরে নয়। অত্যান্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, সমাজের এক ধরণের মানুষ এই মাসকে একটি দুঃখের মাস মনে করেন, যা শরিয়ত সমর্থিত নয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা। যার কারণে আমরা মুসলমানরা প্রতিটি পদক্ষেপ

[329] আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ১৫/২৬১।

[330] আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ৮/১৬২, ইবনে কাসীর: ৮/২২০।

ও কার্যাবলিতে বিজাতিদের সংস্কৃতি অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছি। এ মাসকে যারা অশুভ/দুঃখের মনে করেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য শিয়া সম্প্রদায়। যা তাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাঁটাঘাঁটি করলে বুঝতে পারবেন।

সর্বপ্রথম আমরা জানবো শিয়া কারা?

শিয়া বলা হয়, যারা বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ সা্ঃ এর মৃত্যুর পর আলী (রা.) ও তার বংশধরেরাই মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের একমাত্র দাবিদার। তারা হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) সম্পর্কে কু-রুচিপূর্ণ মন্তব্য করে, যা রাসূলের শানে গোস্তাখির নামান্তর।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আকিদা অনুযায়ী; শিয়ারা কাফের।

এ মাস সম্পর্কিত শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা সমূহ :

১লা সফর: ইমাম হুসাইন (রা.) এর কাটা মাথাকে শামে আনা হয়। আহলে বাইত (রা.) দেরকে বন্দি করে শামে আনা হয়। যায়দ বিন আলি বিন হুসাইন (রা.)কে শহিদ করা হয়। সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হয়।

২য় সফর: আহলে বাইত (রা.)দেরকে পাপিষ্ঠ ইয়াজিদের দরবারে উপস্থিত করা হয় এবং অন্য এক মতে যায়দ বিন আলি বিন হুসাইন (রা.)কে উক্ত দিনে ১২০ হিজরিতে বনী উমাইয়ার বিরোধিতা ও বিপ্লবী আন্দোলন করার কারণে তাকে ৪২ বছর বয়সে শহীদ করা হয়।

৩য় সফর: এক বর্ণনামতে ইমাম মোহাম্মাদ বাকের (রা.) সন ৫৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

৫ম সফর: সন ৬১ হিজরিতে হজরত রুকাইয়া (রা.) এর শাহাদত।

৭ম সফর: এক বর্ণনামতে সন ১২৮ হিজরিতে ইমাম মূসা কাযিম (রা.) মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত “আবওয়া” নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

৮ই সফর: সন ৩৫ হিজরি হজরত সালমান ফার্সি (রাঃ) এর ওফাত দিবস।

৯ম সফর: সন ৩৭ হিজরি সিফফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া রাঃ কর্তৃক হজরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) এর শাহাদত। সন ৩৮ হিজরিতে নাহরাওয়ানের যুদ্ধ শুরু হয়।

১২ সফর: হজরত মূসা (আ.) এর ভাই হজরত হারুন (আ.) এর ওফাত দিবস।

১৩ই সফর: সিফফিনের যুদ্ধে আমর বিন আস রাঃ বিচারক নির্ধারনের কৌশলের কারণে **খারেজি** ফেরকার সৃষ্টি হয়।

১৪ই সফর: আমর বিন আস রাঃ কর্তৃক মোহাম্মাদ বিন আবু বকরকে হত্যা করা হয়।

১৮ই সফর: সন ৩৭ হিজরি সিফফিনের যুদ্ধে ওয়াইস করনী রহ: কে শহীদ করা হয়।

২০শে সফর: ইমাম হুসাইন (রা.) এর চল্লিশা। উক্ত দিনে ইমাম হুসাইন (রা.) এর চল্লিশাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ যিয়ারত পাঠ করা হয়ে থাকে। যাকে যিয়ারতে আরবাইন বলা হয়। যিয়ারতটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

السَّلامُ عَلَى وَلِيِّ اللَّهِ وَ حَبِيبِهِ السَّلامُ عَلَى خَلِيلِ اللَّهِ وَ نَجِيبِهِ السَّلامُ عَلَى صَفِيِّ اللَّهِ وَ ابْنِ صَفِيِّهِ السَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ السَّلامُ عَلَى أَسِيرِ الْكُرُبَاتِ وَ قَتِيلِ الْعَبَرَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِيُّكَ وَ ابْنُ وَلِيِّكَ وَ صَفِيُّكَ وَ ابْنُ صَفِيِّكَ الْفَائِزُ بِكَرَامَتِكَ أَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ وَ اجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلادَةِ وَ جَعَلْتَهُ سَيِّدا مِنَ السَّادَةِ وَ قَائِدا مِنَ الْقَادَةِ وَ ذَائِدا مِنَ الذَّادَةِ وَ أَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلالَةِ وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا وَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَ شَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ وَ تَغَطْرَسَ وَ تَرَدَّى فِي هَوَاهُ وَ أَسْخَطَكَ وَ أَسْخَطَ نَبِيَّكَ وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ حَمَلَةَ الْأَوْزَارِ

الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارَ [لِلنَّارِ] فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ صَابِرا مُحْتَسِبا حَتَّى سُفِكَ فِي طَاعَتِكَ دَمُهُ وَ اسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ اللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْنا وَبِيلا وَ عَذِّبْهُمْ عَذَابا أَلِيما السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمِينُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمِينِهِ عِشْتَ سَعِيدا وَ مَضَيْتَ حَمِيدا وَ مُتَّ فَقِيدا مَظْلُوما شَهِيدا وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ وَ مُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي وَلِيٌّ لِمَنْ وَالاهُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُورا فِي الْأَصْلابِ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ [الطَّاهِرَةِ] لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ وَ أَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِيُّ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ أَعْلامُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ أَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وَ خَوَاتِيمِ عَمَلِي وَ قَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَ أَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ عَدُوِّكُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَجْسَادِكُمْ [أَجْسَامِكُمْ] وَ شَاهِدِكُمْ وَ غَائِبِكُمْ وَ ظَاهِرِكُمْ وَ بَاطِنِكُمْ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

২১শে সফর: সন ৪২০ হিজরিতে ইমাম মাহদি (আ.) শেইখ মুফিদ (রহ.) এর উদ্দেশ্যে (توقیع) বা স্বীকৃতিনামা প্রেরণ করবেন।

২৩শে সফর: হজরত সালেহ (আ.) এর মাদি উটের পা কেটে ফেলা হয়। হজরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে আটকে পড়েন।

২৪শে সফর: রাসূল (সা.) এর রোগ প্রবল হয়।

২৫শে সফর: রাসুল (সা.) তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে ওসিয়ত লিখার জন্য কাগজ ও কলম চান কিন্তু হজরত উমর তা দান করতে বাঁধা প্রদান করেন।

২৬ শে সফর: সন ১১ হিজরিতে রাসূল (সা.) রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উসামার নেতৃত্বে তাঁর সাহাবিদেরকে রওনা হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

২৮শে সফর: সন ১১ হিজরি রাসূল (সা.) এবং ২৮ হিজরিতে ইমাম হাসান (রা.) এর শাহাদত দিবস।

৩০শে সফর: সৈয়দ ইবনে তাউস থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ি ইমাম রেযা (রহ.) এর শাহাদত দিবস। ইমাম রেযা (রহ.)কে আব্বাসী খলিফা মামুন বিষ দান করে এবং উক্ত বিষের কারণে ইমাম রেযা (রহ.) শাহাদত বরণ করেন।

এ মাস কেন্দ্রিক শিয়াদের উদ্ভট আমল সমুহ:

যেহেতু এ মাসটিকে অমঙ্গল বলে মনে করা হয়, সেহেতু এ মাসে সাদকা প্রদান, আল্লাহর ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভ এবং দোয়া করার জন্য অনেক তাকিদ করা হয়েছে। যদি কেউ উক্ত মাসটিতে বিপদ বিহিন জিবন অতিবাহিত করতে চাই তাহলে সে যেন প্রত্যেক দিন নিম্নোক্ত দো'আটি ১০ বার পাঠ করে:

يا شَديدَ الْقُوى وَيا شَديدَ الْمِحالِ يا عَزيزُ يا عَزيزُ يا عَزيزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِكَ جَميعُ خَلْقِكَ فَاكْفِنى شَرَّ خَلْقِكَ يا مُحْسِنُ يا مُجْمِلُ يا مُنْعِمُ يا مُفْضِلُ يا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنينَ وَصَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ

সৈয়দ ইবনে তাউস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ৩ রা সফরে দুই রাকাত নামায পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে সুরা ফাতহ, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে সুরা ইখলাস। নামাজান্তে ১০০ বার দুরুদ শরিফ পাঠ করতে হবে, ১০০ বার বলতে হবে

اللهم العن آل ابی سفیان

এবং ১০০ বার আসতাগফার পাঠ করতে হবে।

উক্ত মাসে অন্যান্য আমল সমূহের মধ্যে উত্তম হচ্ছে দো'আ, কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ এবং রোজা রাখা। আল্লামা মাজলিসি বর্ণনা করছেন যে, প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখা হচ্ছে উত্তম।

- মাসের প্রথম বৃহঃস্পতিবার।
- মাসের শেষ বৃহঃস্পতিবার।
- মাসের প্রথম পক্ষের প্রথম বুধবার।

অনুরূপভাবে উক্ত মাসে প্রথম ভাগে দুই রাকাত নামায পড়ার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। নামাযটি পড়ার নিয়ম হচ্ছে প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে ৩০ বার সুরা ইখলাস, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে ৩০ বার সুরা ক্বদর এবং নামাজান্তে সাদকা প্রদানের জন্য তাকিদ করা হয়েছে।[331]

পর্যালোচনাঃ

কোরআন সুন্নাহে তালাশের পর উল্লেখিত কোন আমলের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, সুতরাং এগুলো ভিত্তিহীন আমল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[332]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, শিয়ারা এই মাসটিকে অশুভ মনে করে:

ইসলাম ধর্মে কোন বস্তুকে অশুভ বা অমঙ্গল মনে করা কতটুকু যৌক্তিক? এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীস কি বলে?

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে এরশাদ করেন:

---

[331] সূত্র শিয়াদের অনলাইন পেইজ লিংক
http://www.tvshia.com/bn/content/16299

[332] 'আল আসারুল মারফূআহ ফিল আখবারিল মাওযূআহ:' (আবদুল হাই লখনবী রহ.) পৃ. ১১১, ভিত্তিহীন নামায ও দুআর শিরোনামে তা উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে সূরা ইখলাসের পরিবর্তে অন্য আয়াতের উল্লেখ এসেছে।

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অত:পর যখন তাদের কাছে কোন কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, এটা আমাদের পাওনা।' আর যখন কোন অকল্যাণ পৌছঁত, তখন তারা মূসা ও তার সাথীদেরকে অলক্ষুনে (১) গণ্য করত। সাবধান! তাদের অকল্যাণ তো কেবল আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে; কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।[333]

(১) কুলক্ষণ নেয়া কাফের মুশরিকদেরই কাজ। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ কুলক্ষণ নেয়া শির্ক।[334] যুগে যুগে মুশরিকরা ঈমানদারদেরকে কুলক্ষণে, অপয়া ইত্যাদি বলে অভিহিত করত।

এ বিষয়ে রাসূলে আকরাম সা্ঃ এরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ.

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেছেনঃ রোগে সংক্রমণ নেই; শুভ-অশুভ আলামত বলে কিছু নেই। পেঁচায় অশুভ আলামত নেই এবং সফর মাসে অকল্যাণ নেই।[335]

অন্য একটি বর্ণনায় আসছে:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ বলেছেনঃ রোগের সংক্রমণ ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। শুভ আলামতই আমার নিকট পছন্দনীয়, আর তা হল উত্তম বাক্য।[336]

---

333 সুরা আরাফ: আয়াত ১৩১।

334 মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৮৯।

335 বুখারী, হা. ৫৭৫৭, ই.ফা. হা. ৫২৩৩।

336 বুখারী, হা. ৫৭৫৬, ই. ফা. হা. ৫২৩২।

আখেরী চাহার শোম্বা

বহু মানুষ সফর মাসের শেষ বুধবারকে একটি বিশেষ দিবস হিসেবে গণ্য করে এবং এতে বিশেষ আমল আছে বলে মনে করে। তথা আখেরী চাহার শোম্বার নামায। জাওয়াহিরুল কুন্জ, তাযকিরাতুল আওরাদ, বাহাতুল কুলুব, জাওয়াহিরে গায়বী, মোকছুদুল মোমেনিন ও বার চান্দের ফযীলত বিষয়ক যেসব অনির্ভরযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকা এক শ্রেণির মানুষের মাঝে প্রচলিত, এর কোনো কোনোটাতে সফর মাসের শেষ বুধবার কেন্দ্রিক বিশেষ ধরনের নামাযের কথা রয়েছে। সেখানে আছে-

সফর মাসের শেষ বুধবার প্রভাতে সূর্য উদয়ের পূর্বে গোসল করে, সূর্য উঠার পর দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করা ভালো।

নামাযের নিয়ম: দুই রাকআতের নিয়ত করে এ নামায আদায় করতে হয়। উভয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করতে হয়। নামায শেষে সত্তর বার নিম্নের দরূদ শরীফ ও দু'আটি পাঠ করে মুনাজাত করতে হয়......।[337]

পর্যালোচনা

সফর মাসের শেষ বুধবারকে কতক লোক আখেরী চাহার শোম্বাহ নাম দিয়েছে। এই নামকরণ এবং যার ভিত্তিতে এ দিবস ও এর বিশেষ আমল আবিষ্কার করা হয়েছে সবই অমূলক। কারণ এর কোন ভিত্তি কোরআন সুন্নাহের কোথাও পাওয়া যায় না। বরং তারা যা উল্লেখ করে তা নিতান্তই

---

[337] মাসিক তরজুমানে এ' আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত: পৃ.১০, সেপ্টেমবর-অক্টোবর'২১,তাযকিরাতুল আওরাদ, বাহাতুল কুলুব, জাওয়াহিরে গায়বী, মোকছুদুল মোমেনিন, জাওয়াহিরুল কুনজ ৫/৫১৬।

তাদের মনগড়া।[338] এবং সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হলো, তারা এ নামাযের জন্য আব্দুল হাই লখনভী রহ. এর মাজমু'আয়ে ফতোয়ার দলীল দিয়ে তা প্রমাণ করতে চায়। অথচ তিনি তার কিতাব 'আল আসারুল মারফূআহ ফিল আখবারিল মাওযূআহ' নামক কিতাবে[339] এই আমলটিকে "ভিত্তিহীন নামায ও দু'আর" শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

শিয়াদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাঃ

"ইসনা আশারিয়া শিয়া সম্প্রদায়" আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মতিক্রম ফতোয়ায় নিঃসন্দেহে এরা ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে। এরা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করলেও তাদের অনেক কাজ মুসলমানদের আকীদার খেলাফ। যেমন:

১- শিয়া কালিমা ও মুসলমানদের কালিমা ভিন্নঃ

তাদের কালিমাঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদু রাসূল্লাহ, আলিয়্যুন ওয়ালীউল্লাহ ওয়াসিয়্যু রাসূলিল্লাহ, খলীফাতুহু বিলাফসল। অথচ মুসলমানদের কালিমাঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।[340]

---

[338] বিস্তারিত জানার জন্য দেখতে পারেন মারকাযুদ দাওয়াহ কর্তৃক পরিচালিত ওয়েব সাইট মাসিক আল কাউসার: রবিউল আউয়াল ১৪২৯=মার্চ ২০০৮। অথবা প্রচলিত ভুল' বই (মুফতী আব্দুল মালেক)-এর ১১৮-১২২ পৃ.।

[339] 'আল আসারুল মারফূআহ ফিল আখবারিল মাওযূআহ': পৃ. ১১১।

[340] {আকায়েদ দ্বীনিয়াত, বুক নং-১, ঈমামিয়া দ্বীনিয়াত, বাচ্চু কি দ্বীনী আওর আখলাকী কিতাব, পহলী কিতাব, প্রকাশক- ইমামিয়া এডুকেশন এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, নম্বর-৬৮, শিবাজী রোড,শিবাজী নগর ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০৫১, সংকলক, [কথিত] হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়দ আসকারী রেজবী, ইমামে জুমআ করীমপুর, চতুর্থ প্রকাশ-মার্চ ২০০৩ ইং}

২- আহলে বাইতের নামে কুরআন অস্বীকারকারী।(বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: আহলে হক মিডিয়া)[341]

৩- তাদের দাবি বর্তমানে আমাদের কাছে যে কোরআন আছে, তা বিকৃত কোরআন। হুবহু আসমান হতে নাযিলকৃত কোরআন নয়।

৪- আম্মাজান আয়েশা রাঃ এর ব্যাপারে যেনার অপবাদ দেয় (নাউজুবিল্লাহ)।

৫- সাহাবায়ে কেরামের কয়েকজন ব্যতিত সকল সাহাবাকে কাফের মনে করে।

৬- আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) কে কাফের বলে থাকে।

৬- জিবরাঈল ওহী পৌঁছাতে ভুল করেছেন, তথা হযরত আলী (রা.) এর ওহী মুহাম্মাদ সা্ঃ এর কাছে নিয়ে গেছেন। এধরণের আকিদা পোষনের কারণে তারা মুরতাদ ও কাফের।[342]।[343]

সুতরাং তাদের মনগড়া আমল কোন মুসলমান পালন করে জান্নাতের আশা করা নিছক বোকামি বৈ কিছুই নয়।

---

[341] https://ahlehaqmedia.com/5422-2/

[342] দারুল উলুম দেওবন্দ ওয়েবসাইট: সূত্র https://darulifta-deoband.com/home/ur/false/sects/46832

[343] দারুল উলুম দেওবন্দ ওয়েবসাইট: সূত্র https://darulifta-deoband.com/home/ur/false-sects/165462

রবিউল আউওয়াল মাস

রবিউল আউয়াল হিজরী সনের তৃতীয় মাস। রবিউল আউয়াল অর্থ: শুরু মাস, বসন্তের প্রারম্ভ।
এই মাসের নামকরণকালে বসন্তকাল ছিলো, রবিউল আউয়াল অর্থও বসন্তকাল। তাই এমাসের নাম রবিউল আউয়াল রাখা হয়।

রবিউল আউওয়াল মাসের ফযীলত

নিঃসন্দেহে এইমাস বরকতপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ। এই মাসেই হুজুরে আকরাম সা്ঃ এ ধরার বুকে শুভাগমণ করেন। যে সৌভাগ্য অন্য কোন মাসের হয়নি। তাই এ মাসটি অত্যান্ত বরকতপূর্ণ। এই মাসেই তিনি রফীকে ‘আ’লার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে চির এতিম বানিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ সা്ঃ কে প্রেরণের কারণ এবং সে সময় দুনিয়ার অবস্থা ও প্রেক্ষাপট

প্রতিটি উম্মতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের স্বগোত্রীয় নবী প্রেরণ করেছেন। যাতে করে তারা তাদের রবের হুকুম আহকাম মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর দীর্ঘ ৫৭০ ঈসাব্দ পর্যন্ত, আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ায় কোন নবী রাসূল প্রেরণ করেন নি। ৫৭১ ঈসাব্দে, রবিউল আউয়াল মাসের সোমবারে, সুবহে সাদিকের সময় মা আমিনার ঘরে বিশ্ব নবী সা്ঃ এর শুভাগমন ঘটে।

রাসূলুল্লাহ সা্ঃ যখন রবিউল আউয়াল মাসে দুনিয়াতে আসলেন, সে সময় রাসূলের আগমনের স্থান, দেশ ও সমাজের মানুষগুলো কেমন ছিল? এটা আমাদের প্রথমে জানা দরকার। কেমন প্রেক্ষাপটে রাসূল সা্ঃ এর আগমন?

তখন ছিল বর্বরতার যুগ, আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ। যে যুগে/সমাজে ঝগড়া-বিবাদ মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। লজ্জাহীনতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতায় সমাজ ভেসে গিয়েছিল। মাদকাসক্তি ও ব্যভিচারে সমাজ কলুষিত হয়ে পড়েছিল। নারীদের কোন অধিকার ছিলো না। নারীদের উপর নানা অত্যাচার ও নির্যাতন চলত। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিয়ে দিত। এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে বিভিন্নভাবে দেব-দেবীর পূজায় নিমজ্জিত ছিল। নীতি-নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ছিল। নানা কুসংস্কারে ডুবন্ত ছিল। এক কথায় যে সমাজে কোনো অপরাধ বাদ যেত না। মানুষগুলো মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বে পরিণত হয়েছিল। অমানুষ গুলোকে মানুষ বানাতে, অন্যায় অবিচার জুলুম, অন্ধকার থেকে তাদেরকে বাঁচাতে, ও হিদায়াতের পথে রাহবারি করতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী সা্ঃ কে হেদায়াতের/ নূরের মশাল দিয়ে এই ধরার বুকে প্রেরণ করেন। যেমনটি কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা’আলা বলেন, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি (বিশ্বনবী সা.) এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ।[344]

অন্যত্র আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।[345]

---

[344] আল মায়িদাহ ৫: ১৫।

[345] আত তাওবাহ্ ৯: ৩৩।

রবিউল আউয়াল মাসের শিক্ষা

রবিউল আউয়ালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের হিকমাত ছিল, প্রথম বসন্তে যেমন নষ্ট পাতা ঝরে যায়, নতুন ফুল ফুটে। নতুন পাতা গজায়। ফুলে ফলে দুনিয়া সুশোভিত হয়ে উঠে। স্নিগ্ধ বাতাসে পৃথিবী নতুন সাজে সজ্জিত হয়। তেমনি বর্বর জাহেলিয়্যাতের সমাজ, অপরাধী সমাজ, দেশ ও জাতিকে, সকলকে অপরাধমুক্ত করা এবং জুলুম-অত্যাচার, ব্যভিচারের অন্ধকার, শিরক ও কুফরের জুলমত থেকে মুক্ত করে হক ও হক্কানিয়্যাত, সত্য, সঠিক, ইনসাফ ও মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ও একত্ববাদের দীক্ষায় পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করতে এক নতুন বসন্তের সূচনা হয় নবীজীর জন্মের মাধ্যমে।

রাসূল সাঃ এর জন্মের সময়কার আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী ও তার শিক্ষা

রাসূল সাঃ এর জন্মের পূর্বে প্রকাশিত হওয়া বারাকাত সমূহ:
সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বক্ষণে সুবহে সাদিকের দুনিয়া জোড়া আলো ও রক্তিম পূর্ব দিগন্ত যেমন পৃথিবীকে সূর্যোদয়ের সুসংবাদ দান করে, তেমনিভাবে নবুয়্যাতের সূর্য উদয়ের (তথা বিশ্ব নবী সাঃ এর জন্ম) যখন ঘনিয়ে এল, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন বহু ঘটনা ঘটতে লাগল, যা সুস্পষ্টভাবে নবীজীর শুভাগমনের সংবাদ বহন করছিল। হাদীস বিশারদ ও ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় এগুলোকে “ইরহাসাত” বলে।

যেমনঃ রাসূল সাঃ এর মাতা আমেনা বলেন যে, আমি স্বপ্নে সুসংবাদ প্রাপ্তা হই, এই শিশু যে তোমার গর্ভে রয়েছে, সে এই উম্মতের নেতা। জন্মের পর তার জন্য এই দো‘আ করবে যে, আমি একে এক আল্লাহর সোপর্দ করছি। আর তার নাম রাখবে মোহাম্মাদ। এবং তিনি আরো বলেন, সে আমার গর্ভে থাকা অবস্থায় আমি একটি নূর দেখতে পেলাম। যার আলোতে

সিরিয়ার বুসরা নগরীর বড় বড় প্রাসাদসমূহ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

এবং সে আমার গর্ভে থাকাকালে আমার যতটুকু হাল্কা ও সহজ বোধ হয়েছে, অন্য কোন মহিলাকে আমি এমন হাল্কা ও সহজ অবস্থায় দেখিনি।[346]

রাসূল সা্ঃ **এর জন্মের পর প্রকাশিত হওয়া বারাকাত সমূহঃ**

১-: রাসূল সা্ঃ ৯ রবিউল আউয়াল, হিজরীপূর্ব ৫৩ সনে; ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার, আনুমানিক ভোর ৪টা ৪০ মিনিটে এ ধরাতে তাশরীফ এনেছেন। যে বৎসর আব্রাহা কর্তৃক বাইতুল্লাহর উপর হস্তি বাহিনীর হামলার ঘটনা ঘটে। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী এ ঘটনার ৫০ দিন পর রাসূলের আগমন ঘটে।

২-: রাসূল সা্ঃ এর মাতা আমেনা তাঁর জন্মের সময় একটি আলো দেখতে পান। যে আলোর দ্বারা পূর্ব এবং পশ্চিম এর গোটা অঞ্চল আলোকিত হয়ে যায়। এবং আকাশের সকল তারকা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তিনি বলেন, আমার মনে হতে লাগলো যে, তারকা সমূহ আমার উপর এসে পড়বে।[347]

৩-: পারস্যের আগুন নিভে গিয়েছিল, যা এক হাজার বছর ধরে একটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ক্রমাগত প্রজ্বলিত ছিল। যে আগুনের তারা পূজা করত।

৪-: পারস্যের বাদশা কিসরার রাজপ্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা ১৪ টি গম্বুজ ধ্বসে পড়ে।[348]

---

[346] সীরাতে খাতামুল আম্বীয়া: পৃ. ১৭।

[347] ফাতহুল বারী: ৬/৪২৬, সীরাতে মোস্তফা: ১/৬৫।

[348] তারীখুল ইসলাম: (উর্দূ) পৃ. ১২।

৫-: সাওয়াহ নামক এক নদীতে যথারীতি পানি প্রবাহিত হচ্ছিল, নবীজীর আগমনে হঠাৎ তা একেবারে শুকিয়ে যায়।[349]

এসকল আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল অগ্নিপূজা, মূর্তিপূজা ও অন্যসব গোমরাহির পরিসমাপ্তির ঘোষণা এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রতি সু-স্পষ্ট ইঙ্গিত।[350]

রাসূলুল্লাহ সা্ঃ **এর আগমনকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কোন দিবসে খুশি উদযাপন করা যাবে কি?**

এটি বুঝার জন্য কয়েকটি বিষয় বুঝতে হবে।

১- রাসূল সা্ঃ এর আগমনের নির্দিষ্ট কোন তারিখ কারো জানা আছে কি না? থাকলে কোনদিন?

২- রাসূল সা্ঃ তাঁর শুভাগমনকে কেন্দ্র করে তিনি কিভাবে তা পালন করেছেন? অথবা তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম তারা কিভাবে তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে খুশি-উদযাপন করছেন?

৩- বর্তমান প্রচলিত সিস্টেমে রাসূল সা্ঃ এর আগমনকে উদ্দেশ্য করে খুশি-উদযাপন করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

রাসূল সা্ঃ এর আগমনের নির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাসূল সা্ঃ এর জন্ম হয়েছিল উক্ত বছরের রবিউল আওয়াল মাসের সোমবারে। যে বৎসর বাদশাহ আব্রাহা কর্তৃক বাইতুল্লাহ শরীফের উপর আক্রমণ হয়।[351] তথা, যে বৎসর আব্রাহা কর্তৃক বাইতুল্লাহর উপর

---

[349] তারিখুল ইসলাম: পৃ. ৬২।

[350] সীরাতে খাতামুল আম্বীয়া: ২৯-৩৯। বিস্তারিত সীরাতে মুস্তফা: সা্ঃ ইদরীস কান্ধলভী রহ.। ১নং খন্ড দ্র:ব:।

[351] আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ২/২৬ দারুল ফিকির বৈরুত।

হস্তি বাহিনীর হামলার ঘটনা ঘটে। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী এ ঘটনার ৫০ দিন পর রাসূলের আগমন ঘটে।

হাদীসে আসছে,

عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الأثنين وأنزل عليه يوم الأثنين ومات يوم الأثنين

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সোমবারে তাঁর উপর অহি নাযিল আরম্ভ হয় এবং সোমবারে তিনি ইন্তেকাল করেন।[352]

নির্দিষ্ট তারিখ কোনটি? এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখের বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এবিষয়ে চমৎকার একটি প্রবন্ধ রয়েছে, পাঠকদের উপকারার্থে তা উল্লেখ করা হলো, **রাসূল করীম (সা.)-এর জন্মতারিখঃ বিচার-বিশ্লেষণ-সংশয়-সন্দেহের অপনোদন**[353]

কোন মাসে জন্ম লাভ করেন? এ বিষয়ে বহু মতপার্থক্য রয়েছে।

আল্লামা কাসতাল্লানী (রহ.) (মৃ. ৯২৩ হি.) ছয়টি মত উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

১. মুহাররম, ২. সফর, ৩. রবিউল আউয়াল, ৪. রবিউল আখের, ৫. রজব, ৬. রমাজান।

তবে জমহুর (সংখ্যাগুরু ঐতিহাসিকগণ) এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে রাসূল সাঃ এর জন্মগ্রহণ রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছে।

হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন, ثم الجمهور على أنه كان في شهر ربيع الأول

---

352 আল মু'জামুল কাবীর: ১১/৮৫ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম।

353 মূল লেখক- মুফতী রেজাউল হক : শায়খুল হাদীস : দারুল উলূম যাকারিয়া দ.আফ্রিকা অনুবাদ : মুফতী আতীকুল্লাহ। https://ahlehaqmedia.com/7046/

"অতঃপর জমহুর একমত হয়েছেন রবিউল আউয়াল মাসের ওপর।[354]

বিশ্বনন্দিত প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন আল্লামা মুহাম্মদ যাহেদ কাউসারী (রহ.) বলেন, রবিউল আউয়াল ব্যতীত অন্য মাসে জন্ম লাভ করার মতামতটি বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তা ভুলক্রমে কারো কলমে চলে এসেছে হয়তো।[355]

তবে নির্দিষ্ট কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, এ বিষয়েও বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।

আল্লামা ক্বাসতলানী (রহ.) মোট সাতটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। যথাঃ ১ রবিউল আউয়াল। ২ রবিউল আউয়াল। ৩ রবিউল আউয়াল। ৪ রবিউল আউয়াল। ৫ রবিউল আউয়াল। ৬ রবিউল আউয়াল। ৭ রবিউল আউয়াল।[356] আল্লামা যাহেদ কাওসারী রহ. বলেন, ৮, ৯ ও ১০ এই তিন মতামত ব্যতীত অন্যান্য মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো এই তিনটি রেওয়ায়াত। এখন প্রশ্ন হল, এ তিনটির কোনটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য এবং কেন?

১০ তারিখের রেওয়ায়াত :

এ রেওয়ায়াতকে ইবেন সা'আদ (রহ.) (মৃ. ২৩০ হি.) মুহাম্মদ বাকের (রহ.) (মৃ. ১১৪)-এর দিকে নিসবত করেন। কিন্তু এ সনদে তিন বর্ণনাকারী এমন রয়েছেন যাঁরা বিতর্কিত, যাঁদের বিষয়ে কালাম রয়েছে। সুতরাং ১০ তারিখের রেওয়ায়াতটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য নয়।

---

[354] আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া: ২/৩২০।

[355] মাকালাতে কাউছারী,: পৃ. ৪০৫।

[356] আল-মাওয়াহিবুল লাদুননিয়্যাহ: ১/১৪০-১৪২।

আর এ রেওয়ায়াতটির দিকে আল্লামা কাউছারী (রহ.) ইঙ্গিত করেছেন। এ রেওয়ায়াত নকল করা হয় তবকাতে কুবরা থেকে। রেওয়ায়াতটি হলো,

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمی قال: حدثنی أبو بكر ابن عبد الله بن ابی سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبی فروة عن أبی جعفر محمد بن علی (يعرف بمحمد الباقر) قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول، ....

فبين الفيل وبين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس وخمسين ليلة

অনুবাদ : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী যিনি মুহাম্মদ আল বাকের নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সা্ঃ এর জন্ম হয়েছে সোমবার দিন ১০ রবিউল আউয়াল। ...হাতি বাহিনীর অভিযান ও রাসূল সা্ঃ এর পবিত্র জন্মের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ৫৫ দিন।[357]

১২ রবিউল আউয়াল'-এর রেওয়ায়াত :

এ রেওয়ায়াতের বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) কিন্তু তিনি কোনো সনদ বর্ণনা করেননি। এ বর্ণনাটি যদিওবা অধিক প্রসিদ্ধ ও সর্বাধিক প্রচলিত এবং মক্কাবাসী সেই অনেক আগে থেকেই এ দিনেই সিরাত সেমিনার করে থাকেন সাথে সাথে পৃথিবীব্যাপী সভা-সেমিনার এই দিনেই হয়ে আসছে এতদ্বসত্ত্বেও এ রেওয়ায়াতটি প্রমাণসিদ্ধ নয় এবং এই দিনেই যে রাসূল সা্ঃ এর জন্ম হয়েছে, তার কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না।

একটি রেওয়ায়াত পাওয়া গেলেও সেটি মুত্তাসিল না হওয়াতে অগ্রহণযোগ্য বরং তা সনদহীন রেওয়ায়াতের ন্যায়। রেওয়ায়াতটি নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: «وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ

---

357 আত-তাবকাতুল কুবরা: ১/১০০।

মুহাম্মদ ইবেন ইসহাক থেকে বর্ণিত “রাসূল সা্ঃ জন্মগ্রহণ করেন রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে।”[358]

৯ তারিখে জন্মগ্রহণ নিয়ে বিশ্লেষণ :

সূত্র ও যুক্তির বিচারে যে মতটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তা হলো, রাসূল সা্ঃ এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের আট দিন পর নবম তারিখে।

বর্ণনাসমূহ :

১- আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহ.) (মৃ. ৪৬৩ হি.)

এ বিষয়ে মতানৈক্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত মতটি সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন।[359]

قال أبو عمر: وقد قيل لثمان وخلون منه وقيل..، قيل... وقيل..

২- হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন,

وَقِيلَ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْهُ حَكَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَعُقَيْلٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَصْحَابِ التَّارِيخِ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهُ وَقَطَعَ بِهِ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْخُوَارِزْمِيُّ وَرَجَّحَهُ الحافظ أبو الخطاب بن دِحْيَةَ فِي كِتَابِهِ التَّنْوِيرِ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ

“কেউ কেউ বলেন, রাসূল সা্ঃ এর জন্ম মাসের আট দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবম দিনে হয়েছে।

হুমায়দি (রহ.) ইবনে হাযম থেকে বর্ণনা করেন, মালেক, উকাইল, ইউনুস বিন ইয়াযিদ প্রমুখ ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতঈম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন।

ইবনে আব্দিল বার (রহ.) বলেন, ইতিহাসবিদরা উপরোক্ত মতের সত্যায়ন করেছেন।

---

[358] মুসতাদরাকে হাকেম, হা. ৪১৮৩।

[359] আল ইস্তি’আব: ইবনে আব্দিল বার (রহ.), ১/৩০।

হাফেযে কবীর মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারযামী (রহ.) তাঁকে আরো সুনিশ্চিত ও মাযবুত করেছেন এবং হাফেয আবুল খাত্তাব ইবনে দিহয়া নিজ গ্রন্থে এ রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।”[360]

৩- হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান (রহ.) (মৃ. ১৩৮২ হি.) লিখেছেন, সাধারণ জনগণের মধ্যে ১২ রবিউল আউয়ালের মতটি অধিক প্রচার-প্রসার হয়, যার ভিত্তি দুর্বল রেওয়ায়াতের ওপর। আর কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরামের মত হলো, **৮ রবিউল আউয়াল,** তবে বিশুদ্ধ ও প্রমাণসিদ্ধ মতটি হচ্ছে ৯ রবিউল আউয়াল। বিশ্ববিখ্যাত জীবনীকার, ইতিহাস রচয়িতা ও আইম্মায়ে হাদীসসহ অনেকেই এ তারিখকে সহীহ ও মজবুত বলেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হুমাইদী (রহ.), উকাইল (রহ.), ইউনুস ইবনে ইয়াযিদ (রহ.), ইবনে হাযম (রহ.), মুহাম্মদ ইবনে মুসা খাওয়ারযামী (রহ.), আবুল খাত্তাব ইবনে দিহয়া (রহ.), ইবনে তাইমিয়া (রহ.), ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.), ইবনে কাসীর (রহ.), ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) ও শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (রহ.)।[361]

৪- আল্লামা সুলাইমান নদভী (রহ.) ও ৯ রবিউল আউয়ালকে রাসূল সা্ঃ এর জন্ম তারিখ হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[362]

যুক্তির বিচারে ৯ রবিউল আউয়াল

১- মুহাম্মদ ইবনে মুসা খাওয়ারযামী (রহ.) (মৃ. ২৩৫ হি.) ছিলেন সৌরবিজ্ঞানী। তাঁর মতের কথা আগেই বলা হয়েছে।

---

[360] আল-বিদায়া আন-নিহায়া: ২/৩২০।

[361] কাসাসুল কোরআন: ৪/২৫৩।

[362] রাহমাতুল লিল আলামীন: ১/৩৮-৩৯।

২- সৌর বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা মিশরী (১৩০২ হি.) ফ্রান্সিস ভাষায় تقويم العرب قبل الإسلام(ইসলাম পূর্ব- আরবরে ক্যালেন্ডার) এ বিষয়ে অসাধারণ এক গ্রন্থ রচনা করেন। আরবীতে অনুবাদ করেন, আল্লামা আহমদ যকী পাশা (মৃ. ১৩৫৩ হি.) যার নাম হলো,

نتائج الإفهام فى تقويم القرب قبل الإسلام وفى تحقيق مولد النبى وعمره عليه الصلاة والسلام

এই কিতাবটিতে বহু বৈজ্ঞানিকের উদ্ধৃতিকে সামনে রেখে করা গবেষণা ও বিশ্লেষণে ৯ রবিউল আউয়াল তারিখটি স্পষ্ট হয়ে উঠে।[363]

উপরোক্ত কিতাবে উল্লেখ করা বিশ্লেষণসমূহ থেকে একটি বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ রাসূল সাঃ এর পবিত্র যুগে দশম হিজরীর মাহে শাওয়ালের শেষ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। একই দিনেই রাসূল সাঃ এর সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন,

يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم يَعْنِي بن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرَ جُمْهُورُ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّهُ مَاتَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ ...... وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন, যেদিন রাসূল সাঃ এর প্রিয় ছেলে ইবরাহীম (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন (সেদিনই সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটে)।

অধিকাংশ সীরাত প্রণেতাগণ বলেন, তিনি মারা যান দশম হিজরিতে। কোন মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয় সে বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও সংখ্যাগুরু উলামায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে দশম মাস তথা শাওয়াল মাসে সূর্যগ্রহণের ঘটনাটি ঘটেছিল।[364]

---

[363] নাতায়িজুল আফহাম: পৃ. ৩৫-৩৮।

[364] ফাতহুল বারী: ৩/৪৮৯।

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী গণনা করা হলে রাসূল সা্ঃ এর জন্মগ্রহণ রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখে হওয়াটাই প্রমাণিত হয়। কেননা, জন্মের দিনটি যে সোমবার এ বিষয়ে তো সাবাই একমত আর সেদিনটি হস্তি বাহিনী ধ্বংসের বছরের রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখেই হয়। এ ছাড়া অন্য তারিখে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আল্লামা মাহমুদ পাশা বলেন, "সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেন যে রাসূল সা্ঃ এর শুভ জন্মের শুভ দিনটি ছিল সোমবার। (আবরাহার হাতি বাহিনীর অভিযানের বছরের) রবিউল আউয়াল মাসের ৮ কিংবা ১২তম তারিখে সোমবার পাওয়া যায় না। সে মাসের নবম দিনে সোমবার ছিল। সুতরাং নবম দিন ছাড়া ভিন্ন অন্য কোনো তারিখে রাসূল সা্ঃ এর জন্ম হয়েছে, এ কথা অগ্রহণযোগ্য বলেই সাব্যস্ত হবে।"

হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান (রহ.) বলেন, মাহমুদ পাশা (কুসতুনতুনিয়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সৌরবিজ্ঞানী ছিলেন) তিনি জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে যে নক্ষত্রসূচি/বর্ষপুঞ্জি প্রণয়ন করেছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল সা্ঃ এর যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের যত ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার একটা সঠিক হিসাব বের করা।

তিনি তাতে পূর্ণ তাহকীকের সাথে প্রমাণ করেছেন যে রাসূল সা্ঃ এর মোবারক জন্মের বছরে কোনোভাবেই সোমবার ১২ রবিউল আউয়ালে পড়ে না বরং তা একমাত্র ৯ রবিউল আউয়ালেই পড়ে। শক্তিশালী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে, বিশুদ্ধ সূত্র ও বর্ণনার নিরিখে, জ্যোতির্বিদ্যা ও সৌর বিজ্ঞানের আলোকে রাসূল সা্ঃ এর জন্মগ্রহণের গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য তারিখ হলো ৯ রবিউল আউয়াল।[365]

---

[365] কাসাসুল কোরআন: ৪/২৫৩।

৩- উপরোক্ত নাতায়েজু আফহাম... নামক গ্রন্থের এক অ্যাডিশনে ভূমিকা লিখেছেন সে যুগের প্রসিদ্ধ ইসলামিক চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ ও বিখ্যাত সাহিত্যিক শায়খ আলি তানতাবী (রহ.) (মৃ. ১৪২০ হি.)। তিনি নিজের লিখিত ভূমিকায় গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক গৃহীত প্রাধান্য পাওয়া ৯ তারিখের মতের পক্ষে জোরদার সমর্থন জুগিয়েছেন।[366]

৪- স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও গবেষক শায়খ আহমদ শাকের (রহ.) (আহমদ বিন মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, মৃ. ১৩৭৭ হি.) তিনিও শায়খ বৈজ্ঞানিক মাহমুদ পাশার গবেষণা মেনে নিয়েছেন এবং সে গবেষণা থেকে সূর্যগ্রহণ-বিষয়ক সহযোগিতা নিয়েছেন।[367]

৫- আরবের গবেষক সৌরবিজ্ঞানী আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (মৃ. ১৪১৬ হি.) লিখেছেন, “বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সা্ঃ শুভাগমন হয় ২০ এপ্রিল ৫৭১ ইংরেজিতে আমুল ফিল’-এ...সুতরাং তাঁর জন্ম-মৃত্যুর দিন খুব সূক্ষ্মভাবে বের করা সম্ভব...এর ভিত্তিতে বর্ণনার বিচারে ও যুক্তির আলোকে রাসূল সা্ঃ এর জন্মতারিখ হলো ৯ রবিউল আউয়াল হিজরীপূর্ব ৫৩ সনে মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ।[368]

আরো দ্রষ্টব্য: গবেষণা প্রবন্ধ যার শিরোনাম হলো تحديد ميلاده الشريف যা সন্নিবেশিত রয়েছে; ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية নামক গ্রন্থে, লেখক হলেন মুহাম্মদ ইবেন আবদুল্লাহ। সে প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বৈজ্ঞানিক আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীমের উপরোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতামতের আলোকে ৯ তারিখের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

---

[366] মুকাদ্দামাতুত তানতাবী: ৮৩।

[367] হাশিয়াতুশ শায়খ আহমদ শাকের ‘আলাল মুহাল্লা বিল আছার: ৫/১১৪-১১৫।

[368] তাকভীমুল আযমান: পৃ. ১৪৩।

অনুরূপ আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) নিজের রচিত প্রবন্ধ المولد الشريف النبوي- এ মাহমুদ পাশার উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং প্রবন্ধ রচনায় তাঁর রচিত কিতাব থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা নিয়েছেন এবং তাঁর সাথে সহমতপোষণ করেছেন।[369]

আরো দ্রষ্টব্য হযরত মাওলানা মুফতী ওমর ফারুক সাহেব (শায়খুল হাদীস দারুল উলূম লন্ডন) কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ, যা তাঁর প্রণীত কিতাব ফেকহী জাওয়াহের-এ সন্নিবেশিত, ১/৬৮-৭১ ৮ ও ৯ তারিখের বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন মনে রাখতে হবে, কিছু কিছু উলামা হযরাত ৮ তারিখের মতটি গ্রহণ করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৮ ও ৯ উভয়ের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে।
মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব (রহ.) মতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি বলেন, ৮ ও ৯ এর মধ্যে বাস্তবিকার্থে কোনো এখতিলাফ নেই।

কেননা তা মাসের ২৯ ও ৩০ এর হিসাবের ওপর নির্ভরশীল। হিসাব করে দেখা যায়, সঠিক তারিখটি ছিল মূলত ২১ এপ্রিল। এ হিসেবে ৮ তারিখের সকল বর্ণনা ৯ তারিখের জন্য সহায়ক হয়ে যায়।[370]

রাসূল সাঃ তার শুভাগমনকে কেন্দ্র করে তিনি কিভাবে তা পালন করেছেন? অথবা তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামগণ কিভাবে তাঁর আগমন কেন্দ্র করে খুশি-উদযাপন করছেন?

---

[369] মাকালাতে কাউসারী: পৃ. ৪০৫-৪০৮।

[370] কাসাসুল কোরআন: ৪/২৫৪।

নিঃসন্দেহে নবীজীর আগমন আমাদের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয়। নবীজীর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ। নবীজীর আলোচনা ঈমানদারের লক্ষণ। নবীজী ছিলেন, পুরো জগতের জন্য রহমত স্বরূপ।

যেহেতু তিনি এ মাসেই আগমণ করেছেন। এজন্য আমাদের জানতে হবে, কোরআন সুন্নাহে নবীজীর আগমন উপলক্ষ্যে কোন দিক নির্দেশনা রয়েছে কি না? যেহেতু ইসলাম ওহী ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার নাম। তাই ইসলামে কোন বিষয় অনুমোদন থাকা বা না থাকা নির্ভর করে ওহীর দুই মূল উৎস তথা কোরআন ও সুন্নাহের উপর। কোরআন ও সুন্নাহে অনুমোদন থাকলে তা হবে দ্বীন। অন্যথায় তা দ্বীনের নামে দ্বীনের মাঝে নতুন সংযোজন বলে গৃহিত হবে। যা পরিত্যাজ্য।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواۚ রাসূল সা. তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।[371]

হাদীস শরীফে আসছে,

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

মালিক (রহঃ) বলেন, তাঁর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত।[372]

এবং সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রা.) এর বর্ণনায় এসেছে, নবি কারিম সা্ঃ ইরশাদ করেন :

---

[371] সূরা হাশর আয়াত: আয়াত ৭।

[372] মুয়াত্তা মালেক, হা. ২৬১৮।

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ

'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কোনো বিষয় সংযোজন করবে তা প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে।'[373]

বাস্তবতা হলো, সমগ্র কুরআন ও সুন্নাহে মৌখিক বা কর্মবিষয়ক এমন একটি দলীলও পাওয়া যায় না, যদ্বারা প্রমাণিত হবে যে, নবীজীর আগমণ উপলক্ষ্যে প্রচলিত পদ্ধতির উদযাপনের প্রামাণ্যতা সাব্যস্ত হয়। নবীজী সা্ঃ এর নবুওয়াতী জীবনে তেইশটি জন্মদিন গত হয়েছে, কিন্তু সহীহ তো দূরে থাক, কোনো দুর্বল বর্ণনায়ও আসেনি যে, তিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁর জন্মদিন পালন করেছেন। তাই হাদীসের পরিভাষায় এটা দ্বীনের মধ্যে নতুন এক সংযোজন ও বিদআত, যা সম্পূর্ণরূপে পরিহারযোগ্য।
এমনিভাবে রাসূল সা্ঃ এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামদের মাঝেও এর কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ রাসূল সা্ঃ এরশাদ করেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،

'অতএব, তোমরা আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শ অনুসরণ করো। তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরো।'[374]

অন্য বর্ণনায় এসেছে

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

আমার সাহাবীরা তারকা সমতূল্য যদি কোন ব্যক্তি তাদের কারো অনুসরণ করে সে হিদায়াত পেয়ে যাবে।[375] ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায়, হুজুর সা্ঃ এর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম কোনোদিন রাসূলের আগমণ

---

[373] বুখারি: ৩/১৮৪, হা. ২৬৯৭।

[374] ইবনে মাজাহ: ১/১৫, হা. ৪২।

[375] জামেউ বয়ানিল ইলমী ওয়াফাজলিহী, ৮৯৫ (ইবনে আবদুল বার), আহকাম কিতাবে: ৬/২৪৪ (ইবনে হযম)।

উপলক্ষে খুশি উদযাপন করেন নি। অথচ তাঁরা ছোট থেকে ছোট, সামান্য থেকে সামান্য একটি সুন্নাত-মুসতাহাব আমল পর্যন্ত কখনো ছাড়তে রাজি ছিলেন না। তাঁদের নবীপ্রেম ছিলো জগদ্বিখ্যাত, যার বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় ভরপুর। সুতরাং এ উপলক্ষ্যে বর্তমানের প্রচলিত পদ্ধতিতে খুশি উদযাপন করা দ্বীনের মধ্যে নতুন এক সংযোজন ও বিদআত, যা সম্পূর্ণরূপে পরিহারযোগ্য।

বর্তমানে প্রচলিত সিস্টেমে রাসূল সা: এর আগমনকে উদ্দেশ্য করে খুশি-উদযাপন করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

শরীয়ত আল্লাহ প্রদত্ত একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। হুজুরে আকরাম সা: এর জীবদ্দশায় শরীয়ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলার বাণী থেকে বুঝা যায়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'[376]

সুতরাং শরীয়তের মধ্যে বাড়ানো বা কমানো কোনটার সুযোগ নেই। বাস্তবতা হল, নবীপ্রেম অন্তরে থাকতে হবে। শুধু সামান্য সময় নয়। বরং পরিপূর্ণ রূপে। সব সময়। সর্বাবস্থায়। যেহেতু নবীপ্রেম ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। আর ঈমান যেমন সার্বক্ষনিক থাকা লাগে? নবীপ্রেমও সার্বক্ষণিক থাকা জরুরী। কিছুক্ষন আছে কিছুক্ষন নাই এর দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়।

---

[376] সুরা আল-মায়িদা: আয়াত ৩।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ।[377]

হাদীসে আসছে,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।[378]

কুরআন ও হাদীস থেকে বুঝে আসলো যে, নবীর ভালোবাসা সারা বছরই অন্তরে থাকতে হবে। যেহেতু তা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। আর ঈমান এমন একটি জিনিস, যা সার্বক্ষণিকই থাকা লাগে। সুতরাং রাসূলের ভালবাসা এই মাসের সাথে নির্দিষ্ট না। এ মাস আসলেই ভালোবাসা দেখিয়ে বাকি এগারো মাস বসে থাকা কোন খাঁটি আশেকে রাসূলের কাজ হতে পারে না। তারপরও এ মাসে মুহাব্বত উজ্জীবিত হয়, কারণ এই মাসে বিশ্বনবী মুহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

[377] আল আহ্‌যাব: আয়াত ৬।

[378] বুখারী, হা. ১৫।

শুভাগমন হয় এবং এই মাসেই তাঁর ওফাতে মোবারাকা হয়, তিনি রফিকে আ'লার ডাকে সাড়া দেন।

উল্লেখ্য; আমরা যারা নবীজীর আগমণকে উদ্দেশ্য করে খুশি উদযাপন করছি, মূলত তা বিধর্মীদের সাথে মিলে যায় তথা খ্রীস্টানরা যেমন হযরত ঈসা আ. এর জন্মকে কেন্দ্র করে ক্রিসমাস ডে পালন করে থাকে। তাঁর জিবনী থেকে কিছুই অর্জন করে না। তেমনিভাবে আমরাও বৎসরে একদিন নবীজীর জন্ম মুবারক পালন করি। বাকি এগার মাস আর আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ রাসূল সা্ঃ বিধর্মীদের বিরোধিতা করার জন্য স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে গেছেন। সুতরাং নির্দিষ্ট তরিকার এই খুশি উদযাপনকে পরিহার করা চাই। বর্তমানে কিছু নামধারী মুসলমানরা একে বিভিন্ন ঢোল-তবলা বাঁশি বাজিয়ে পালন করে থাকে যা স্পষ্ট হারাম।

বর্তমানে আমরা যারা প্রচলিত সিস্টেমে রাসূল সা্ঃ এর আগমনকে উদ্দেশ্য করে খুশি-উদযাপন করছি তা একেবারেই শরীয়ত গর্হিত কাজ।

এর কয়েকটি কারণ হলো:

১- এ কাজ রাসূল সা্ঃ থেকে প্রমাণিত নয়।

২- সাহাবায়ে কেরামগণের আমল তথা মৌখিক/কর্মপন্থাগতভাবেও প্রমাণিত নয়।

৩- সোনালী যুগ, যাকে রাসূল সা্ঃ সবচেয়ে উত্তম যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন, ইতিহাসের কিতাবাদি তালাশ করেও তাদের কর্ম জীবনী থেকে কোন বক্তব্য বা আমল এর স্বপক্ষে পাওয়া যায়না।

৪- রাসূল সা্ঃ এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আম্মাজান আয়েশা (রা.) থেকেও এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

৫- প্রায় ৬শত হিজরীর আগে এর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। না কোরআনে হাদীসে। না নির্ভযোগ্য কোন ইতিহাসের কিতাবে।

৬- নবীজীর আগমণকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ প্রদত্ত শরয়ী পরিভাষা ‘‘ঈদ’’ কে নিজ খুশি মতো ব্যবহার করে, উক্ত দিনকে ‘‘সাঈয়েদুল আই’য়াদ’’ সকল ঈদের সেরা ঈদ বলে প্রচার করা হয়।

অথচ আল্লাহ প্রদত্ত নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য দিনকে খুশির দিন/ঈদের দিন বলে প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَّخِذُوا شَهْرًا عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا يَوْمًا عِيدًا

রাসুলুল্লাহ সা্ঃ বলেন:- “তোমরা কোনো মাসকে উৎসব [ঈদ] বানাবে না এবং (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতিত) কোনো দিবস কে উৎসব [ঈদ] বানাবে না ।”[379]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ বলেন:

وأصل هذا: أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيدا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وهي أعياد العام ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا وموسما بدعة لا أصل له في الشريعة

মূলনীতি হলোঃ- শরীয়তে যে কয়টি ঈদের বিষয়ে বলা হয়েছে, সেগুলো ব্যতিত মুসলমানদের জন্য কোনো ঈদের উৎসব পালন নির্ধারিত (জায়েজ) নয় ।।

ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন, তাশরিকের দিনগুলো—এগুলো বাৎসরিক ঈদ । আর জুমুআর দিন-যেটা হলো সাপ্তাহিক ঈদ। এগুলো ব্যতিত অন্যকোনো দিবসকে ঈদ বলা নিঃসন্দেহে বিদআত । শরীয়তে এর কোনোই ভিত্তি নেই।[380]

---

379 মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা. ৭৪৫৩।

380 লাতায়িফুল মা‘আরিফ: পৃষ্ঠা ১১৮।

করণীয় আমল:

সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা চারটি মাসকে সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন। উক্ত মাসগুলোতে রবিউল আউয়াল মাসের ব্যাপারে কোনো আলোচনা পাওয়া যায়না।

তা ছাড়া হাদীসের কিতাবাদীতেও রমজান মাসসহ অন্যান্য মাসের আমলের আলোচনা পাওয়া গেলেও রবিউল আউয়াল মাস সম্পর্কে কোন আলোচনা পাওয়া না। সুতরাং কোরআন ও হাদীস (সুন্নাহ) যাচাই বাছাইয়ের পর একথা স্পষ্ট যে, রবিউল আউয়াল মাসের জন্য নির্দিষ্ট কোন আমল নেই।

তবে একটি হাদীসে আসছে, রাসূলুল্লাহ সা: প্রতি সোমবার রোজা রাখতেন।

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الإثنين، فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم يبعث

"হাদীসে বর্ণিত আছে যে রাসূল সা: কে সোমবার-বিষয়ক প্রশ্ন করা হলো। রাসূল সা: উত্তরে বললেন, সেটি এমন দিন, যাতে আমার জন্ম হয়েছে এবং প্রেরিত হয়েছি।[381]

এজন্য কেউ যদি রাসূলের শানে মুহাব্বাত প্রকাশ করতে চায়। খুশি উদযাপন করতে চায়, তার উচিত শুধু রবিউল আউয়ালে নয়, বরং সারা বৎসর যেদিনই সোমবার আসবে সেদিন রোজা রাখা। এর চেয়ে ইশকে রাসূল প্রকাশের আর কোন উত্তম পদ্ধতি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা আপনার, বিস্তারিত আলোচনাটি অধ্যায়নের পর বিষয়টি আপনার কাছে স্পষ্ট যে, যেহেতু এই
মাসে নবীজি সা: এই ধরার বুকে এসে ধরাকে আলোকিত করেছেন, তাই এই খুশিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর লোক বিভিন্ন পন্থায়

---

[381] মুসলিম, হা. ১১৬২, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/৩১৯।

মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে ঈদে মিলাদুন্নাবী নামে ঈদ উদযাপন করে থাকেন। খুশি উদযাপন করে থাকেন।

অপরদিকে অন্য এক শ্রেণী বিশ্ব নবী সা্ঃ এর এই ধরাকে এতিম করে রফিকে আলার ডাকে সাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোন প্রকারের বিদআত, রুসুমাত-কুসংস্কার ইত্যাদির সাথে জড়িত না হয়ে কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মাসটি কাটান। তথা বিশ্ব নবী সা্ঃ এর ইহকাল ত্যাগের পর সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে মাসটি বা নির্দিষ্টি তারিখটি পালন করেছেন সেভাবেই তারা উদযাপন করে থাকেন।

বস্তুত প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাজটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে চমৎকার বা নবীজির প্রতি ভালোবাসার বহি:প্রকাশ মনে হলেও বাস্তবতায় বিষয়টি এমন নয়। কারণ এমন ভালোবাসাতে রয়েছে বিষ মিশ্রিত; তথা শরীয়ত সাংঘর্ষিক বিষয় যা পরিত্যাজ্য।

দুঃখজনক বিষয় হলো, মূলত এমন কাজগুলো শিয়াদের কাজ। যারা বস্তুত মুসলমান নয়। অথচ আমরা খাঁটি মুসলমান হয়েও আমাদের কাজকর্ম বিধর্মীদের সাথে মিলে যায়।

রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ গ্রহণ করলো, সে (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[382]

বর্জনীয় আমল

১- বর্তমান প্রচলিত পদ্ধিতিতে রাসূলের শানে খুশি উদযাপন/ঈদে মিলাদুন্নাবী।

২- জায়গায় জায়গায় মিলাদের মাধ্যমে মিষ্টি বিতরনের প্রথা।

৩- মিছিলের নামে, র‍্যালির নামে সম্পদের অপচয়।

---

[382] আবু দাউদ, হা. ৪০৩১।

রবীউস সানী মাস

হিজরী সনের চতুর্থ মাস রবিউস সানী। এই মাসে নির্দিষ্টভাবে বিশেষ কোন আমল কোরআন সুন্নাহে পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন তরিকত পন্থিদের নির্দিষ্ট মনগড়া কিছু আমল পরিলক্ষিত হয়, যার ভিত্তি কোরআন সুন্নাহে নেই। সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

বানোয়াট কিছু আমল বিষয়ে পর্যালোচনাঃ

এ মাস কেন্দ্রিক শিয়াদের আমল সমূহঃ

১. ১লা রবিউস সানী'র আমলসমূহঃ এস, এ, এ সৈয়দ ইবনে তাউস (রহ.) রবিউস সানী, জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরা মাসে প্রথম দিনে দুআর কথা বর্ণনা করেছেন। ১লা রবিউস সানীতে এ দো'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব। দো'আটি নিম্নরূপ:

اللّهُمَّ أَنْتَ إِلهُ كُلِّ شَيْءٍ، وَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ مالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، أَسْأَلُك بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى، وَ الْغايَةِ وَ الْمُنْتَهى، وَ بِما خالَفْتَ بِهِ بَيْنَ الْأَنْوارِ وَ الظُّلُماتِ، وَ الْجَنَّةِ وَ النّارِ، وَ الدُّنْيا وَ الاخِرَةِ، وَ بِأَعْظَمِ أَسْمائِكَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَ أَتَمِّ أَسْمائِكَ فِي التَّوْراةِ نبْلًا .وَ أَزْهَرِ أَسْمائِكَ فِي ال زَّبُورِ عِزّاً، وَ أَجَلِّ أَسْمائِكَ فِي الانْجِيلِ قَدْراً، وَ أَرْفَعِ أَسْمائِكَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْراً، وَ أَعْظَمِ أَسْمائِكَ فِي الْكُتُبِ الْمُنْزِلَةِ وَ أَفْضَلِها، وَ أَسَرِّ أَسْمائِكَ فِي نَفْسِكَ، الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .وَ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ بِالْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ ما حَمَلَ، وَ بِالْكُرْسِيِّ الْكَرِيمِ وَ ما وَسِعَ، أَنْ تُصَلِّيَ علمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تُبِيحَ لِي مِنْ عِنْدِكَ فَرَجَكَ الْقَرِيبَ الْعَظِيمَ الْأَعْظَمَ، اللّهُمَّ أَتْمِمْ عَلَيَّ إِحْسانَكَ الْقَدِيمَ الْأَقْدَمَ، وَ تابِعْ إِلَيَّ مَعْرُوفَكَ الدّائِمَ الْأَدْوَمَ، وَانْعِشْنِي بِعِزِّ جَلالِكَ الْكَرِيمِ الْأَكْرَمِ.

অতঃপর কোরআনের এ আয়াতগুলো পাঠ করতে হবে। আয়াতগুলো নিম্নরূপ:

وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ –الم اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ–

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ–

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى

يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ، ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ–

اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ .قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُو لُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَ سُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلٰهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ–

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ–

حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ –قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ –يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ–

وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى، اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ، وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى

، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى .إِنَّما إِلٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ .أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ –

وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ–

فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَ الْآخِرَةِ، وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ–

وَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْ

ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِ
قٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ .ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ، لا إِلهَ إِلَّا هُوَ
إِلَيْهِ الْمَصِيرُ –ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ–

ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ .هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .الْحَمْ
دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ–

رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ .لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَ
بُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ–

فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ
.هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا
هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ أَلسَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ–

اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَفْواً لَيْسَ بَعْدَهُ عُقُوبَةٌ، وَ رِ
ضى لَيْسَ بَعْدَهُ سَخَطٌ، وَ عافِيَةً لَيْسَ بَعْدَها بَلاءٌ، وَ سَعادَةً لَيْسَ بَعْدَها شِقاءٌ، وَ هُدىً لا يَكُونُ
بَعْدَهُ سَخَطٌ، وَ عافِيَةً لَيْسَ بَعْدَها بَلاءٌ، وَ سَعادَةً لَيْسَ بَعْدَها شِقاءٌ، وَ هُدىً لا يَكُونُ بَعْدَهُ
ضَلالَةٌ، وَ إِيماناً لا يُداخِلُهُ كُفْرٌ، وَ قَلْباً لا يُداخِلُهُ فِتْنَةٌ .اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ السَّعَةَ فِي الْقَبْرِ وَ الْحُجَّ
ةَ الْبالِغَةَ وَ الْقَوْلَ الثّابِتَ، وَ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيَّ الْأَمانَ وَ الْفَرَجَ وَ السُّرُورَ وَ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلى
مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ عَرِّفْنِي بَرَكَةَ هَذا الشَّهْرِ وَ يُمْنَهُ، وَ ارْزُقْنِي خَيْرَهُ، وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّهُ، وَ اجْعَ
لْنِي فِيهِ مِنَ الْفائِزِينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَّابُ الْخَيْرِ فَهَبْ لِي شَوْقاً إِلى
لِقائِكَ، وَ إِشْفاقاً مِنْ عَذابِكَ وَ حَياءً مِنْكَ وَ تَوْقِيراً وَ إِجْلالًا حَتّى
يَوْجَلَ مِنْ ذلِكَ قَلْبِي، وَ يَقْشَعِرَّ مِنْهُ جِلْدِي وَ يَتَجافى لَهُ جَنْبِي وَ تَدْمَعَ مِنْهُ عَيْنِي، وَ لا أَخْلُو مِنْ
ذِكْرِكَ فِي لَيْلِي وَ نَهارِي يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .اللَّهُمَّ إِنِّي اثْنِي عَلَيْكَ وَ ما عَسى
أَنْ يَبْلُغَ مَدْحِي وَ ثَنائِي مَعَ قِلَّةِ عَمَلِي وَ قِصَرِ رَأْيِي، وَ أَنْتَ الْخالِقُ وَ أَنَا الْمَخْلُوقُ، وَ أَنْتَ الْمالِ
كُ وَ أَنَا الْمَمْلُوكُ، وَ أَنْتَ الرَّبُّ وَ أَنَا الْعَبْدُ، وَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَ أَنَا الذَّلِيلُ، وَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَ أَنَا الضَّ
عِيفُ، وَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَ أَنَا الْفَقِيرُ، وَ أَنْتَ الْمُعْطِي وَ أَنَا السَّائِلُ، وَ أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَ أَنَا

خَلْقٌ أَمُوتُ .فَاغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي، وَ أَعْطِنِي سُؤْلِي فِي دُنْيايَ وَ آخِرَتِي، وَ تَجاوَزْ عَنِّي وَ عَنْ جَمِيعِ الْمُ
ؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ، الْأَحْياءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْواتِ .اللّهُمَّ صَلِّ عَلى
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ نَبِيِّكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وَ كَرِّمْ مَقامَهُ
، وَ أَجْزِلْ ثَوابَهُ، وَ أَفْلِجْ حُجَّتَهُ، وَ أَظْهِرْ عُذْرَهُ، وَ عَظِّمْ نُورَهُ، وَ أَدِمْ كَرامَتَهُ، وَ أَلْحِقْ بِهِ أُمَّتَهُ وَ ذُرِّ
يَّتَهُ، وَ أَقِرَّ بِذلِكَ عَيْنَهُ .اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّداً أَكْرَمَ النَّبِيِّينَ تَبَعاً، وَ أَعْظَمَهُمْ مَنْزِلَةً، وَ أَشْرَفَهُمْ كَرامَةً
، وَ أَعْلاهُمْ دَرَجَةً، وَ أَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، اللَّهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيلَةَ، وَ شَرِّفْ بُنْيانَهُ
، وَ عَظِّمْ نُورَهُ وَ بُرْهانَهُ، وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ، وَ تَقَبَّلْ صَلاةَ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ .اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى
مُحَمَّدٍ كَما بَلَّغَ رِسالاتِكَ وَ تَلا آياتِكَ، وَ نَصَحَ لِعِبادِكَ، وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ عَبَدَكَ حَتّى
أَتاهُ الْيَقِينُ، اللّهُمَّ زِدْ مُحَمَّداً مَعَ كُلِّ شَرَفٍ شَرَفاً، وَ مَعَ كُلِّ فَضْلٍ فَضْلًا، وَ مَعَ كُلِّ كَرامَةٍ كَرامَةً
، وَ مَعَ كُلِّ سَعادَةٍ سَعادَةً، حَتّى تَجْعَلَ مُحَمَّداً فِي الشَّرَفِ الْأَعْلى مِنَ الدَّرَجاتِ الْعُلى
.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى
مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ سَهِّلْ لِي مَحَبَّتِي، وَ بَلِّغْنِي امْنِيَّتِي وَ وَسِّعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي، وَ اقْضِ عَنِّي دَيْنِي، وَ
فَرِّجْ عَنِّي غَمِّي وَ كَرْبِي، وَ يَسِّرْ لِي إِرادَتِي، وَ أَوْصِلْنِي إِلى بُغْيَتِي سَرِيعاً عاجِلًا يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

২. **রবিউস সানি মাসের মুস্তাহাব নামায:** সৈয়দ ইবনে তাউস (রহ.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রবিউস সানী মাসে চার রাকাত নামাজ পড়তে হবে। উক্ত নামাজটি মাসের যেকোন সময়ে পড়া যেতে পারে।

নামাযটি পড়ার পদ্ধতি: প্রথম রাকাতে সুরা ফতিহার পরে আয়াতুল কুরসী ১ বার এবং ২৫ বার সুরা ক্বদর পাঠ করতে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে ১ বার সুরা তাকাসুর এবং ২৫ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। পরবর্তি দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে ১ বার সুরা কাফিরুন এবং ২৫বার সুরা ফালাক্ব পাঠ করতে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে ১ বার সুরা নাসর এবং ২৫বার সুরা নাস পাঠ করতে হবে এবং নামাজান্তে বলতে হবে:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

অতঃপর ৭০বার বলতে হবে:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

তারপর তিনবার বলতে হবে:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

এরপর সেজদারত অবস্থায় তিনবার বলতে হবে:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الإِكْرَامِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কাছে মনোবাসনা পূরণের লক্ষ্যে দো'আ করতে হবে। কেউ যদি এ আমলটি সম্পাদন করে তাহলে আগামী বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ, সন্তান সন্তানাদি, দ্বীন ও দুনিয়াকে রক্ষা করবেন, আর সে যদি এই বছরে মারা যায়। তাহলে সে শাহাদতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।[383]

পর্যালোচনাঃ

ইতোপূর্বে শিয়াদের আমল বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, আরবী কয়েকটি মাস যেমন তাদের মনগড়া আমলে ভরপুর ছিলো, এ মাসটিও তা থেকে খালি নয়। বাস্তবতা হলো, রবিউস সানী মাসে নির্ধারিত পন্থায় বিশেষ কোন আমল কুরআন সুন্নাহে পাওয়া যায় না। তবে আমাদের দেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ধর্মভীরু লোকেরা নিজের ইলমের অভাব এবং হক্কানী আলেমদের সাথে সম্পর্ক না থাকার দরুন এমন কিছু কাজ করে, যা তাদের নজরে আমল মনে হলেও আসলে তা ঈমান বিধ্বংসী কাজ। অথচ আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, শুধু সহীহ ঈমান দ্বারাও (বে-আমলির শাস্তির পর) জান্নাত লাভ হবে যদিও

---

[383] https://tvshia.com/bn/content/52828 ।

তা প্রথম অবস্থায় না হোক। কিন্তু সহীহ ঈমান ব্যতীত হাজারো আমল একেবারেই মূল্যহীন। পরিপূর্ণ ঈমান ব্যতীত শুধু আমল দ্বারা নাজাত পাওয়ার কোন অবকাশ নেই।

সর্বপ্রথম কথা হলো, উল্লিখিত কোন আমল কোরআন-সুন্নাহ সম্মত নয়, বরং সেগুলো তাদের মনগড়া কিছু আমল। যা স্পষ্ট বিদআত। বিদআতের ঠিকানা জান্নাত নয়, বরং জাহান্নাম। সুতরাং এ সমস্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য জরুরী।

৩. ফাতিহা ইয়াযদাহম (যা সুন্নী নামধারী বিদআতিদের মাঝে বেশ প্রচলিত)

ফাতিহা বলতে বোঝানো হয়, কোন মৃতের জন্য দু‘আ করা, ঈসালে সওয়াব করা। ইয়াযদাহম ফার্সি শব্দটির অর্থ একাদশ। ৫৬১ হিজরী মুতাবিক ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ রবিউস সানী তারিখে বড়পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রবিউস সানীর ১১ তারিখে যে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, উরস ও ফাতিহাখানী করা হয় তাকে বলা হয় ফাতিহা ইয়াযদহম।[384]

পর্যালোচনাঃ

ইসলামে জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান

আজকাল আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, বিধর্মীদের দেখাদেখি আমরা মুসলমানরা অনেকেই আমাদের নিজেদের বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের জন্ম দিবস বিধর্মী সংস্কৃতিতে অত্যন্ত ঘটা করে পালন করে থাকি। জন্ম দিবসে বিধর্মীদের সংস্কৃতি অনুসরণে মোমবাতি জ্বালানো, কেক

[384] মাসিক তরজুমান এ’ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত ১৪৪৩ হিজরি ডিসেম্বর ২১।

কাটা, অনৈসলামিক গান-বাজনা, নৃত্য পরিবেশন করা হয়। আব্রু ছাড়াই মাহরাম-গায়রে মাহরাম একত্রে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করা হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে আমরা তার এক কানে আজান এবং অপর কানে ইকামত দিয়ে তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেই। অথচ বছর পূর্তির সাথে সাথেই আমরা তার জন্ম বার্ষিকী বা জন্ম দিবস উদযাপন করি, যা ইসলাম সমর্থন করে না।

আবার কারো মৃত্যু হলে আমরা তিজা, চল্লিশা বা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করি। অর্থাৎ মৃত্যুর তিন দিনের দিন কুলখানী, চল্লিশ দিনের দিন চল্লিশা ও বছরান্তে মৃত্যুর তারিখে মৃত্যু বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করি।

বর্তমানে বিষয়টি সামাজিক প্রথাতেও পরিণত হয়েছে। দৈনন্দিন খাবার রুটিনের মতো এ সকল বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। কারো জন্ম তারিখ আসলেই তাকে wish/invite করতেই হবে, না করলে অনেক সময় মনোমালিন্যতা হয়। বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজন, পার্টি, নাচ-গান ইত্যাদিরও আয়োজন করতেও দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে দেখা যায় যে, এ ধরনের অনুষ্ঠান না করাতে কেউ কেউ ফাঁসি দিয়েও আত্মহত্যা করেছে। চিন্তা করা দরকার এধরনের অনুষ্ঠান গুলো কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ইসলামের সকল হুকুম আহকাম, আচার- অনুষ্ঠান সুনির্ধারিত। কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনুল করীমের কোন আয়াত বা কোন হাদীসে কারো জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের কোন দলীল নেই। জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন বিধর্মীদের সাথে সাথে আমাদের মুসলমানদের সমাজে একটি রীতি হয়ে গেছে। জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন ইসলাম অনুমোদন করে না। তাই মুসলমানদের জন্ম দিবস বা মৃত্যু

দিবস পালন করা বিদআত। জন্ম দিবস পালন করা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্বসূরীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এই প্রথাটি মূলতঃ পশ্চিমা সংস্কৃতি, যা পরিত্যাজ্য। ইসলাম ধর্মমতে শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্যে শরীয়ত অনুযায়ী সওয়াব রেছানি করাও আমাদের কর্তব্য।

নবী কারীম সা্ঃ দাফনের পূর্বে দান-খয়রাত, দু'আ ইত্যাদি আমল করে মৃত ব্যক্তির জন্যে ছওয়াব রেছানি করতে বলেছেন। যেন মৃত ব্যক্তি কবরে পৌঁছার আগেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে আযাব থেকে নাজাত পায়। হ্যাঁ, সারা বছরই ছওয়াব রেছানি করা যায়। তিন দিনের দিন, চল্লিশ দিনের দিন বা মৃত্যু বার্ষিকীতে ছওয়াব রেছানি করতে হবে, তা মনে করে ছওয়াব রেছানি করা বিদআত।

তা ছাড়া রাসূলে আকরাম সা্ঃ কারো জন্ম বা মৃত্যু দিবস বা শাহাদত দিবস পালন করেছেন মর্মে কোরআন সুন্নাহের কোথাও উল্লেখ নেই। সাহাবায়ে কেরামগণও এ ধরনের কোন আমল করেননি। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর জীবনে নবুওয়্যাতের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রায় ২৩টি জন্মদিন অতিবাহিত হয়েছে, কোন সাহাবা থেকে এর প্রমাণতো পাওয়া যায়নি যে, সাহাবাগণ তাঁর জন্মদিন পালন করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় অনেক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে; তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হযরত খাদিজা (রাঃ) এর ইন্তেকাল, সাহাবীয়া সুমাইয়া (রাঃ) এর নির্মমভাবে শাহাদতবরণ, তাঁর একাধিক সন্তানের ইন্তেকাল, উহুদ যুদ্ধে তাঁর প্রিয় চাচা হামযা (রাঃ) শাহাদত বরণ, মুস'আব বিন উমায়ের (রাঃ) সহ নবী কারীম সা্ঃ এর অনেক প্রিয় সাহাবী শহীদ হয়েছেন। তিনি তাদের জন্য কেঁদেছেন। কিন্তু তাদের কারো জন্য মৃত্যু বা শোক দিবস পালন করেননি।

উহুদ যুদ্ধের পর হুজুরে আকরাম সাঃ বনী আমের গোত্রের অধিবাসীদের অনুরোধে তাদেরকে দ্বীন-ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর প্রিয় সাহাবীদের মধ্য থেকে বাছাই করে কুরআনে হাফেজ, আলেম সত্তর জন সাহাবীকে সে অঞ্চলের প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ‘বীরে মাউনা’ নামক স্থানে শত্রুরা আক্রমন করে তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের মধ্যে মাত্র একজন সাহাবী, কা’ব ইবনে যায়েদ, জীবন নিয়ে মদীনায় ফিরে এসে নবী কারীম সাঃ এর নিকট এ নির্মম ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাঃ এত ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন যে, রহমাতুল্লিল আলামীন হয়েও হত্যাকারীদের শাস্তি ও ধ্বংস কামনা করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদ দু‘আ করেন। তাই বলে তিনি এসব শহীদানের জন্যে মৃত্যু দিবস বা শোক দিবস পালন করেননি।

এমনিভাবে মুতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.), জা‘ফর বিন আবি তালিব (রা.), আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.), এর শাহাদাতের খবর মদীনাতে পৌঁছার পর রাসূলে কারীম সাঃ অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন। এ সমস্ত সাহাবী আযমাঈনগণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই যুদ্ধ করে জীবন দিয়েছিলেন। এ সকল মহান সাহাবীদের সাথে নবী কারীম সাঃ এর যেমন ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক, তেমনি ছিল দ্বীন ইসলামের সম্পর্ক। এতদসত্ত্বেও রাসূলে কারীম সাঃ তাদের জন্য শোক দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করেননি।

সাহাবী আযমাঈনগণ (রা.) নবী কারীম সাঃ এর জীবিতকালে বা ওফাতের পর তাঁর জন্যে জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করেননি। হুযুর সাঃ এর ওফাতের পর হযরত ওমর (রাঃ) শহীদ হলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) শহীদ হলেন, শাহাদত বরণ করলেন হযরত আলী (রা.)। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁদের কারো জন্যে মৃত্যু দিবস পালন করেননি।

তাই ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করা এবং এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা বিদআত। দুনিয়াতে আল্লাহপাক কমও বেশ একলক্ষ্য চব্বিশ হাজার নবী রাসূল (আঃ) পাঠিয়েছেন[385], তারপরে খুলাফায়ে রাশেদীন, বহুসংখ্যক সাহাবী আযমাঈন, তাবেঈন, তাবয়ে-তাবেঈন, আওলিয়ায়ে কেরাম জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ইন্তেকাল করেছেন। তাঁরা কেউই জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করেননি। যদি তাদের জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করা সওয়াবের কাজ হত বা ইসলাম সমর্থিত হত, তাহলে প্রতিদিনই শত শত জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করতে হত এবং তা অবাস্তব এবং অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

জন্ম দিবস পালনের ইতিহাস

জন্ম দিবস পালনের ইতিহাস তালাশ করলে জানা যায় যে, হিজরীর চতুর্থ শতকে উবাইদ নামে এক ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় উবাইদুল্লাহ। তিনি নিজেকে ফাতিমা (রাঃ) এর সম্ভ্রান্ত বংশধর বলে দাবী করেন এবং মাহদী উপাধি ধারণ করেন। তার প্রপৌত্র মুয়িব লিদীনিল্লাহ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের জন্মবার্ষিকীর অনুকরণে ছয়টি জন্মবার্ষিকী ফাতিমী শিয়া মুসলমানদের মধ্যে চালু করেন। মিশরের ফাতিমী শিয়া শাসকরা মুসলমানদের মধ্যে জন্মবার্ষিকী পালন অব্যাহত রাখেন। এই ফাতিমী শিয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবু মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ ইবনু মায়মুন প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন।[386] কারো মতে তিনি অগ্নিপূজারী ছিলেন।[387] ইতিহাস থেকে আরও

---

[385] মুসনাদে আহমদ, হা. ২২৩৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা. ৯৪, তাবারানী, হা. ৭৮৭১।

[386] আল বিদায়া ওয়াননিহায়া: ১১/১৭২ পৃষ্ঠা।

[387] আল খুতাত ওয়াল আ-সার: (মাকরিযী) ১/৪৮ পৃষ্ঠা।

জানা যায় যে, মিশরের ফিরআউন জন্মোৎসব পালন করতো।[388] ফিরআউন ছিল ইয়াহুদী। তারপর ঐ ইয়াহুদী রীতি খৃষ্টানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। ফলে তারা তাদের নবী ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষিকী 'ক্রিসমাস ডে' নামে পালন করতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে জন্মবার্ষিকী পালন রীতি চালু হওয়ার একশত তিন বছর পর অর্থাৎ ৪৬৫ হিজরীতে আফজাল ইবনে আমিরুল জাইশ মিশরের ক্ষমতা দখল করে রাসূল সাঃ , হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.) এর নাম সহ প্রচলিত ছয়টি জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি বাতিল করে দেন[389]। এরপর ত্রিশ বছর বন্ধ থাকার পর ফাতিমী শিয়া খলিফা আমির বি-আহকা-মিল্লাহ পুনরায় এই প্রথা চালু করেন। আর তখন থেকেই জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি চালু হয়ে এখনও চলছে।[390]

জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালনে আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিজাতীয় রীতি যা মুসলমানদের জন্য পরিত্যাজ্য। মুসলমানদের জন্য এটা জায়েয নয়। নবী কারীম সাঃ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে, কেয়মতের দিন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[391] রাসূলে কারীম সাঃ অন্যত্র ইরশাদ করেন, আমার পর আমার শরীআ'তের মধ্যে যে সমস্ত

---

[388] ফাতাওয়ায়ে নাযিরিয়্যাহ: ১/১৯৯ পৃষ্ঠা।

[389] আহসানুল কালাম ফী মা য়াতাআল্লাকু বিস সুন্নাতি ওয়াল বিদআতী মিনাল আহকাম: ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা বরাতে লিখিত তাম্বিহু উলিল আবসারি ইলা কামালুদ্দিন, ওয়ামা ফিল বিদয়ি মিনাল আখতার: ২৩০ পৃষ্ঠা (ড. সালেহ আস সুহায়মী)

[390] প্রাগুক্ত ২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা।

[391] আবু দাউদ, হা. ৮০৩১, মিশকাত, হা. ৪৩৪৭।

নতুন কাজকর্ম আরম্ভ হবে, আমি তা হতে সম্পর্কহীন এবং ঐ সকল কাজকর্ম পরিত্যাজ্য ও ভ্রষ্ট।[392]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।[393]

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, আমাদের সমাজে যে জন্ম দিবস বা জন্মদিন পালন করা হয় তা প্রকৃত অর্থে জন্ম দিবস নয়। তা হচ্ছে জন্ম বার্ষিকী বা জন্ম তারিখ, যা বছরান্তে একবার আসে। নবী কারীম সা্ঃ এর জন্ম হয়েছে সোমবার। তাই তিনি প্রতি সোমবার বরকতের জন্য রোযা রাখতেন। এই প্রসঙ্গে একটি হাদীসে আছেঃ অর্থাৎ হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সা্ঃ এর নিকট আরয করা হলো, তিনি প্রতি সোমবার রোযা রাখেন কেন? জবাবে তিনি ইরশাদ করেনঃ এই দিনে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, এই দিনেই আমি প্রেরিত হয়েছি এবং এই দিনেই আমার উপর পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে।[394]

আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী থেকে হেফাযত করুন! কুরআন-হাদীস জেনে-বুঝে এবং হক্কানী উলামায়ে কেরামগণের সাথে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের বা তা থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন! আমীন!

---

[392] বুখারী, হা. ২৬৯৭, মুসলিম, হা. ৪৩৮৪।

[393] সুরা মায়েদা: আয়াত ২।

[394] মুসলিম: ২/৮১৯, আহসানুল কুবরা: ৪/২৮৬ (বায়হাক্বী)।

উল্লেখ্য; ১১ রবিউস সানীতে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর জন্মকে কেন্দ্র করে যে ফাতেহা ইয়াযদাহম পালন করা হয়, সরেজমিনে তথা এর বাস্তবতা তালাশ করার পর ইতিহাস থেকে ফুটে উঠে যে, **১১** রবিউস সানীতে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর মৃত্যু দিবস প্রমাণিত নয়। কেননা ইতিহাসবিদদের মাঝে এ নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও ইতিহাস ও যুক্তির বিচারে **১০** রবিউস সানী প্রাধান্য পাওয়ার হকদার।[395]

মূলত ইসলামে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও উরস করা শরী'আত সমর্থিত অনুষ্ঠান নয়। তবে আব্দুল কাদের জিলানী রহ. অনেক উঁচু পর্যায়ের একজন ওলী ও বুযুর্গ ছিলেন। তাই এই নির্দিষ্ট তারিখের অনুসরণ না করে অন্য যে কোন দিন তাঁর জন্য দু'আ করলে এবং জায়িয তরীকায় তাঁর জন্য ঈসালে সওয়াব করলে তাঁর রূহানী ফয়েজ ও বরকত লাভের ওসীলা হবে এবং তা সওয়াবের কাজ হবে। নিম্নে **সংক্ষিপ্তভাবে এর বিবরণ দেয়া হলোঃ**

কবর জিয়ারত করা সুন্নত। এটি হৃদয়কে বিগলিত করে। নয়নযুগলকে করে অশ্রুসিক্ত। স্মরণ করিয়ে দেয় মৃত্যু ও আখিরাতের কথা। ফলে এর দ্বারা অন্যায় থেকে তওবা এবং নেকির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় পরকালীন মুক্তির প্রেরণা। শুধু এসব উদ্দেশ্যেই শরিয়তে কবর জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নতুবা ইসলামের সূচনালগ্নে কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। রাসুল সা্ঃ ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পূর্বে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে তোমরা কবর জিয়ারত করো।

---

[395] ফতোয়ায়ে রহীমিয়া: ২/৭৬,৭৭।

কেননা তা দুনিয়াবিমুখতা এনে দেয় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[396]

কবরের সামনে যাওয়ার পর আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হবে হুজুরে আকরাম সাঃ **এর ন্যায় নিচের যে কোন একটি দো‘আ পাঠ করা:**

- **السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر**[397]
- **السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية**[398]
- **السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد**[399]
- **السَّلامُ عليْكم أَهلَ الدِّيارِ منَ المؤمنينَ والمسلمينَ وإنَّا إن شاءَ اللَّهُ بِكم لاحِقونَ أنتم لنا فرَطٌ ونحنُ لَكم تبَعٌ أسألُ اللَّهَ العافيةَ لنا ولكم**[400]
- **السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ**[401]

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুল সাঃ একটি কবর জিয়ারতে যান এবং বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম দারা ক্বাওমিম মুমিনিন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লা-হিকুন।[402]

---

[396] তিরমিজি, হা. ১০৫৪, ইবনে মাজাহ, হা. ১৫৭১, আহমাদ, হা. ৪৩০৭, মিশকাত, হা. ১৭৬৯।

[397] তিরমিজি, হা. ১০৫৩, মিশকাত, হা. ১৭৬৫।

[398] মুসলিম, হা. ২১৪৭, ই.ফা. হা. ২১২৬।

[399] মুসলিম, হা. ২১৪৫, ই.ফা. হা. ২১২৭।

[400] নাসাঈ, হা. ২০৩৭।

[401] মুসলিম, হা. ২১৪৬।

[402] মুসলিম, হা. ২৪৯।

কবর জিয়ারতের পদ্ধতি : কবরের সামনে গিয়ে উপরোক্ত যে কোন একটি দো'আ পড়বে। এরপর ফযীলতপূর্ণ কিছু দু'আ রয়েছে, ইছালে সাওয়াবের (সাওয়াব পৌছার) নিয়তে সেগুলো থেকে পাঠ করবে।

যেমন:

- সুরা ফাতিহা: ৩ বার পড়লে দুইবার কোরআন খতমের সওয়াব অর্জিত হয়।[403]
- সুরা ইখলাস: ৩ বার পড়লে একবার কোরআন খতমের সওয়াব অর্জিত হয়।[404]
- সুরা ইয়াসিন: ১ বার পড়লে দশ খতম কোরআন এর সওয়াব অর্জিত হয়।[405]
- সুরা কাফিরুন: ৪ বার পড়লে এক খতম কোরআনের সওয়াব অর্জিত হয়।[406]
- সুরা যিলযাল: ২ বার পড়লে এক খতম কেরাআনের সওয়াব অর্জিত হয়।[407]
- সুরা ক্বদর: ৪ বার পড়লে এক খতম কোরআনের সওয়াব অর্জিত হয়।[408]

---

403 তাফসীরে মাযহারী: ১/১৫, সূরা ফাতেহা ৭ নং আয়াত দ্র:।

404 বুখারী: ২/৬৫০, দারুল হাদীস ঢাকা, হা. ৫০১৫, ই.ফা. হা. ৪৬৪৬, তিরমিজি, হা. ২৮৯৫।

405 তিরমিজি: ২/১১৬, দারুল হাদীস ঢাকা, হা. ২৮৮৭।

406 তিরমিজি: ২/১১৭, দারুল হাদীস, হা. ২৮৯৪।

407 তিরমিজি: ২/১১৭, দারুল হাদীস, হা. ২৮৯৪।

408 তাফসীরে দুররে মানসুর: ৬/৬৮০। সূরা কদর ১নং আয়াত দ্র:।

- আয়তুল কুরসী: ৪ বার পড়লে এক খতম কোরআনের সওয়াব অর্জিত হয়।[409]
- সুরা নসর: ৪ বার পড়লে এক খতম কোরআনের সওয়াব অর্জিত হয়।[410]
- সুরা আদিয়াত: ২ বার পড়লে এক খতম কোরআনের সওয়াব অর্জিত হয়।[411]

স্মরণ রাখা উচিত যে, উল্লিখিত আমলগুলো করার জন্য কবরের সামনে যাওয়া জরুরী নয়। যে কোন স্থান থেকেই ইছালে সাওয়াবের নিয়তে পাঠ করলেই যথেষ্ট হবে। কবরের সামনে যাওয়ার দ্বারা কবরের স্মরণ হয় এটাই মূল মুখ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের অনেকের ধারণা যে, কবর যিয়ারতের জন্য স্ব-শরীরে উপস্থিত হতে হয় এটিও ভুল ধারণা।

জুম‘আর দিন কবর জিয়ারত : রাসুল সা্ঃ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতি জুম‘আয় তার মা-বাবা বা তাদের একজনের কবর জিয়ারত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহারকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে।[412]

সাওয়াব রেসানীর ভুল পদ্ধতিসমূহ:

সাওয়াব রেসানীর নামে বর্তমানে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার যে প্রথা চালু হয়েছে, শরী’আতে এর কোন ভিত্তি নেই। জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী এসব

---

[409] তাফসীরে মাযহারী: ২/৩১, সূরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াত দ্র:।

[410] তিরমিজি: ২/১১৭, দারুল হাদিস, হা. ২৮৯৫।

[411] তাফসীরে দুররে মানসুর: ৬/৬৯৫, সূরা আদিয়াত ১নং আয়াত দ্র:।

[412] আল মুজামুল আউসাত: ৬/১৭৫ পৃ., হা. ৬১১৪।

ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। মূর্খতার দরুন এসব বিদ'আত ও বদ রসম মুসলমানগণ ভাল কাজ মনে করে চালু করে দিয়েছেন, অথচ এগুলো মারাত্মক গুনাহ। অনেকের এ ধরনের গুনাহ থেকে তওবা নসীব হয় না। সুতরাং এগুলো অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য। সারা বছর বাবা-মায়ের জন্য সাওয়াব রেসানী করতে থাকবে। একদিন যদি একটু বেশী করতে মনে চায় তা করবে, কিন্তু সেটা ঠিক মৃত্যুর তারিখে করবে না। অন্য যে কোন দিন করবে এবং জরুরী মনে করবে না।[413]

জুমাদাল উলা মাস

হিজরী সনের পঞ্চম মাস জুমাদাল উলা। রবিউস সানী মাসের মত এই মাসেও নির্ধারিত বিশেষ কোন আমল কুরআন সুন্নাহে পাওয়া যায় না। তবে কোন মুসলমান কখনও আমল থেকে বিমুখ হতে পারে না। মুমিনের প্রতিটি মুহূর্তই আমলে অতিবাহিত হয়। নির্ধারিত আমল না থাকলেও দৈনন্দিনের নিয়মিত আমলগুলো করা যায়।

জুমাদাল উখরা মাস

হিজরী সনের ষষ্ঠ মাস জুমাদাল উখরা। জুমাদাল উলা মাসের মত এই মাসেও নির্ধারিত বিশেষ কোন আমল কুরআন সুন্নাহের কোথাও উল্লেখ নেই। তবে বাস্তবতা হলো, কোন মুসলমান কখনও আমল থেকে বিমুখ হতে পারেনা। তাঁর প্রতিটি মুহূর্তই আমলে (আল্লাহর স্মরণে) অতিবাহিত হয়। এজন্য নির্ধারিত আমল না থাকলেও দৈনন্দিনের নিয়মিত আমলগুলো করা যায়। তবে যেহেতু বইটি আমল কেন্দ্রিক লিখা হয়েছে। এবং এতে কিছু কিছু স্থানে আমলের রেফারেন্স হিসেবে জয়ীফ হাদীসের উল্লেখ করা

[413] ইসলামী জিন্দেগী (মুফতী মনসুরুল হক)।

হয়েছে। এজন্য এ মাসের আলোচনায় জয়ীফ হাদিস প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনা করার ইচ্ছা করেছি।

হাদীস সহীহ বা জয়ীফ হওয়া এটি উলুমে হাদীসের একটি পরিভাষা। হাদিসের এই পরিভাষার প্রচলন মুহাদ্দিসিনে কেরামের যুগ থেকেই প্রচলিত। তবে এর ব্যাখ্যার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

জয়ীফ হাদীসের সংজ্ঞা: هو مالم يجمع فيه صفة الحسن بفقد شرط من شروطه[414]

জয়ীফ হাদীস বলা হয়: যে হাদীস বর্ণনাকারীর মাঝে হাসান হাদীস বর্ণনাকারীর শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে (তথা বর্ণনাকারীর যাবতের গুনে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে) তাকে জয়ীফ হাদীস বলে।[415]

উল্লেখিত সংজ্ঞা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, রাসূল সা্ঃ এর হাদীস কখনও জয়ীফ হয় না। বরং হাদীস বর্ণনাকারীর দোষত্রুটির কারণে হাদীসের মধ্যে জুউফ তথা হাদীসের দুর্বলতার প্রসঙ্গ আসে।

জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার হুকুম কী ?

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর ভাইয়েরা জয়ীফ হাদীস শুনলেই সেটাকে পরিত্যক্ত, পরিত্যাজ্য ও আমলযোগ্যহীন মনে করে থাকেন এবং কি কিছু নামধারী আহলে হাদীস শায়েখ যাদের কুরআন তিলাওয়াত পর্যন্ত শুদ্ধ নয়। যা নামাজের জন্য উল্লেখযোগ্য শর্ত। এমন ব্যক্তিরাও জয়ীফ হাদীস সম্পর্কে

[414] তাইসীরু মুসতালাহুল হাদীস: ৬৩ পৃ.।

[415] আদাবুল মুফরাদ: ১/৭ পথিক প্রকাশনী।

মানুষকে ভুল মেসেজ দিয়ে থাকে। এজন্য এবিষয়ে বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ইসলামিক স্কলাররা কি বলেন? তা আমরা জানার চেষ্টা করবো।

আমলের ফযীলত বিষয়ে জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য- এটি মুহাদ্দিসগণের একটি স্বীকৃত কথা। তবে এর জন্য কিছু মৌলিক শর্ত রয়েছে। অন্মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হল, বর্ণনাটি মাতরুক বা মুনকার পর্যায়ের না হতে হবে। তাই ব্যাপকভাবে যে কোনো জয়ীফ হাদীসই আমলযোগ্য বলাও ঠিক নয়।

জয়ীফ হাদীস প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসীনে কেরামদের অভিমতঃ

❖প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (মালেকী) রহ. (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) তাঁর "জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী" তে উল্লেখ করেন,

وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُونَ فِي الْفَضَائِلِ فَيَرْوُونَهَا عَنْ كُلٍّ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُونَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ.

আহলে হাদীস তথা মুহাদ্দেসীনে কেরাম ফাজায়েলের ক্ষেত্রে সনদে নম্রতা প্রদর্শন করতেন আর তা বর্ণনা করতেন, আর আহকামের ক্ষেত্রে সনদে কাঠিন্যতা প্রদর্শন করতেন।[416]

❖ আল্লামা ইমাম নববী (শাফেয়ী) রহ. (মৃত্যু ৬৭৬হি.) তাঁর "আল আযকার" কিতাবে উল্লেখ করেন,

قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاءوغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب - والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا

---

[416] জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়াফাদলিহী: ১/২০৩ (ইবনে আব্দুল বার) দারু ইবনে জাওযী

মুহাদ্দিস, ফকীহ ও অন্যান্য আলেমগণের মতে, নিম্ন পর্যায়ের জয়ীফ অথবা মওযু (মানুষের বানানো হাদীস) ব্যতীত ফাজায়েল, ভীতি প্রদর্শন, উৎসাহ ও নসিহত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা মুস্তাহাব।[417]

❖ ইমাম নববী তাঁর ‘‘আল মাজমু শরহুল মুহাযযাবে’’ উল্লেখ করেন,

-قد قدمنا اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ دُونَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামগণ হালাল-হারাম ব্যতীত ফাজায়েলে আমলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের উপর আমলের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[418]

❖হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (শাফেয়ী) রহ. (৮৫২ হি.) বলেন, (বক্তব্যটি আল্লামা সাখাবী রহ. তাঁর কিতাব ‘‘আলক্বাওলুল বাদীতে’’ উল্লেখ করেছেন) জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার জন্য শর্ত হল,

أ– أن يكون الضعف غير شديد

. ب – أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به

ج – ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

ক. হাদীসটি অতিমাত্রায় দুর্বল হতে পারবে না। তথা সনদের দুর্বলতা বেশি না হতে হবে।

এটি সর্বসম্মত বিষয়। সুতরাং জয়ীফ হাদীসের শ্রেণী থেকে ঐ বর্ণনা বের হয়ে যাবে, যার মধ্যে কোনো রাবী মিথ্যুক রয়েছে বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কিংবা তিনি বেশি ভুল করেন।

---

[417] আল আযকার: ১/৪৭ (নববী) দারু ইবনে কাসীর বৈরুত, ১/৮ ফারুল ফিকর বৈরুত।

[418] আল মাজমু’ শরহুল মুহাযযাব: (নববী) ৩/২৪৮ দারুল ফিকর বৈরুত।

খ. হাদীসটি আমল উপযোগী হবে এবং শরীয়তের বিধান ও মূলনীতির পরিপন্থী হতে পারবে না। তথা ঐ হাদীসের উপর আমল করাটা শরীয়তের কোনো না কোনো মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

গ. হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, বরং সতর্কতার সাথে তাঁর উপর আমল করতে হবে।[419] তথা রাসূলুল্লাহ সা: থেকে এটি সুপ্রমাণিত এমন আকীদা পোষণ না করে আমল করতে হবে।[420]

❖আল্লামা ইবনুল হুমাম (হানাফী) রহ. (৮৬১ হি.) তাঁর ‘‘ফাতহুল ক্বাদীরে’’ উল্লেখ করেন,

فَالضَّعِيفُ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ يُعْمَلُ بِهِ فِيفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ-

বর্ণিত হাদীস যদি জয়ীফ হয়, এবং মওযু পর্যায়ের না হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ফাজায়েলে আমলের ক্ষেত্রে তার উপর আমল করা যাবে।[421]

❖আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী (শাফেয়ী) রহ. (৯০২ হি.) তাঁর ‘‘আল মাক্বাসিদুল হাসানায়’’ উল্লেখ করেন,

قَالَ ابْنُ عبد البر: إِنَّهُمْ يَتَسَاهَلُوْنَ فِيالحديثِ إِذَا كان من فضائلِ الأعمالِ-

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) বলেছেন, যদি হাদীস ফাজায়েলে আমলের ব্যাপারে হতো, তবে মুহাদ্দেসীন কেরাম তার সনদের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করতেন।[422]

---

[419] তাইসিরু মুস্তালাহিল হাদীস: (মাহমুদ ত্বহহান)।

[420] আলকওলুল বাদী: ১৯৫ পৃ., হাফেজ ইবনে হজর রহ. এর উক্ত ৩শর্ত হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ‘‘দুরারুল হুক্কাম: ১/১২ তে ও একি বক্তব্য পাওয়া যায়।

[421] ফাতহুল ক্বদীর: (ইবনুল হুমাম) ১/৩৪৯, দারুল ফিকর বৈরুত ।

[422] মাক্বাসিদুল হাসানাহ: (সাখাবী) ১/৬৩৫, দারুল কিতাবিল আরাবী বৈরুত।

❖ হাফেজুল হাদীস আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (শাফেয়ী) রহ. (৯১১ হিঃ) তাঁর তাদরীবুর রাবীতে উল্লেখ করেন,

وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث وَغَيْرِهِمُ التّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيد الضّعِيفَة وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ - مِنَ الضّعِيف وَالْعَمَلُ بِه مِنْ غَيْربَيَانِ ضَعْفِه فِي غَيْرِ صِفَات اللّه تَعَالَى، وَمَا يَجُوزُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْه، وَتَفْسِيرُ كَلَامِه، وَالْأَحْكَام كَالْحَلَال وَالْحَرَام، وَغَيْرِهِمَا، وَذَلِكَ كَالْقَصَص وَفَضَائِل الْأَعْمَال وَالْمَوَاعِظ، وَغَيْرِهَا مِمّا لَا تَعَلّقَ لَهُ بِالْعَقَائِد وَالْأَحْكَامِ وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ: ابْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَهْدِيّ، وَابْنُ الْمُبَارَك، قَالُوا: إِذَا رُوِّينَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَدّدْنَا، وَإِذَا رُوِّينَا فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا

আহলে হাদীস তথা মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট জয়ীফ সনদের ক্ষেত্রে তখন নিরব থাকা বৈধ, যখন বর্ণনাটি মওযু (বানোয়াট) হবে না, তার দূর্বলতাকে ঢেকে অথবা বর্ণনা করে তার উপর আমল করা যাবে। তবে আল্লাহর জাত ও সিফাত সংক্রান্ত বর্ণনা ব্যতীত, আহকাম হালাল-হারাম সংক্রান্ত বর্ণনায় নরম বা নিশ্চুপ থাকা যাবে না। এমনিভাবে ফাজায়েলে আমল, ওয়াজ নসিহত, ভীতি ও উৎসাহ এবং কাহিনী ইত্যাদি ক্ষেত্রে আকাঈদ ও আহকাম ব্যতীত জয়ীফ হাদীস গ্রহণ বৈধ। যে ইমামগণ এ মতপোষণ করেন তাদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইবনে মাহদী ও ইবনে মুবারক (রহঃ) উল্লেখ্য। তাঁরা বলেন যে, যখন আমরা হালাল-হারাম সংক্রান্ত কোন বর্ণনা পাই, তার সনদ বাছাইয়ে কাঠিন্যতা অবলম্বন করি। আর ফাজায়েল ও অন্যান্য বর্ণনার ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করি।[423]

❖ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (হানাফী) রহ. (১০১৪ হি.) "আল আসরারুল মারফুআ ফীল আখবারিল মউজুআতে" উল্লেখ করেন,

أَنّ الْحَدِيثَ الضّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتّفَاقًا

[423] তাদরীবুর রাবী: (সুয়ূতী) ১/৩৫০,৩৫১, দারুত ত্বয়্যিবাহ।

সকলেই একমত যে জয়ীফ হাদীস ফযীলত অর্জন করার জন্য আমল করা জায়েজ আছে।[424]

❖আল্লামা হাসকাফী (হানাফী) রাহ. (১২৫২হি.) জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার উক্ত শর্তসমূহ উল্লেখ করার পর বলেন, মউযু তথা জাল হাদীসের উপর তো কোনো অবস্থাতেই আমল করা জায়েয নয়।[425]

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, হাদীস দূর্বল হলেই তা পরিত্যক্ত এমন ধারণা সঠিক নয়। বরং আমলের ক্ষেত্রে (শর্তসাপেক্ষে) দূর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যায়।

রজব মাস

হিজরী সনের সপ্তম মাস রজব। রজব মাস যা হারাম বা পবিত্র মাস সমূহের মধ্যে একটি।

আল্লাহ তা'আলা বারো মাসের মধ্যে চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' তথা সম্মানিত মাস বলে ঘোষণা করেছেন। যার মধ্যে রজবও অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামুল্লাতে এরশাদ করেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ و قاتلو المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين

---

[424] আল আসরারুল মারফুআহ ফীল আখবারিল মাউজুআহ: ১০৫ পৃ. (মোল্লা আলী কারী) (প্রসিদ্ধ আল মউজুআতুল কুবরা)।

[425] আদ্দুররুল মুখতার: (আলা উদ্দীন হাসকাফী) ১/১২৮।

আসমান-জমিনের সৃষ্টি ও সূচনা লগ্ন হতেই আল্লাহর বিধান মতে মাসের নিশ্চিত সংখ্যা বারটি। তার মাঝে চারটি সম্মানিত। এ অমোঘ ও শাশ্বত বিধান; সুতরাং এর মাঝে তোমরা (অত্যাচার-পাপাচারে লিপ্ত হয়ে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করো না। তোমরা সম্মিলিতভাবে মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হও, যেভাবে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।[426]

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা্ঃ বলেছেন-

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السما وات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان.

রাসূল সা্ঃ বলেন, জমানা কাল-চক্রাকারে ঘুরে আসমান-জমিন সৃষ্টির প্রথম দিনের অবস্থায় ফিরে এসেছে। বারো মাসে বৎসর, তার ভেতর চারটি সম্মানিত। তিনটি একসাথে-জুলক্বদাহ, জুলহিজ্জাহ, মুহররম। অপরটি-মুদার সম্প্রদায়ের পঞ্জিকা মতে-জুমাদা ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব।[427]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহঃ তাঁর "লাতায়িফুল মা'আরিফে" বলেন, আবু বাকর আল ওয়াররাক অল বালখী রহ. বলেছেন, রজব মাস হলো বীজ বপনের মাস, শা'বান মাস হল ক্ষেতে সেচ প্রদানের মাস এবং রামাদান মাস হল ফসল তোলার মাস। তিনি আরও বলেছেন: রজব মাসের উদাহরণ হলো বাতাসের ন্যায়, শা'বান মাসের উদাহরণ মেঘের ন্যায়, রামাদান মাসের উদাহরণ বৃষ্টির ন্যায়, তাই যে রজব মাসে বীজ বপন

---

[426] সূরা তাওবাহ: আয়াত ৩৬।

[427] বুখারি, হা. ৪৬৬২, মুসলিম, হা. ১৬৭৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৬৬৪ পৃ., সূরা তাওবাহ: আয়াত ৩৬।

করলো না, শা'বান মাসে সেচ প্রদান করলো না, সে কিভাবে রামাদান মাসে ফসল তুলতে চাইতে পারে?[428]

প্রিয় নবী সা্ঃ রজব মাস থেকেই মাহে রমজানের প্রস্তুতি নিতেন। রজব ও শাবান মাসে অধিক সময় নফল রোজা ও ইবাদতে কাটাতেন । তাই আমাদেরও কর্তব্য তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করে রজবের হক আদায় করা। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

রজব মাসকে হারাম নামে নামকরণের কারণ:

কারণ, তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তবে, শত্রু প্রথমে আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করা বৈধ। এ কারণেই তাকে বলা হত বোধির রজব-তাতে হাঁক দেয়া হত না যোদ্ধাদের সমবেত হওয়ার জন্য। কিংবা তাতে শোনা যেত না অস্ত্রের ঝংকার। কিংবা তাকে হারাম বলা হয় এ কারণে যে, অন্যান্য মাসের নিষিদ্ধ কর্মের তুলনায় এ মাসের নিষিদ্ধ কর্ম অধিক দোষণীয়। রজব মাসকে রজব বলা হয়, কারণ তা সম্মানিত। الترجيبমানে সম্মান জ্ঞাপন করা। শব্দটি এখান থেকেই উদ্ভূত।[429]

রজব মাসের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সা্ঃ আমাদেরকে যেভাবে যতটুকু আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন, যা আমরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানতে পারি ততটুকুই আমাদের করতে হবে, এই ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু বাড়ানো বা কমানো যাবে না।

---

[428] লাতায়িফুল মা'আরিফ: ২৩৪ পৃ. (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫) দারু ইবনু কাসীর।

[429] লাতায়িফুল মা'আরিফ: ২২৫ পৃ. (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫) দারু ইবনু কাসীর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ "এতে (সম্মানিত মাস গুলোতে) তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার (ক্ষতিসাধন) করো না।"[430]

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এ মাসগুলোকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন, তাই এর সম্মান যথাযথ রক্ষা করা। এর মর্যাদা ও পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য করত: এতে কোন গুনাহে লিপ্ত না হওয়া। তদুপরি এ মাসের পবিত্রতা ঘোষণার কারণে, এ মাসে অপরাধও জঘন্য ও মারাত্মক হয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে বিশেষ করে এ মাসে নিজেদের উপর জুলুম না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর গোনাহ করা মানেই শাস্তির হকদার হবার মাধ্যমে নিজের উপর জুলম করা। যদিও স্বীয় নফসের উপর জুলুম করা বা অন্য কোন গুনাহে জড়িত হওয়া, সব মাসেই হারাম ও নিষিদ্ধ।

করণীয় আমল:

কুরআন, সুন্নাহে রজব মাসের আমল তালাশ করলে দু'টি আমলের কথা পাওয়া যায়;

১- রজবে প্রবেশের দুআ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ যখন রজব মাসে উপনীত হতেন, তখন এই দোয়া পাঠ করতেন[431]

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان

---

[430] সূরা তাওবা: আয়াত ৩৬।

[431] মুসনাদে আহমাদ, হা. ২৩৪৬, মুসনাদে বাযযার, হা. ৬৪৯৪, শুআবুল ঈমান, হা. ৩৫৩৪ (বায়হাকী),
আল আওসাত, হা. ৩৯৩৯ (তাবরানী)। আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হা.৬৫৯।

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফী রাজাবা ওয়া শাবান, ওয়াবাল্লিগনা রামাদান।

অর্থঃ হে আল্লাহ আপনি রজব ও শাবানে বরকত দান করুন, এবং আমাদের (হায়াতকে বৃদ্ধি করে) রমাদ্বানে পৌঁছে দিন।

যেহেতু এই দুআর অর্থও সুন্দর, এই জন্য রজব মাস আরম্ভ হলে কেউ চাইলে উক্ত দুআ পড়তে পারেন তবে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

ইমাম ইবনে মাঈন, ইবনে হজর, ইমাম দারা কুতনী, ইমাম নববী, ইবনে রজব ও আহমদ শাকের রহঃ প্রমূখগণ উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[432] যেহেতু দূর্বল হাদীস ফাযায়েল ও আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। যা আমরা ইতোপূর্বে জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য কি না? শিরোনামে আলোচনা করে এসেছি।

২- রজবের প্রথম রাতে দুআ কবুল হয়: হাদীস শরীফে রজবের প্রথম রাতে দুআ কবুল হওয়ার সুসংবাদ এসেছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘পাঁচটি রাত এমন আছে, যেগুলোতে বান্দার দুআ আল্লাহ তা’আলা ফিরিয়ে দেন না, অর্থাৎ অবশ্যই কবুল করেন। রাতগুলো হলো—জুমু‘আর রাত, রজবের প্রথম রাত, শাবানের পনের তারিখের রাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার রাত।[433] (এই দুআর বিস্তারিত হুকুম বাৎসরিক আমলের মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ)।

---

[432] আল আযকার: পৃ.২৭৪ (নববী), মিযানুল ইতিদাল: ৩/৯৬ (যাহাবী), আল ফতুহাতুর রাব্বানিয়া: ৪/৩৩৫, মুসনাদ আহমদ: ৪/১০০, হা. ২৩৪৬ (আহমদ শাকের), মুনতাদাত তাখরীজ ওয়া দিরাসাতুল আসানীদ: ৩৩/২৫০ (মাকতাবাতুশ শামেলাহ)।

[433] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হা. ৭৯২৭।

বর্জনীয় আমল:

বাজারের অনির্ভরযোগ্য বই-পুস্তকে রজব মাসকে কেন্দ্র করে বিশেষ পদ্ধতিতে নামায ও রোযা এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক আমলের কথা পাওয়া যায়। এ সবই ভিত্তিহীন। এ ধরনের মনগড়া আমল দ্বারা এ মাসের ফযীলত লাভ করা সম্ভব নয়। বরং রজব মাসের বারাকাত ও ফযীলত হাসিল করার জন্য অন্যান্য মাসের ন্যায় পালনীয় ফরয ইবাদতগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে এবং নফল ইবাদত বেশি বেশি করতে হবে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন-সুন্নাহে এ মাসের জন্য বিশেষ কোনো নামায, বিশেষ কোনো রোযা বা বিশেষ পদ্ধতির কোনো আমলের হুকুম দেওয়া হয়নি। তাই এ ধরনের মনগড়া আমলগুলো থেকে বেঁচে থাকা চাই।

রজব মাসকে কেন্দ্র করে কতিপয় নতুন আবিষ্কৃত আমল বিদ‘আত:

যেমন: নামায আদায় করা, রোযা রাখা, ওমরা করা, যাকাত দেওয়া, আতিরা জবাই করা।

১. সালাতুর রাগায়েব আদায় করাঃ

রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতকে লাইলাতুর রাগায়েব নামে চিহ্নিত করা হয়। এবং এই রাতের বিশেষ পদ্ধতির নামাযকে সালাতুর রাগায়েব নামে অভিহিত করা হয়।

পর্যালোচনা

“১২ চাঁন্দের আমল”[434] সহ কিছু বইতে আসছে, রজব মাসের প্রথম জুম‘আয় মাগরিবের নামাজের পর সাতটি সালামের মাধ্যমে বার রাকাত নামায আদায় করা। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠের পর সূরা কদর

---

[434] ১২ চাঁন্দের আমল: ২০-২১।

তিনবার পাঠ করবে এবং সূরা ইখলাস পাঠ করবে ১২ বার। নামাজ হতে ফারেগ হবার পর ৭০ বার দরূদ পাঠ করবে, এরপর ইচ্ছামত দু'আ করবে ।

আল্লামা ইবনে রজব রহ. তাঁর "লাতায়িফুল মা'আরিফে"[435] বলেন, রজব মাসের সাথে বিশেষ কোন নামাযের সম্পর্ক নেই। সালাতুর রাগায়েবের ফযীলত সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীস মিথ্যা, ভ্রান্তিতাপ্রসূত-যা কোন ভাবেই শুদ্ধ হতে পারে না।[436] অধিকাংশ আলেমের সক্রিয় মতানুসারে এ নামায বেদ'আত।

হিজরির ৪ শতকের পরে এ সালাতের অস্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাই আমরা দেখতে পাই, প্রথম যুগের আলেমগণ এ ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করেননি। একে পরিত্যাগ করা, এর থেকে বিরত থাকা এবং এর সম্পাদনকারীকে নিষেধ করা কর্তব্য। কারণ, ইসলাম কোন বানানো ইবাদতকে বৈধতা দেয় না।[437]

ইমাম আজম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ., লাইস রহ. প্রমূখদের মতে সালাতুর রাগায়েব বেদ'আত। হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীস জাল, বানোয়াট।[438]

---

[435] লাতায়িফুল মা'আরিফ: ২৮৫ পৃ., (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫ হি.) দারু ইবনু খুযাইমা।

[436] লাতায়িফুল মা'আরিফ: ১৬৫ পৃ., (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫ হি.) দারু ইবনু কাসীর।

[437] লাতায়িফুল মা'আরিফ: ২২৮ পৃ., (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫ হি.) দারু ইবনু খুযাইমা।

[438] আল মউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ: ২২/২৬২, রদ্দুল মুহতার: ২/২৬, আল মাদখাল: (ইবনুল হাজ আল মালেকী) ১/২৯৪, আল ফতোয়াল কুবরা: ২/২৩৯, ২৬২, মা-সাবাতা বিস সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সানাহ: ১৮০ পৃ.।

আল্লামা ইমাম নববী রহ. তাঁর "আল মাজমু"তে[439] উল্লেখ করেন যে, আলেমগন এর মাধ্যমে নামাযের কারাহাত প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এর উদ্ভাবক ও উদযাপককে ধ্বংস করুন। এ নিশ্চই এটি বিদ'আত, সুতরাং, সর্বার্থে বর্জনীয়। তা নিশ্চয় পথভ্রষ্টতা, মূর্খতা যা পালন করা বাতিল। আলেমদের একটি বৃহৎ শ্রেণি একে ভ্রান্ত প্রমাণ করে নানা গ্রন্থ সংকলন করেছেন, এ নামায আদায়কারীকে পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

২. রোজা রাখাঃ

আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মাঝে প্রচলিত আছে যে, রজব মাসে রোজা রাখতে হবে। ২৭ এ রজবে রোজা রাখা তারা অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ মনে করে থাকেন। এমনকি অনেকের মধ্যে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, এই একটি রোজার ফযীলত এক হাজার রোজার সমান। এজন্য তাকে হাজারি রোজা বলে অভিহিত করা হয়।

পর্যালোচনা

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তাঁর "লাতায়িফুল মা'আরিফে"[440] বলেন, রাসূলুল্লাহ স্াঃ এবং তার সাহাবাদের থেকে রজব মাসের রোজার ফযিলতের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোন দলীল নেই। (টিকা: ফাযায়েলুল আওকাতে[441] আবু কিলাবা হতে বর্ণিত রজবের রোজা বিষয় বর্ণনাটি আপত্তিমুক্ত নয়। আবু কেলাবা থেকে যদিও এই মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু অনেকগুলো সমস্যার কারণে তার বর্ণনাটি আমলের পর্যায়র্ভুক্ত নয়।)

---

[439] আল মাজমু শরহুল মুহাযযাব: ৩/৫৪৮।

[440] লাতায়িফুল মা'আরিফ: ২৮৬--২৮৯ পৃ.(ইবনে রজব হাম্বলী) দারু ইবনু খুযাইমা।

[441] ফাযায়েলুল আওকাত: ২১ পৃ.।

ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন, আবু কেলাবা মুরব্বী তাবেয়ী। ওনার বর্ণনাটি সমস্যামুক্ত নয়। তবে (শুধু এই মাসের গুরুত্ব না দিয়ে) অন্যান্য মাসের মত এ মাসেও, রোজা রাখা বৈধ ও সুন্নত। হযরত ওমর (রাঃ) রজব মাসের রোজা রাখতে নিষেধ করতেন। কারণ, এতে ইসলাম-পূর্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহেলি যুগের সাথে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

তবে হারাম মাসগুলোতে রোজা রাখা মুস্তাহাব মর্মে হুজুর সা্ঃ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হুজুর সা্ঃ বলেন, "হারাম মাসগুলোতে রোজা রাখ; এবং রোজা ভঙ্গও কর"[442]
এ হাদীসটি যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে হারাম মাসে রোজা রাখা মুস্তাহাব প্রমাণ হবে। অতএব, যে ব্যক্তি এ হাদীসের ভিত্তিতে রজব মাসে রোজা রাখে এবং অন্য হারাম মাসেও রোজা রাখে এতে কোন অসুবিধা নেই।[443] তবে রজব মাসকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে রোজা রাখা যাবে না।

হাজেফ ইবনে হাজার, আল্লামা ইবনুল জাওযি, হাফেজ যাহাবি, তাহের পাটনি, আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রহ. প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ এ রোজার ফযীলতকে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলেছেন। [444]

৩. ওমরা করাঃ

[442] আবু দাউদ, হা. ২৪২৮।

[443] লাতায়িফুল মাআরিফ: ২৩০ পৃ. (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫) দারু ইবনু কাসীর।

[444] তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী ফাদলী রাজাব, মুকাদ্দামা: ১১পৃ., মাজমুউল ফতোয়া: (ইবনে তাইমিয়া) ২৫/২৯০পৃ., কিতাবুল মাওদুয়াত: (ইবনুল জাওযি) ২/২০৮, তালখিসুল মাওদুয়াত: ২০৯ পৃ.,তাজকিরাতুল মাওজুয়াত: পৃষ্ঠা১১৬, আল আসারুল মারুফা: ৫৮ পৃ., ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া: ৩/২৮১ পৃ. জামেয়া ফারুকিয়া করাচি, দারুল উলুম: ২/৪০২ হক্কানিয়া।

সুন্নী নামধারী বিদআতিদের মাঝে রজব মাস আসলে ওমরার ফযীলত সংক্রান্ত বেশ আলাপ-আলোচনা শুনা যায়।

পর্যালোচনা

সুন্নী নামধারী বিদ‘আতিদের মাঝে রজব মাসে ওমরা করার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব ও ফযিলতের আলাপ-আলোচনা হয়। অনেক গুরুত্বের সাথেই তারা এ মাসে ওমরা করে থাকেন।

নির্দিষ্টভাবে রজব মাসে ওমরা করা কিংবা এতে ওমরার বিশেষ ফযীলত আছে-বিশ্বাস করা বিদ‘আত। তা ছাড়া, বিষয়টিকে আয়েশা (রা.) সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। কেননা রাসূল সাঃ তাঁর জীবদ্দশায় মোট ১টি হজ্জ ও তিনটি ওমরা করেন। এর কোনটি রজব মাসে ছিলো না। তবে, কেউ যদি স্বাভাবিক নিয়মে (ফযিলতের বিশ্বাস বিহীন) রজব মাসে ওমরা করে, তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ, এ সময়েও তার জন্য ওমরা করার সুযোগ রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) রজব মাসে ওমরা করাকে মুস্তাহাব মনে করতেন।[445]

৪. যাকাত দেওয়াঃ আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, কেউ কেউ হযরত উসমান (রা.) থেকে একথা নকল করেছেন যে, রজব মাসে যাকাত দেওয়ার বিষয়টি হযরত উসমান (রা.) মিম্বরে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে কথা হলো, এর কোন ভিত্তি সুন্নাহ বা সলফ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

আর যাকাতের বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির সক্ষমতা অনুযায়ী বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর আদায় করতে হয়। অবশ্য জমহুরে ওলামাদের মত, সময়ের

---

[445] লাতায়িফুল মাআরিফ: ২৩২ (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫) দারু ইবনু কাসীর।

আগে কেউ যাকাত আদায় করে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। চাই তা যে মাসেই হোক না কেন?[446]

৫. রজব মাসের ২৭ তারিখ রজনী লাইলাতুল মিরাজ মনে করে জমায়েত হওয়া ও মাহফিল করাঃ

২৭ এ রজবের রাত আমাদের দেশের অত্যন্ত পরিচিত একটি রাত। সাধারণত সর্বসাধারণরা এই রাতটিকে শবে মিরাজের রাত্রি নামে চিনে থাকে। গুরুত্ত্ব সহকারে বিভিন্ন ধরনের আমলেও তারা লিপ্ত হয়।

পর্যালোচনা

নি:সন্দেহে মিরাজের রাত্রি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত একটি রাত। তবে এই রাতটি মূলত কোন তারিখের রাত ছিল, তা স্পষ্ট করে কুরআন হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই। এ রাতটিকে আমলের মাধ্যমেই কাটাতে হবে এ বিষয়েও কুরআন হাদীসে পাওয়া যায় না।

বাস্তব কথা হলো, মিরাজের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল রাসূল সা্ঃ এর হিজরতের এক বছর পূর্বে।[447] তাঁর জীবদ্দশায় বহুবার এই মিরাজের রাতটি অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু কোন আয়াত বা হাদীস কিংবা সাহাবাদের আমল, ইতিহাস দ্বারা কোথাও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, রাসূল সা্ঃ রাতটি আমলের মাধ্যমে উদযাপন করেছেন। তা ছাড়া মেরাজের রজনী কিংবা মেরাজের মাস নির্ধারণের ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য মত না থাকায় এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, সত্য অনুদ্ঘাটিত। তাই এ ক্ষেত্রে

[446] লাতায়িফুল মাআরিফ: ২৮৯ (ইবনে রজব হাম্বলী ৭৯৫) দারু ইবনু খুযাইমা।

[447] ফাতহুল বারী: ৭/২৫৪ (ইবনে হাজর) দারুস সালাম, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৩/২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ।

নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। মেরাজের রজনি নির্দিষ্ট করণের ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নি। যা বিদ্যমান আছে, সবই জাল, ভিত্তিহীন।[448]

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, যে কাজটি সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত না তা অবশ্যই বিদআত। কেননা যদি তা সওয়াবের কাজ হত তাহলে তারা অবশ্যই পালন করতেন। কারণ সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশি আমল পিপাসু ছিলেন।[449]

অতএব এ রাতে অতিরিক্ত ইবাদত ধার্য করা, যেমন রাত জেগে আমল করাকে বিশেষ সওয়াব মনে করা, দিনে রোজা রাখাকে বিশেষ সওয়াব মনে করা, অথবা আনন্দ, উল্লাস প্রকাশ করা, নারী-পুরুষ অবাধ মেলা-মেশা, গান-বাদ্যসহ মাহফিলের আয়োজন করা, যা অবৈধ, শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত ঈদেও না-জায়েজ-হারাম।

তবে **মেরাজের ঘটনা থেকে অর্জনের মতো আমাদের জন্য অনেক কিছুই রয়েছে:**

১- মেরাজের ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য এতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই।[450]

২- মেরাজের ঘটনাটি রাসূল সা: এর জাগ্রত অবস্থায় ও স্ব-শরীরেই হয়েছে।[451]

---

[448] আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ২/১০৭, মাজমুউল ফাতওয়া: ২৫/২৯৮।

[449] তাফসীরে ইবনে কাসীর: সূরা আহক্বাফ ১১নং আয়াত দ্র:, দারুস সালাম।

[450] সূরা বনী ইসরাইল: আয়াত ১, সূরা নাজম: আয়াত ৩-১৫।

[451] আকিদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত: ৭৯ পৃ. (আকমালুদ্দিন আল বাবিরতি ৭৮৬হি.) ওয়াযারাতুল আওকাফ কুয়েত।

৩- রাসূল সাঃ মেরাজে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করে তার উম্মতদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে এসেছেন, তাই প্রতিটি মুমিনের উচিত তার নির্দেশকে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সূচারুরূপে, ভালোবাসা ও মুহাব্বাতের সাথে গুরুত্বসহকারে আদায় করা।

৬. পশু জবাই করাঃ

রজব মাসের আমল সমূহের মাঝে প্রচলিত আরেকটি আমল হল, রজবে আতিরা জবাই করা। সুন্নি ও কিছু মাজার পন্থিদের মাঝে রাসূলের অনুসরণের নামে বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে পশু জবাইয়ের রেওয়াজ পাওয়া যায়।

পর্যালোচনা

রজব মাসে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে পশু জবাই করা স্বাভাবিকভাবে অন্য মাসে পশু জবাই করার মতই। কিন্তু ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে রজব মাসে মুশরিকদের মধ্যে স্বীয় দেবতা/প্রতীমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু যবাই করার একটি রেওয়াজ ছিল। একে 'আতীরা' বলা হত।

আহলে ইলমদের মাঝে রজব মাসে আতিরা জবাই নিয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ ওলামাদের মতে জাহেলী যুগের আতিরা জবাইয়ের এই শিরকী রেওয়াজ রাসূলুল্লাহ সাঃ মূলোৎপাটন করেছেন। দলীল হিসেবে ওনারা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদীস পেশ করেন, যে রাসূলুল্লাহ সাঃ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে لا فرع ولا عتيرة 'ফারা' (উট বা বকরির প্রথম বাচ্চা প্রতীমার উদ্দেশ্যে) জবাই করার কোনো প্রথা নেই

এবং ‘আতীরা’ও নেই। অর্থাৎ রজব মাসে প্রতীমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু জবাই করার প্রথাও নেই।[452]

আল্লামা ইবনে সীরিন রহ. সহ কিছু আলেমের মতে আতিরা মুস্তাহাব। তাঁরা দলীল হিসেবে পেশ করেন হযরত মাখনাফ বিন সালিম (রা.) এর হাদীস। মাখনাফ বিন সালিম (রা.) বলেন, আমরা রাসূলের সাথে আরাফার মাঠে অবস্থান করছিলাম, আমি শুনলাম তিনি বলেছেন-প্রতিটি বাড়ির অধিকারীদের উপর প্রতি বছর কুরবানি ও রজব মাসের আতীরা কর্তব্য। তোমরা কি অবগত আতীরা কি? তা হল যাকে তোমরা রজবিয়া বল (অর্থাৎ রজবে জবেহ করার পশু)।[453]

উক্ত হাদীসের ব্যাপারে কথা হলো, আবু হুরায়রা (রা.) এর আতীরা নিষিদ্ধতার হাদীসটি আতিরা মুস্তাহাব হওয়ার হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে, হাদীসের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণ্যতার দিক বিবেচনা করে।
আল্লামা ইবনে মুনযির রহ. আরো স্পষ্ট করে বলেন যে, আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদীস প্রাধান্য পাবে অন্যান্য হাদীসের উপর। কারণ আতিরা মুস্তাহাব হওয়ার বর্ণনাগুলো ছিলো, আবু হুরায়রা (রা.) ইসলাম গ্রহণেরও অনেক আগের। সুতরাং আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদীস দ্বারা অন্য বর্ণনাগুলো মানসূখ (রহিত) হয়ে যাবে। এবং এটিই প্রাধাণ্যযোগ্য মত।[454] হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, ইসলামে আতিরা বলতে কিছু নেই। এটাতো

---

[452] বুখারী: ২/৮২২ পৃ., হা. ৪৭৪৫।

[453] মুসনাদে আহমদ, ৫/৭৬ পৃ.।

[454] আল ইতিবার ফীন নাসেখী ওয়াল মানসুখ: ৩৮৮-৩৯০ পৃ.(হাযমী রহ.), লাতায়িফুল মা‘আরিফ: ২২৭ পৃ.,দারু ইবনু কাসীর।

জাহেলী যুগের কুসংস্কার যে, মানুষ রোজা ও রাখে এবং আতিরাও কুরবানি দিয়ে থাকে।[455]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, রজব মাসে পূন্য মনে করে জবাই করা, ঈদ-উৎসব উদযাপন করার মত। আর শরীয়তে যেমন দুই ঈদ ব্যতিত অন্য কোন ঈদের গ্রহণযোগ্যতা নেই। তেমনিভাবে রজব মাসেও পূন্য মনে করে জবাই করার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।[456]

আজকাল রজব মাসে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. এর মাযারে তাঁর জিয়ারত/ওফাত উপলক্ষে যে ‘উরস’ করা হয় সেখানে এমন অনেক পশু জবাই করা হয় যা মূর্খ লোকেরা হযরত খাজা রহ. বা তাঁর মাযারের নামে মান্নত করে থাকে। জাহেলী যুগের ‘ফারা’, ‘আতীরা’ আর বর্তমানের এসব জবাইকৃত পশুর মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য বুঝা যায় না। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো উদ্দেশ্যে যে জবাই বা মান্নত করা হয়, যদিও তা পীর-বুযুর্গের নামে হোক শিরক হিসেবে গণ্য হবে।[457] আল্লাহ তা‘আলা (অন্যান্য গুনাহকারীদের ক্ষমা করে দিলেও) মুশরিকদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।[458]

---

455 লাতায়িফুল মা‘আরিফ: ২২৭ পৃ. (ইবনে রজব হাম্বলী) দারু ইবনু কাসীর।

456 লাতায়িফুল মা‘আরিফ: ২৮১-২৮৫ পৃ. (ইবনে রজব হাম্বলী) দারু ইবনু খুযাইমা।

457 বেহেশতী জেওর উর্দূ: ৪০ পৃ. ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২০৪ পৃ., সূরা আনআম ১৩৬ নং আয়াত দ্র:।

458 সূরা নিসা: আয়াত ৪৮।

শাবান মাস

হিজরী সন অনুপাতে আরবী অষ্টম মাস হলো শাবান।

শাবান মাসের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ، وَشَهْرُ شَعْبَانَ شَهْرِي، شَعْبَانُ الْمُطَهِّرُ وَرَمَضَانُ الْمُكَفِّرُ

রমাদ্বান মাস আল্লাহ তা'আলার মাস, শাবান মাস আমার মাস, শাবান গুনাহ সমূহ থেকে পবিত্র করে দেওয়ার মাস। রমজান গুনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেওয়ার মাস।[459]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها – قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা্ঃ কে রমাদ্বান ছাড়া অন্য কোন মাসে পুরো মাস রোজা রাখতে দেখিনি। রাসূল সা্ঃ কে শাবানের তুলনায় অন্য কোন মাসে এত অধিক রোজা রাখতে দেখিনি।[460]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْراً مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ. قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল সা্ঃ এর খেদমতে আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি আপনাকে শাবান মাসে যত বেশি রোজা রাখেতে দেখি অন্য কোন মাসে এত বেশি রোজা রাখতে

---

[459] কানযুল উম্মাল: ৮/২১৭, হা. ২৩৬৮৫।

[460] বুখারী, হা. ১৯৬৯, আবু দাউদ হা. ২৪৩৫।

দেখিনা, রাসূল সা্ঃ   বলেন, এ মাসে সাধারণত লোকেরা অবহেলা করে থাকে। রজব ও রমাদ্বানের মাঝের এ মাসে মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ হয়ে থাকে। তাই আমার আকাঙ্খা হল তা'আলার দরবারে আমার আমলগুলো রোজাদার অবস্থায় পেশ করা হোক।[461]

শাবান মাসের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো, শবে বরাতের রাত্রিতে ইবাদত করা। এ নিয়ে আমাদের সমাজে বেশ বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি রয়েছে। কারো কারো বক্তব্য হলো, ইসলামে শবে বারাআত বলতে কিছু নেই। তারা এ বিষয়ে বর্ণিত হওয়া সকল হাদীসকে মনগড়া ও ভিত্তিহীন বলে এই রাত্রির ফযীলতকে উড়িয়ে দিতে চায়। আবার কেউ কেউ তা স্বীকার করলেও এ রাত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকারের বিদআতের সাথে নতুন পদ্ধতির ইবাদতের প্রচার প্রসার ঘটিয়ে থাকে। যা কখনই শরীয়ত সম্মত নয়। উভয় দলের মতামত ইনসাফ পরিপন্থী। কারণ ইসলামে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি কোনটার স্থান নেই।

এ জন্য সর্বপ্রথম শবে বারাআত কি? তার পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব। এরপর এর বিধান সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করবো ইনশা'আল্লাহ।

শবে বারাআত' কাকে বলে? শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ তারিখের রাতকে "শবে বারাআত" বলা হয়। "শবে বারাআত" "শব" শব্দটি ফার্সি, অর্থ রাত বা রজনী। আর "বারাআত" শব্দটি আরবী, অর্থ মুক্তি; সুতরাং শবে বারাআত অর্থ হলো, মুক্তির রাত। "শবে বারাআতকে" আরবিতে "লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান বা লাইলাতুল বারাআত" অর্থাৎ লাইলাতুল বারাআতি মিনাজ জুনূব অর্থাৎ গুনাহ থেকে মুক্তির রাত। এই

[461] নাসাঈ, হা. ২৩৫৭, আহমাদ হা. ২১৭৫৩।

রাত্রিকে হাদীসে 'নিসফে শাবান' বা শাবান মাসের মধ্য দিবসের রজনী বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

حٰمٓ ﴿١﴾ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾

অর্থ: হা-মীম, শপথ প্রকাশ্য কিতাবের। নিশ্চই আমি কোরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থীর করা হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই প্রেরণকারী।[462]

ব্যাখ্যাঃ এই আয়াতে "ليلة مباركة" শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত ইকরিমা (রাঃ) সহ অনেকের মত হল, শবে বারাআত। যদিও "ليلة مباركة" এর অর্থ তাফসীরের অন্যান্য গ্রন্থে শবে কদর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[463] তাফসীরে কুরতুবীতে আসছে, আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, "ليلة مباركة" এর অর্থ জমহুরে ওলামায়ে কেরাম শবে কদর নিয়েছেন। তবে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ শবে বারাআতও নিয়েছেন।[464]

বিশুদ্ধ কথা হলো, উক্ত আয়াতে কারীমায় 'লাইলাতুন মুবারাকা' বলে শবে কদরের কথাই এসেছে। শবে বারআতের কথা নয়।

যারা শবে বারাআত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের ভাষ্যমতে কুরআন-হাদীসের কোথাও শবে বারাআত বলতে কিছুই নেই। সুতরাং এই নামে

---

[462] সূরা দুখান: আয়াত ১—৫।

[463] তাফসীরে কাবীর: (ফাখরুদ্দীন রাজী ৬০৪হি.) ৯/২১৪ পৃ., দারুল ফিকর, তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৪৮ পৃ. , তাফসীরে রুহুল মা'আনী: (আল্লামা আলুসী ১২৭০হি.) ১৩/১৩৬ পৃ. , দারুল ফিকর, তাফসীরে শায়খুল হিন্দ ৬৪৩ পৃ.,ফরীদ বুক ডিপু।

[464] তাফসীরে কুরতুবি: (মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবী ৬৭১ হি.) ১৬/৮৫।

যা'ই পালন করা হোক তা নিতান্ত বিদআতই হবে, আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।

পর্যালোচনা

যারা মাজহাব (কুরআন ও সুন্নাহ বিশেষজ্ঞগণের পথ নির্দেশনায় আল্লাহর শরীয়তের) অনুস্বরণ করে দ্বীন ও ইসলামের উপর চলতে নারাজ। বরং নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে কুরআন হাদীস অধ্যায়ন করে নিজেরাই একজন মুজতাহিদ, গবেষক হয়ে তারা দ্বীন মানার দাবি করে। তাদেরকে আমরা 'লা মাযহাবী' বলি। যদিও তারা নিজেদের 'আহলে হাদীস' বলে দাবী করে। বর্তমানে নামধারী আহলে হাদীসদের স্পষ্ট বক্তব্য হল, শবে বারাআত বলতে কোন কিছু নেই। তাদের যুক্তি হল, শবে বারাআত নামে কুরআনে কিছুই নেই, সুতরাং তা পালন করা বিদআত। ইতোপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে, শব শব্দটা ফার্সি। মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু এলাকায় ফার্সি ভাষার সর্বাধিক প্রচলন ছিল। তারা এ রাতকে ফার্সিতে শবে বারাআতই বলতো। নামটি মুসলমানদের মাঝে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করায় এখনও মুসলিম ঘরানায় রাতটি শবে বারাআত নামেই প্রসিদ্ধ। পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবী, সেহেতু শব শব্দটি কোরআনে আছে কি নেই? এ প্রসঙ্গে লোকমুখে প্রশ্ন আসাটাই অবান্তর।

কেউ যদি অজ্ঞতার বশবর্তি হয়ে এমন কথা বলে তাহলে আমরাও বলতে পারি; নামায, রোজা, তারাবীহ, ইত্যাদি শব্দওতো কুরআনে নেই তাই বলে কি তাও বিদআত হয়ে যাবে? (নাউজুবিল্লাহ)।

মূল কথা হল, পনের শাবানের ফযিলতের ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ কথা হল, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম প্রায় সতেরটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিছু

সনদের দিক থেকে অনেক দূর্বল, কিছু সনদের দিক থেকে সামান্য দূর্বল, কিছু সনদের দিক থেকে হাসান পর্যায়ের।
মুহাদ্দিসীনে কেরামের উসুল অনুযায়ী, এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসের সূত্র একত্রিত করলে সহীহ লিগাইরিহীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যদি সকল হাদীসের সনদ দূর্বলও মেনে নেওয়া হয়, তবুও একাধিক সূত্রের কারণে এগুলো হাসান লিগাইরিহীর পর্যায় পৌঁছে গেছে।

বর্ণনাগুলোর মধ্য হতে চারটি বর্ণনা সনদের দিক থেকে মজবুত। যথা হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) এর বর্ণনা[465], হযরত আবু ছালাবা (রা.) এর বর্ণনা[466], হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) এর বর্ণনা[467], আম্মাজান আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা[468],

এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের বক্তব্য এবং অনেকগুলো হাদীস পাওয়া যাওয়ায়, শবে বারাআতের অস্তিত্ব ও ফযীলত নবীজি সা্ঃ এর হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যা পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং কেউ যদি বলে শবে বারাআত মানা যাবে না, এটার অস্তিত্বই নাই, তারা আসলে হাদীস মানার দোহাই দিয়ে মূলত হাদীসের অস্বীকার করছে।

---

[465] আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব: ৩/৩০৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, আল মুজামুল কাবীর: ২০/১০৮, সহীহ ইবনে হিব্বান: ১২/৪৮২।

[466] শুআবুল ঈমান: ৫/৩৫৯, হা. ৩৫৫১, ফাযায়েলুল আওকাত: ১২০পৃ.,মুজামুল কাবীর: ২২/২২৩, আসসুন্নাহ: (ইবনে আসেম)১/২২৪।

[467] ইবনে মাজাহ, হা. ১৩৯০, আসসুন্নাহ: (ইবনে আবি আসেম) ১/২২৪, আল মাকতাবাতুল ইসলামী।

[468] তিরমিজি, হা. ৭৩৯, ইবনে মাজাহ, হা. ১৩৭৯, মুসনাদে আহমাদ, হা. ২৬০১৮, শুআবুল ঈমান, হা. ৩৮২৫।

সবচেয়ে মজার বিষয় হল, গায়রে মুকাল্লিদদের মাঝে উল্লেখযোগ্য শায়েখ নাসির উদ্দিন আলবানী তাঁর "সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা" গ্রন্থে[469] বলেন,

حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر الصديق وعوف ابن مالك وعائشة.---- وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث

সার কথা হল, এসকল সূত্রের সমষ্টির কারনে (শবে বারাআত সম্পর্কীয়) হাদীস নি:সন্দেহে সহীহ। কোন হাদীস অত্যধিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ হলে এর চেয়ে কম সূত্রের মাধ্যমে সহীহ প্রমানিত হয়। (যেমনটি হযরত আয়শা রা: এর বর্ণিত হাদীসটি, যা অত্যধিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ।)

এমনিভাবে হাফেজ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর "তুহফাতুল আহওয়াযি" শরহে তিরমিযি গ্রন্থে[470] বলেন,

"اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا--- فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ-

সার কথা হল, জেনে রাখ যে, শবে বারাআতের ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের হাদীস এসেছে । যার ফলে শরীয়তে তার ভিত্তি আছে বলে বুঝা যায়। সুতরাং, যারা শরীয়তের মধ্যে শবে বারাআতের ভিত্তি নেই বলে মনে করে, এসব হাদীসের সমষ্টি তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ।

শেষ কথা হল, এই রাত আমল যোগ্য রাত। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা পেতে হলে খালেছ দিলে তাওবা করে আল্লাহর সকল নাফরমানী থেকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুক। আমীন

---

[469] সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা: (আলবানী) ৩/১৩৬, মাকতাবাতুল মা'আরিফ।

[470] তুহফাতুল আহওয়াযি: (আ.রহমান মুবারকপুরী) ৩/৩৬৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ।

করণীয় আমল:

আমাদেরকে ক্ষমা করার জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহ তা'আলা কিছু অফার (সুযোগ) দিয়ে থাকেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার রহমত সর্বদাই উসিলা তালাশ করে, কিভাবে বান্দাহকে ক্ষমা করা যায়। এই অফারগুলো গ্রহণ করা একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে চলতে গেলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার অনেক নাফরমানি হয়ে যায়। ঐ নাফরমানী ও সকল প্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যই মূলত আল্লাহ তা'আলা এ সকল অফারগুলো দিয়ে থাকেন। তন্মধ্যে একটি হলো শবে বারাআত। যার ফযীলত আকাশচুম্বী।

শবে বারাআতের ফযীলত:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَجْتُ ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ لِي : أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟، قَالَتْ : قُلْتُ : ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল সাঃ কে বিচানায় পেলামনা, (তালাশ করতে গিয়ে দেখি) হুজুর সাঃ জান্নাতুল বাকিতে।(আমাকে দেখে) রাসূল সাঃ বললেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তোমার উপর জুলুম করবে বলে ভয় হচ্ছে নাকি? আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সাঃ আমি ধারণা করেছিলাম আপনি আপনার অন্য কোন বিবির নিকট তাশরিফ নিয়েছিলেন, হুজুর সাঃ বলেন, আল্লাহ তা'আলা শাবানের পনের তারিখ রাত প্রথম আসমানে অবতরণ করে, "কালব" গোত্রের পালের পশম পরিমানের চেয়েও অধিক লোকের গুনাহ মাফ করে

দেন।[471] (সুবহানাল্লাহ এ রাতে কত বেহিসাব লোকের মাগফিরাত হয়ে থাকে?)

অপর বর্ণনায় আসছে,

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هل تدرين ما هذه الليل ؟ " يعني ليلة النصف من شعبان قالت : ما فيها يا رسول الله فقال : فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم

হযরত আয়েশা (রাঃ) হুজুর সা্ঃ থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর সা্ঃ বলেন আয়েশা! বলতে পার কি? এ রাত তথা শাবানের পনের তারিখ রাতে কি রয়েছে? আয়েশা (রাঃ) বলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি বলেন কি রয়েছে এই রাতে? (দয়া করে আপনি বলুন) হুজুর সা্ঃ বললেন আগামী এক বৎসর যত শিশু জন্ম নিবে এবং যত লোক মারা যাবে এ রাতে তাদের নামের তালিকা হয়ে যাবে। গত এক বৎসরের আমলনামা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হবে। এ রাতে বান্দাদের রিজিক অবতীর্ণ হয়ে থাকে।[472]

আরো স্পষ্ট ভাবে অন্য বর্ণনায় আসছে,

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبى صلي الله عليه وسلم قال يطلع الله الى خلقه فى ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

অর্থাৎ: হযরত মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সা্ঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা শাবান মাসের পনের তারিখের রাতে

---

[471] তিরমিজি, হা. ৭৩৯।

[472] মিশকাতুল মাসাবীহ: ১/২৩৮, ফাযায়েলুল আওকাত: ১/৬২৮।

সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে সকলকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মুশরিক এবং হিংসুক ছাড়া।[473]

কাছাকাছি বর্ণনায়া পাওয়া যায়,

عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ ইরশাদ করেন--"মধ্য-শাবানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে, তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে নুজূল করেন এবং বলেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিজিক প্রার্থী? আমি তাকে রিজিক দেব। কেউ আছে কি আপদগ্রস্ত? তাকে আমি নিষ্কৃতি দান করব। আছে কি অমুক, আছে কি অমুক--এভাবে আল্লাহ তা'আলা আহবান সুবহে সাদিক পর্যন্ত।[474]"

পাশাপাশি বর্ণনায় পাওয়া যায়,

عن عائشة بنت أبي بكر....... قال هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ ইরশাদ করেন, "এটা হল অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত শবে বারাআত)। আল্লাহ তা'আলা অর্ধ-শাবানের রাতে স্বীয় বান্দাদের প্রতি

---

[473] ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৭০।

[474] ইবনে মাজাহ, হা. ১৩৮৪।

মনোনিবেশ করেন। অতঃপর তিনি ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদেরকে ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদেরকে অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে তাদের বদকর্মের কারণে ফিরিয়ে দেন।”[475]

পর্যালোচনা

অনেক ফযীলতপূর্ণ রাত হলেও শবে বারাআতের জন্য নির্ধারিত কোন আমল কুরআন সুন্নাহে পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু রাতটিতে মহান আল্লাহ তা’আলা স্বীয় বান্দাদের উপর বিশেষ রহমত দান করেন এবং গুনাহগারদের জন্য ক্ষমার ঘোষণা করেন বিধায় মুসলমানদের উচিত এমন রহমত ও বরকতপূর্ণ রাতকে গণীমত মনে করে স্বীয় রবের দরবারে বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করা। নিত্য নতুন বিদআত ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থেকে প্রশান্তচিত্তে ইবাদত করা। নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, দরূদ শরীফ, দান-সদকা ও বিভিন্ন দু’আ, এবং সব ধরনের মাসনূন ইবাদতই এ রাতে করা যাবে।[476]

অপর এক হাদিসে পাঁচটি রাত জাগ্রত থেকে আমলকারীকে পুরুস্কার হিসেবে জান্নাতের সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে,

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان

---

475 শুআবুল ঈমান: (বায়হাকী) ৩/৩৮২ পৃষ্ঠা। এ হাদীসটিও নির্ভরযোগ্য। ইমাম বাইহাকী (রহ.) এ হাদীসটি বর্ণনার পর

এর সনদের ব্যাপারে বলেন-- هذا مرسل جيد “এই হাদীসটি উত্তম সনদে মুরসাল পর্যায়ের।” শুআবুল ঈমান: ৩/৩৮৩ পৃষ্ঠা।

476 কোরআন হাদিসের আলোকে শবে বরাত: (মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ দা.বা.) ১৪৫ পৃ., (একটি নিরপেক্ষ প্রামাণ্য বিশ্লেষণ)।

হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। যথা জিলহজ্বের আট তারিখের রাত, (জিলহজ্জের নয় তারিখের রাত) আরাফার রাত, ঈদুল আযহার রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, মধ্য শাবানের রাত।[477]

সংক্ষেপে এই রাত্রির করণীয় আমল সমূহ:

ولا شك أنها ليلة مباركة عظيمة القدر عند الله تعالى،......، فهذه الليلة وإن لم تكن ليلة القدر فلها فضل عظيم وخير جسيم وكان السلف رضي الله عنهم يعظمونها ويشمرون لها قبل إتيانها فما تأتيهم إلا وهم متأهبون للقائها والقيام بحرمتها على ما قد علم من احترامهم للشعائر على ما تقدم ذكره هذا هو التعظيم الشرعي لهذه الليلة

পনের শাবান (শবে বরাত), শবে কদর উভয় রাত ফযীলতপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ। এ জন্য উভয় রাতে জাগ্রত থেকে একাকি বেশি বেশি দু'আ, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির গুরুত্ব দেওয়া চাই।[478]

১. দীর্ঘ সেজদার মাধ্যমে নফল নামায আদায় করা।[479]

তথা রাত্রিতে জাগ্রত থেকে নির্জনে ইবাদত করা। (উল্লেখ্য এই রাত্রে জাগ্রত থেকে ইবাদত করাকে ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব বলেছেন। তবে এর ফযীলত আকাশচুম্বী। কিন্তু মসজিদে সমবেত হওয়া অনুচিত। একত্রিত হয়ে ইবাদতের আহবান করাটা মাকরূহ[480]।

---

[477] আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব: ২/৯৮,(১৬৮০) উল্লেখ্য হাদিসটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের নিকট দূর্বল। তবে অধিক দূর্বলতা না থাকায় উক্ত হাদিসের উপর আমল করাতে কোন সমস্যা নেই।

[478] আল মাদখাল: (ইবনুল হাজ্জ মালেকী) ১/২৯৯, মাকতাবা দারুত তুরাছ।

[479] শু'আবুল ঈমান, (বায়হাকী) হা. ৩৮৩৫।

[480] আল বাহরুর রায়েক: ২/৫২, (ইবনে নুজাইম), এসলাহী খুতুবাত: (ত্বাকি উসমানী) ৪/৩০৭,৩০৮, মাইমুন ইসলামিক পাব্লিশার্য।

২. নিজের গুনাহকে স্মরণ করে, দু'আ কবুলের আশা রেখে কায়মানোবাক্যে দো'আ করা[481]।

৩. পনের তারিখের দিনের বেলা রোজা রাখা মুস্তাহাব।[482]

৪. একাকি কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব[483]। তবে দলবদ্ধ হয়ে, জরুরী মনে করে, ডাকাডাকি করে যিয়ারত করা মাকরূহ।[484]

৫. সালাতুত তাসবিহের নামাজও জরুরী না মনে করে আদায় করা যেতে পারে। আদায় করার পদ্ধতি সাপ্তাহিক আমলের আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

এই রাতে যাদের দো'আ কবুল হয় না।

فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاقّ لوالديه ولا إلى مدمن خمر[485]

১: মুশরিক, ২: হিংসুক , ৩: আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, ৪: টাখনুর নিচে পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধানকারী, ৫: মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান-সন্তুতি, ৬:

---

[481] তিরমিজি, হা. ৭৩৯ ,মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ৪/৩১৭ হা. ৭৯২৭, শু'আবুল ঈমান: (বায়হাকি) ৩৮৩৭, শুআবুল ঈমান, হা. ৩৮২২, ইবনে মাজাহ, হা. ১৩৮৮, মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ২৭৫৪।

[482] তাহযীবুল কামাল: ৩৩/১০৭ (ইমাম মিযযি), শুআবুল ঈমান: হা. ৩৮২২, ফাযায়িলুল আওক্বাত: পৃ. ২৪, ইবনে মাজাহ: ১/৪৪৪, হা. ১৩৮৮। (অনেকে এই হাদিসকে মারাত্মক পর্যায়ের দূর্বল বলেছেন। কেউ কেউ জালও বলেছেন।

[483] মিশকাতুল মাসাবিহ, হা. ১৫৪,(বাবু যিয়ারাতিল কুবুর), শু'আবুল ঈমান: (বায়হাকি) হা.৩৮৩৭।

[484] ফাতহুল বারী: ২/৩৩৮, ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৫/৩৫০, দারুল উলুম দেওবন্দ: ফতোয়া নং ৩৫৮৬০, ১৫১৫৪৫,(অনলাইন)।

[485] শুআবুল ঈমান: (বায়হাকী) ৩/৩৮৪,৩৮৫ হা. ৩৮৩৫।

মদ্যপায়ী, ৭: ব্যাভিচারকারি ও ব্যাভিচারীনি, ৮: অন্যায়ভাবে হত্যাকারী, ৯: অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী, ১০:যাদু টোনার পেশা গ্রহণকারী, ১১: গণক তথা গায়েবী খবর বর্ণনাকারী, ১২: বাদ্য-বাজনায় অভ্যস্ত ব্যক্তি, ১৩: ফিতনাবাজ, ১৪: ছবি অঙ্কনকারী, ১৫: নিন্দুক।

অন্য হাদীসে বাকি আলোচনা আসছে।[486]

উল্লেখ্য, উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ যতক্ষণ না স্বীয় কৃতকর্ম থেকে খালেস নিয়তে তওবা করে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে আসবে, ততক্ষন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ রাতেও ক্ষমা করবেন না।

বর্জণীয় আমল

যেহেতু এই রাত্রিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি/সংখ্যায় কোন আমলের কথা কুরআন, হাদীসে পাওয়া যায় না। তাই ফুকাহায়ে কেরাম এই রাত্রির মহত্ব ও গুরুত্বের কারণে একাকি ইবাদত করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে বিষয়টি আর একাকি আমলে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর বিভিন্ন পদ্ধতি-পন্থা মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক প্রচার-প্রসার করে থাকেন। যা স্পষ্ট গর্হিত কাজ। যথা:

১. ইবাদতের জন্য ডাকাডাকি করা। যেমন অনেকে সালাতুত তাসবিহের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার জন্য ডাকাডাকি করে।

২. মহিলারা জামাতে নামায আদায় করা।

৩. আতশবাজী করা।

৪. আলোকসজ্জা করা।

---

[486] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা. ৫৬৬৫, শুআবুল ঈমান: (বায়হাকি) ৩৮৩১, ৩৮৩৭, দারুল উলুম: ফতোয়া নং ২১১৯, ৬৬১৯৯ (অনলাইন)।

৫. হালুয়া মিষ্টি ইত্যাদির আয়োজন করা। অথচ এসকল কাজ নব-আবিষ্কৃত ও কু-সংস্কার। যা বাস্তবে শিয়াদের কাজ।[487]

সুতরাং যে বা যারা এধরণের গর্হিত কাজের সাথে জড়িত, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুক। এবং এই রাত্রির যথাযথ মর্যাদা অর্জন করার তাওফিক দান করুক। আমীন।

রমাদ্বান মাস

হিজরী সন অনুপাতে আরবী নবম মাস হল, রমাদ্বান। বছরের বাকি এগারো মাস অপেক্ষা মর্যাদার সবচেয়ে শিখরে হল, রমাদ্বান। এ মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ

রমাদ্বান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ।[488]

অন্যান্য মাস আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয় বলা হলেও স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের (কুরআনের) কারণে এ মাসটি শুধু প্রিয়/দামি হয়নি, বরং যারা তার তিলাওয়াত করে, বা অন্যকে শুনায় তারাও প্রিয় ও দামি হয়ে যায়। তাছাড়া অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসের আমলের বিনিময় বহু বহুগুন বেশি লাভ হয়ে থাকে। যাকে আমরা একে

---

[487] ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া: ৩/২৬৭,২৬৯, ইদারা সদীক ডাবিল, আহসানুল ফতোয়া: ১/৩৮৫, দারুল ইশাআত, মা-সাবাতা মিনাস সুন্নাতি ফী আইয়ামিস সানাহ: ২১৪ পৃ. (আব্দুল হক দেহলভী রহ.১০৫২ হি.।

[488] সূরা বাকারা: আয়াত ১৮৫।

সত্তর বলে থাকি। তথা রমাদ্বান মাসে একটি নফল ইবাদতের দ্বারা সত্তরটি নফলের সাওয়াব লাভ হয়।

এছাড়াও অন্যান্য মাসে ইবাদতের মধ্যে যতটুকু প্রশান্তি লাভ হয়, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি প্রশান্তি লাভ হয় এই মাসে। এটি ইবাদতের সবচেয়ে উপযোগী মাস। এই মাসের দিনের বেলা রোজা রাখার পরও রাত্রিবেলার ইবাদতে বিরক্তিবোধ আসে না। সুতরাং বলা যায় এটি ইবাদতের উপযুক্ত একটি মাস।

রমাদ্বান মাসের ফযিলতঃ

১. রমাদ্বান হল, কুরআন নাযিলের মাস, হেদায়াতের মাস, ওহীর মাস।[489]

২. রমাদ্বান মাস শুরু হলেই রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।[490]

৩. রমাদ্বান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।[491]

৪. রমাদ্বান মাসে ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে।[492]

৫. রমাদ্বানে ওমরা হজ্জ সমতুল্য।[493]

---

[489] সূরা বাকারা: আয়াত: ১৮৫।

[490] মুসলিম, হা. ১০৭৯।

[491] বুখারী, হা. ৩২৭৭, মুসলিম, হা. ১০৭৯।

[492] মুসনাদে আহমদ, হা. ২২২০২।

[493] তিরমিযী, হা. ৯৩৯, আবু দাউদ, হা. ১৯৮৬।

৬. রমাদ্বান মাসে একটি নফল আদায়কারী অন্য মাসে একটি ফরয আদায়কারীর সমান সাওয়াব পায়। এবং এ মাসে একটি ফরয আদায়কারী অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায়কারীর সমান সওয়াব পায়।[494]

৭. রমাদ্বান রোজার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ নিজেই হয়ে যায়।[495]

৮. পুরো রমাদ্বান মাস বিশেষ এক নেয়ামতের মাস, রহমত, মাগফিরাত, নাজাতের মাস।

সুতরাং হতভাগা, কপালপোড়া, দূর্ভাগা, ধূলায়িত, লাঞ্ছিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি যে এমন মাস পেয়েও মাওলা থেকে নিজেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে নাই।[496]

৯- রমাদ্বানের শেষ দশকের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলো। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ রমাদ্বানের শেষ দশকে আমল বাড়িয়ে দিতেন। কারণ তাতে রয়েছে শবে কদর।

১০- ই‘তিকাফ করা। রমাদ্বানের শেষ দশকের মাসনূন ই‘তিকাফ অত্যন্ত ফযিলতের আমল।

নবী কারীম সা্ঃ রমাদ্বানের শেষ দশ দিন ই‘তিকাফ করতেন।[497]

১১- শবে কদর অন্বেষণ করা: রাসূলুল্লাহ সা্ঃ ই‘তিকাফের মাধ্যমে

শবে কদর তালাশ করতেন। যে রাতটি সহস্র রজনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

এ রাতে ফেরেশতা ও জিবরাঈল (আ.) তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে। (এ রাতের)

---

[494] শুআবুল ঈমান: (বায়হাকী) ৩/৩০৫-৩০৬ (যা সনদের দিক থেকে দুর্বল)

[495] মুসলিম, হা. ১১৫১, ১৬৫।

[496] আদাবুল মুফরাদ, হা. ৬৪৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা. ৯০৮।

[497] বুখারী, হা. ২০৩৩ , মুসলিম, হা. ১১৭১

আগাগোড়া শান্তি, যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[498] (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা বাৎসরিক আমলে আসবে। ইনশা-আল্লাহ)

১২- রমাদ্বান রাতে তারাবী/নফল, তাহাজ্জুদ আদায়ের ফলে পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[499]

১৩- দান করা: দান-সদকা সর্বাবস্থায়ই উৎকৃষ্ট আমল, কিন্তু রমাদ্বানে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

কারণ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ অন্য মাসের তুলনায় রমযান মাসে দানের হস্ত আরো প্রসারিত হত।[500]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রমাদ্বানের সকল হক আদায় করে রমাদ্বান মাসের বারাকাত অর্জন করার তাওফিক দান করুক। আমীন।

করণীয় আমল:

১- কুরআন তিলাওয়াত করা:

পুরো বৎসর যখনই সময় সুযোগ হয়, বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। যেহেতু এটি কুরআন নাযিলের মাস। তাই এ মাসে আরো বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। জিবরীল (আ.) রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর সাথে রমাদ্বানের প্রত্যেক রাতে কুরআন মাজীদ শুনাশুনি করতেন। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত জিবরীল আ. রমাদ্বানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ সা্ঃ তাঁকে কুরআন মাজীদ শোনাতেন।[501] অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিত রমাদ্বান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করা।

---

[498] সূরা কদর: আয়াত ১—৫।

[499] বুখারী, হা. ৩৭, ই.ফা. হা. ৩৬।

[500] বুখারী, হা. ১৯০২।

[501] বুখারী, হা. ১৯০২।

সময় পেলেই যেনো কুরআনুল কারীমের তেলোওয়াত হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। পুরো রমাদ্বান মাসে অন্তত একবার হলেও পুরো কুরআনে কারীমের খতম করা।

আকাবিরদের জীবনী থেকে রমজানুল মোবারকে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব:

- হযরত আসওয়াদ রহ. রমাদ্বানে প্রতি দুই রাত্রিতে এক খতম করতেন।
- ইব্রাহিম নাখয়ী রহ. রমাদ্বানের শেষ দশকে প্রতি দুই রাত্রিতে এক খতম করতেন।
  বাকি দিন তিনদিনে এক খতম করতেন।
- হযরত কাতাদা (রা.) রমাদ্বানে প্রতি তিনদিনে ও রমাদ্বানের শেষ দশকে প্রতি রাতে এবং
  রমাদ্বানের বাহিরে প্রতি সাতদিনে, এক খতম করতেন।
- ইমাম আবু হানিফা রহ. ও শাফেয়ী রহ. প্রতি রমাদ্বানে নামাযের বাহিরে ৬০খতম করতেন।
- আম্মাজান আয়েশা (রা.) রমাদ্বানে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত তিলাওয়াত থেকে উঠতেন না।[502]
- হযরত উসমান (রা.) রমাদ্বানে প্রতিদিন এক খতম করতেন।[503]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, প্রতি তিনদিনে খতম না করার বিষয়ে হাদীসের মধ্যে যে নিষেধাজ্ঞা আসছে, তা মূলত সর্বদা এমন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ফযীলতপূর্ণ সময়ের মাঝে এই নিষেধাজ্ঞা আসবে না।[425]

---

[502] লাতায়িফুল মা'আরিফ: ৩১৮-৩১৯ পৃ., (ইবনে রজব হাম্বলী) দারু ইবনু কাসীর।

[503] হালুস সালাফি ফী রামাদান: ১১পৃ., দারুল ওয়াতান।

হাদীসের মধ্যে আসছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতের সলাতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি (রাতের) সলাতে একশত আয়াত পাঠ করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। যে ব্যক্তি সলাতে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।[504]

২- রোযা রাখা: রোযা এটি ফারসী শব্দ। এর আরবী হল, সাওম। আভিধানিক অর্থে কোন কিছু হতে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়।[505] পারিভাষিক অর্থে; রমজান মাসে সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে খাবার, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বা সাওম বলা হয়।[506]

রোযার হুকুম: মূলত উম্মতে মুহাম্মদির জন্য সর্বপ্রথম আশুরার রোযা ফরয করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে রমাদ্বানের রোযা ফরজ করা হয়। ফলে আশুরার রোযা নফলে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর জীবদ্দশায় মোট নয়টি রমাদ্বান মাস পেয়েছেন।[507]

---

[504] আবু দাউদ, হা. ১৩৯৮।

[505] মুখতারুস সিহাহ: (রাজী) হরফে সা'দ ১/১৮০,১৮১ পৃ.।

[506] মুখতাসারুল কুদুরী: ১৮৯ পৃ. (আবুল হোসাইন কুদুরী ৪২৮ হি.) মাকতাবাতুল হেরা।

[507] আল মাজমু' শরহুল মুহাযযাব: (নববী) ৬/২৫০ পৃ.।

রমাদ্বান মাসের রোযা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ্ মস্তিস্ক সম্পন্ন, নর নারীর উপর রাখা ফরজ। শরয়ী কোন ওযর ছাড়া রোযা ত্যাগ করা জায়েজ নেই।

রোযার ফযীলত:

এ প্রসঙ্গে হাদীসে কুদসীতে আসছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী সা্ঃ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ বানী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যেই। একমাত্র রোযা ব্যতীত। রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। আর রোযা পালনকারীদের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশকের ঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত।[508]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ "মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সাওয়াব দশ গুন থেকে সাতশ' গুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "কিন্তু সিয়াম আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করব। বান্দা আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।" সিয়াম

---

[508] বুখারী, হা. ৫৯২৭, ই.ফা. ৫৩৯০।

পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ আছে। একটি তার ইফত্বারের সময় এবং অপরটি তার প্রতিপালক আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।[509]

বর্ণিত হাদীস দু'টি থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝে আসে,

১- রোযা ছাড়া অন্যান্য আমলের ফযীলত :

আদম সন্তানদের রমাদ্বানের রোযা ছাড়া প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত সাওয়াব বৃদ্ধি করে তার আমলনামায় লিখে দেন। এবং রোযার বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিবেন।

২- রোযার ফযীলত:

- ইফত্বারের সময় রোযাদারের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রশান্তি ও আনন্দ রয়েছে।
- রোযা রাখার কারণে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের আনন্দ রয়েছে।
- রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।

অন্য বর্ণনায় আরো কিছু ফযিলতের কথা উল্লেখ রয়েছে,

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ[510]

[509] মুসলিম, হা. ২৫৯৭, ই.ফা.হা. ২৫৭৪।

[510] মুসনাদে, আহমদ হা. ৯২২৫।

2. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، قَالَ : فَيُشَفَّعَانِ[511]

3. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ[512]

4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ....فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.......... ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ[513]

5. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ"[514]

6. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا[515]

- রোযা জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্য ঢাল এবং দুর্গ স্বরূপ হবে।[435]
- রোযা ও কুরআন তিলাওয়াত কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।[436]
- রোযা দ্বারা পূর্ববর্তী সকল (সগীরা) গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[437]
- রোযাদার ব্যক্তির দু‘আ; ইফতার পর্যন্ত কবুল হয়।[438]

---

[511] মুসনাদে, আহমদ হা. ৬৬২৬।

[512] বুখারী, হা. ২০১৪।

[513] তিরমিজি, হা. ২৫২৬।

[514] মুসলিম, হা. ২৬০০, ই.ফা. হা. ২৫৭৭।

[515] তিরমিজি, হা. ৮০৭।

- রোযাদার জান্নাতে রাইয়ান নামক শাহী তোরণ দিয়ে প্রবেশ করবে। এবং সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।[439]
- রোযাদারকে ইফতার করানোর কারণে রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জিত হয়। কিন্তু এর কারণে রোযাদারের সাওয়াব কম হবে না।[440]
- যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে তা তার গুনাহসমূহের ক্ষমা স্বরূপ হবে এবং দোজখের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে। তার সওয়াব হবে সেই রোযাদার ব্যক্তির সমান, অথচ রোযাদারের সওয়াবও কম হবে না।[516]
- যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে তার হালাল উপার্জন থেকে ইফতার করাবে, ফেরেস্তাগন তার জন্য রমাদ্বানের প্রতি রাতে মাগফেরাতের দো'আ করবে। এবং লায়লাতুল কদরে জিবরাইল আ. তার সাথে মুসাফাহা করবে।[517]
- যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবে, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আমার হাউস থেকে এমন শরবত পান করাবেন যে জান্নাতে প্রবেশের আগে তার আর পিপাসা লাগবে না।[518] রোযাদার কে ইফতার করানের ফলে তিনটি পুরুস্কার প্রধান করা হয়। ১: গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভ, ২: জাহান্নামীদের লিস্ট থেকে মুক্তি লাভ, ৩: রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ।[519]

---

[516] মিশকাতুল মাসাবিহ, হা. ১৭৩।

[517] মুজামুল কাবীর: ৬/২৬১ পৃ., হা. ৬১৬২, শুআবুল ঈমান: ১/৫৮০ পৃ.।

[518] ইবনে খুজাইমা: ৩/১৯২, হা. ১৮৮৭, শুআবুল ঈমান, হা. ৩৩৩৬, আত্তারগীব ওয়াত্তারহিব: হা. ১৭৫৩।

[519] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ৩/১৯২, হা. ১৮৮৭।

- **দু'আ করা** : রমযানের শেষ সময়ে কান্নাকাটি রোনাজারি বাড়িয়ে দেয়া দরকার। কারণ হাদীসের কিতাবে একাধিক সাহাবাগণের বর্ণনা আসছে যে, ওনারা শেষ সময়ে খুবই কান্নাকাটি করতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ ঐসকল ব্যক্তিদের জন্য ধ্বংসের বদ-দো'আ করেছেন, যারা রমাদ্বান মাস পেয়েও নিজেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারেনি।[520]

বর্জনীয় বিষয়:

রোজার বর্জণীয় বিষয় বলতে, একজন মুমিন তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটি কাজেই করনীয় বর্জণীয় বিষয় মেনে চলে। নির্দিষ্ট করে বলতে হয় না, এটা করণীয় এটা বর্জনীয়। তবে রোজা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তাই একমাত্র স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই করণীয় ও বর্জণীয় বিষয়ের আলোচনা করতে হচ্ছে।

১- হারাম বর্জন করাঃ হারাম সবসময় সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। যেখানে হারামের সম্পর্ক হয়, সেখান থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যায়। আর যদি তা হয় রমাদ্বান মাসের মত ফযীলতপূর্ণ মাসে, তাহলে তার নিন্দতা আরো বেড়ে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর বাণী আছে, হে পাপাসক্ত বিরত হও[521]! হে সীমালঙ্গনকারী থেমে যাও। সুতরাং রমাদ্বান মাসে সাহরী ও ইফতারে হারাম বর্জন করা জরুরী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।[522] অন্যত্র বলেন,

---

[520] তিরমিজি, হা. ৩৫৪৫।

[521] তিরমিজি, হা. ৬৮২।

[522] সূরা মু'মিনূন: আয়াত ৫১।

'হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর।[523]

হাদীসের মধ্যে আসছে,

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ...................... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، ومَلبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ পয়গম্বরদেরকে দিয়েছেন।.....................

অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ করে বললেন, যে এলোমেলো চুলে, ধূলিমলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ পানে দু' হাত তুলে 'ইয়া রব্ব! 'ইয়া রব্ব!' বলে দো'আ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার দো'আ কিভাবে কবুল করা হবে?"[524]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِه إِلَّا الظَّمأُ

---

[523] সূরা বাক্কারাহ: আয়াত ১৭২।

[524] মুসলিম, হা. ১০১৫, তিরমিজি, হা. ২৯৮৯, রিয়াদুস সলেহিন, হা. ১৮৬০।

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ অনেক রোযাদার এমন আছে যারা তাদের রোযা দ্বারা ‘ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া’ আর কোন ফল লাভ করতে পারে না।[525]

২- রোযা অবস্থায় যাবতীয় গুনাহ যেমন, চোখ কান, অন্তর ইত্যাদির গুনাহ থেকে বেচেঁ থাকাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ.......... وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সা্ঃ বলেনঃ আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন, ... তোমাদের কেউ যেন রোযা পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাঁকে গালি দেয় অথবা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার।[526]

রমযান ছাড়াও মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে তার যাবতীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, জেন রেখ, কান, চোখ ও অন্তর এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে।[527]

উপরোক্ত আলোচনার সার-সংক্ষেপঃ

১- সাহরী ও ইফতারে হারাম খাদ্য বর্জন।

২- রোযা অবসস্থায় অশ্লীল কথা/কাজ, ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি থেকে বেচেঁ থাকা।

---

[525] ইবনু মাজাহ, হা. ১৬৯১, সুনানে দারিমী, হা. ২৭৬২, মিশকাতুল মাসাবিহ, হা. ২০১৪।

[526] বুখারী, হা. ১৯০৪, মুসলীম, হা.২৫৯৬, ই.ফা. হা. ২৫৭৩, তিরমিজি, হা. ৭৬৪।

[527] বনী-ইসরাঈল: আয়াত ৩৬।

৩- রোযা অবস্থায় চোখের হিফাজত করা। যেমন, কু-দৃষ্টি, টিভি, মুভি ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ।

৪- রোযা অবস্থায় কানের হিফাজত করা। যেমন গান শুনা, গীবত শুনা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।

৫- রোযা অবস্থায় পুরো শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহমুক্ত রাখা।

৬- রোযা অবস্থায় অন্যকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

৭- রোযা অবস্থায় কেউ কষ্ট দিলে/বা মন্দ বললে প্রতিশোধ নেয়াতো যাবেই না। বরং এর প্রতি উত্তরে বলবে আমি একজন রোযাদার।

৮- রোযা অবস্থায় সর্বদা রোযার প্রতিদানগুলোকে সামনে রেখে রোযার উদ্দেশ্যের বিপরীত যাবতীয় কথা/কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

রোযা অবস্থায় যে সকল কাজ করলে রোজা ভাঙ্গে না। এবং রোযা অবস্থায় তা মাকরূহও না সংক্ষেপে:

- অনিদচ্ছাকৃত গলায় ধোঁয়া, ধুলা-বালি, মশা-মাছি প্রবেশ করলে।[528]
- ভুলে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে।[529]
- দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্য খেয়ে ফেললে, যদি তা চনার (বুট) পরিমাণের চেয়ে কম হয়।[530]
- কুলির পর থুথুর সাথে লেগে থাকা সামান্য পানি গিলে ফেললে।[531]
- থুথুর সাথে রক্ত খেয়ে ফেললে। যদি তা থুথুর চেয়ে কম হয় এবং রক্তের স্বাদ অনুভব না হয়।[532]

---

[528] শামী: ২/৩৯৫, দারুল ফিকর, হিন্দিয়া: ১/২০৩, দারুল ফিকর।

[529] আলমগীরী: ১/২০২।

[530] আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৪৪৫।

[531] আলমগীরী: ১/২০৩।

[532] শামী:২/৩৯৬, দারুল উলুম-৬/৪০৯।

- দন্তরোগ বা অন্য কোন কারণে জাগ্রত কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় নিজের অজান্তে রক্ত গলার ভেতরে চলে গেলে।[533]
- লবণাক্ত বা মিষ্টি পানি দ্বারা অজু গোসল করলে।[534] এবং কি সমুদ্রের লবনাক্ত পানি দিয়ে কুলি করলেও।[535]
- সাতার কাটার দ্বারা। তবে শর্ত হল, মুখ, নাক দিয়ে পানি প্রবেশ না করা।[536]
- বিষাক্ত প্রাণী দংশন করার দ্বারা।[537]
- মেসওয়াক করার দ্বারা, যদিও তা কাঁচা ডাল দ্বারা হয়। বরং রোযা অবস্থায় তার সাওয়াব কয়েকগুন বেড়ে যায়।[538]
- অনিচ্ছাকৃত মুখভরে বমি হলে। ইচ্ছাকৃত মুখভরে বমি না হলে।[539]
- কানে পানি ঢুকলে।[540]
- মাথায় বা গোঁফে তেল লাগালে। চোখে সুরমা লাগালে।[541]
- স্বপ্নদোষ হলে।[542]
- যৌন চিন্তা করার কারণে বা কোন বেগানা মহিলার দিকে (সরাসরি বা মোবাইলে) তাকানোর ফলে বীর্যপাত হলেও রোযা ভাঙ্গবে না।

---

533 শামী:২/৩৯৬, ইমদাদুল আহকাম: ২/১৩৪।

534 কিতাবুল ফাতাওয়া: ৩/৪০২।

535 আপকে মাসায়েল: ৪/৫৮৬।

536 শামী: ২/৪০১, এইচ এম সাঈদ।

537 হিন্দিয়া: ১/২০৩, আপকে মাসায়েল: ৪/৫৮৭।

538 শামী: ২/৪১৯, আল বাহরুর রায়েক: ২/২৮১।

539 হিন্দিয়া: ১/২০৪, কিতাবুল ফাতাওয়া: ৩/৩৩৯।

540 হেদায়া: ১/২০২।

541 আল বাহরুর রায়েক: ২/২৯৩, হিন্দিয়া: ১/১৯১।

542 শামী: ২/৩৯২, আল বাহরুর রায়েক: ২/৩৯৯।

তবে রোযা অবস্থায় কু-চিন্তা ও বেগানা মহিলার দিকে তাকানো রোযার উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং মারাত্মক গুনাহ।[543]

- সন্তানকে দুধ পান করালে।[544]
- গর্ভবতী মহিলার রক্ত বের হলে।[545]
- চোখে সুরমা বা ড্রপ দিলে।[546]
- চক্ষু শীতলতার জন্য বারবার চোখে পানি দেওয়ার দ্বারা, তবে অপ্রয়জনে এমন করাটা মাকরূহে তানযীহি।[547]
- দাঁত থেকে রক্ত বের হলে, তবে শর্ত হল (ইচ্ছেকৃত) গলার ভেতর রক্ত না ঢুকা।[548]
- রক্ত দিলে / নিলে বা রক্ত পরীক্ষা করলে, রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে এমন করার ফলে দুর্বলতার কারণে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা হলে বিনা ওজরে এমন করা মাকরূহ।[549]
- রোযা অবস্থায় হিজামা করলে।[550]
- মজি বের হলে।[551]
- রোযা অবস্থায় শরীরে স্যালাইন বা ইনজেকশন দিলে।[552]

---

[543] শামী: ২/৩৯৬, রহীমিয়া: ৭/২৬২।

[544] ফাতাওয়া দারুল উলুম: ৬/৪১১।

[545] হক্কানিয়া: ৪/১৫৭।

[546] হিন্দিয়া: ১/২০৩, আ-লাতে জাদিদা: পৃ. ১৫৪।

[547] হিন্দিয়া: ১/১৯১।

[548] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৫১৯।

[549] শামী: ২/৪১৯,দারুল ফিকর, কিতাবুল আসল: ২/১৯৪,২১২, হিন্দিয়া: ১/২০০, কিতাবুল ফাতাওয়া: ৩/৪০০।

[550] শামী: ৫/২১৯, আল বাহরুর রায়েক: ২/২৯৩।

[551] শামী: ২/৪১৭, আহসানুল-৪/৮৫১, কিতাবুল ফাতাওয়া: ৩/৩৮৫।

- রোযা অবস্থায় টিকা বা ভেক্সিন নিলে।[553]
- পানিতে বায়ু ত্যাগ করলে।[554]
- এন্ডোসকপি করালে। তবে শর্ত হলো, এন্ডোসকপির পাইপে তেল, ঔষুধ বা পানি থাকতে পারবে না।[555]
- ইন্সুলেন নিলে।[556]
- অক্সিজেন নিলে। তবে শর্ত হল, তাতে ঔষধ বা পানীয় না থাকা।[557]
- আল্ট্রাসনোগ্রাফি যদি উপরের মেশিন দ্বারা হয়। অন্যথায় অভ্যন্তরীণ হলে ভাঙ্গবে।[558]
- রোযা অবস্থায় আতর, পারফিউম, সুগন্ধি ব্যবহার করার দ্বারা।[559] তবে শর্ত হল, তাতে ধোঁয়া জাতীয় কিছু না হওয়া, যা পেটে প্রবেশ করে।[560](অনিচ্ছাকৃত প্রবেশের ফলে ভাঙ্গবে না। তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভেঙ্গে যাবে)।

---

[552] আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৪৩২।

[553] শামী: ২/৩৯৫,৩৯৬, সাঈদ, হিন্দিয়া: ১/২০৩, দারুল ফিকর, দারুল উলুম: ৬/৪০৭।

[554] আলমগীরী: ১/১৯৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/১২৭।

[555] শামী: ২/৩৯৭, আলমগীরী: ১/২০৫।

[556] শামী: ২/৩৯৫, এইচ এম সাঈদ।

[557] হিন্দিয়া: ১/২০৩, দারুল ফিকর।

[558] শামী: ২/৩৯৭, দারুল ফিকর।

[559] ফাতাওয়া কাযীখান: ১/২০৮।

[560] ফাতাওয়া: আল লাজনাতিদ্দায়িমা ১০/২৭১।

রোযা অবস্থায় যে সকল কাজ মাকরূহ। তবে এতে রোযা নষ্ট হয় না। রোযাদারের রোযার সাওয়াব কমে যায়। সংক্ষেপেঃ

- অজুতে কুলি করার সময় গড়গড়া করলে/নাকের নরম অংশে পানি পৌঁছালে।[561]
- রোযাদার অবস্থায় মিথ্যা, চোগলখুরী, গীবত, পরনিন্দা, গালি-গালাজ করলে, গান-বাদ্য, মিউজিক, সিনেমা, ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকলে।[562]
- বিনা প্রয়োজনে কোন জিনিস চর্বন করলে।[563]
- দিনের বেলা টুথপেস্ট বা মাজন দ্বারা দাঁত পরিস্কার করলে।[564]
- সাহরীকে সন্দেহের সময় পর্যন্ত দেরি করলে।[565]
- ইফতারের সময় হওয়ার পরও ইচ্ছাকৃত দেরি করলে।[566]
- রোযা অবস্থায় আপন স্ত্রীর ঠোঁট চুম্বন করলে।[567]
- রোযা অবস্থায় ফ্রী ফায়ার, পাবজী, দাবা, কেরাম, লুডু ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকলে।[568]
- রোযা অবস্থায় মুখের ভিতরে থুথু জমা করে গিলে ফেললে।[569]
- কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুসাফির ব্যক্তি রোযা রাখলে।[570]

---

[561] হিন্দিয়া: ১/১৯৯।

[562] বুখারী, হা. ১৯০৪, জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৫১৯, মাআরিফুস সুনান: ৫/৩৬৮।

[563] হিন্দিয়া: ১/১৯৯, দুররে মুখতার: ৬/৪১৬।

[564] আল বাহরুর রায়েক: ১/২৭৯, কিতাবুল ফাতায়া: ৪/৪০১, জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৫১৮।

[565] হিন্দিয়া: ১/২০০।

[566] বুখারী: ১/২৬৩।

[567] হিন্দিয়া: ১/২০০।

[568] আজিজুল ফতওয়া: ১/৩৯২।

[569] হিন্দিয়া: ১/১৯৯।

শাওয়াল মাস

হিজরী সন অনুযায়ী আরবী দশম মাস হল, শাওয়াল। রামাদ্বান মাসের সংশ্রবে থাকার কারণে শাওয়াল মাস দামী হয়েছে। সুহবাতের কারণে এই মাসকে "শাউওয়ালুল মুকাররম" বলা হয়। রমাদ্বান মাস যেমন আমলের কারণে দামি। শাওয়াল মাস রমজানের সুহবতে থাকার কারণে তাও দামি হয়েছে। কুরআন সুন্নাহ তালাশ করলে এ মাসে আমরা কয়েকটি আমলের আলোচনা খুঁজে পাই: ১: ঈদুল ফিতরের করণীয় বর্জনীয়। ২: শাওয়ালের ছয় রোজা। ৩: হজ্জের প্রস্তুতি প্রসঙ্গ।

করণীয় আমল:

দীর্ঘ একমাস অত্যন্ত পরিশ্রম করে কষ্ট করে রোজা রাখার পর, আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার হিসেবে দিয়েছেন ঈদুল ফিতর।

ঈদুল ফিতরের দিন পূর্বের ও পরের করণীয় বিষয়: প্রতিটি মুমিনের জীবনে রয়েছে কিছু আনন্দপূর্ণ মূহুর্ত। যদি তা হয় সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?

ঈদ কি ও কেন? তা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। কিতাব সংক্ষেপ করার মানসে শুধু ঈদের করণীয় ও বর্জনীয় প্রসঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছে পোষণ করেছি। রমজানের পূর্ণতার পরই শাওয়াল। পহেলা শাওয়াল মানেই আল্লাহ প্রদত্ত এক খুশির দিন। যাকে ঈদুল ফিতরের দিন নামেই অবহিত করা হয়।

---

[570] হিন্দিয়া: ১/২০১।

মুসলমানদের ঈদ তথা খুশির দিন শরীয়ত নির্ধারিত দুইদিন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এছাড়া যত প্রকারের খুশি আছে তা ঈদের নামে করা হলেও এর সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নাই।[571]

ঈদুল ফিতরের দিনের করণীয় আমল:
এই দিনের নির্দিষ্ট আমল হল,

(ক)- সদকাতুল ফিতর আদায় করা:
সদকাতুল ফিতরের পরিচয়ঃ ‘সদকাতুল ফিতর’-এ দুটি শব্দ আরবী। সদকা মানে দান, আর ফিতর মানে রোজার সমাপন বা ঈদুল ফিতর। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন আদায় করা সদকাকেই সদকাতুল ফিতর বলা হয়। এটিকে যাকাতুল ফিতর বা ফিতরাও বলা হয়ে থাকে।

মাসআলাঃ ঈদগাহে যাওয়ার পুর্বেই সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি ঋণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবের অতিরিক্ত সাড়ে সাত ভরি (৮৭.৪৭৯ গ্রাম) স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.৩৫ গ্রাম) রূপা বা সমমূল্য নগদ টাকা, ব্যবসার মাল অথবা অন্য কোন সম্পদের মালিক হলে তার উপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।[572]
ফযিলতঃ তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তা তোমাদের জন্য আরো ভাল; এবং এতে তিনি তোমাদের জন্য কিছু পাপ মোচন করবেন। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্মক অবগত।[573]

---

[571] আবু দাউদ, হা. ১১৩৪, নাসাঈ, হা. ১৫৫৬, মুসনাদে আহমাদ, হা. ১২০০৬।

[572] শামী: ২/৫৯-৬০ পৃ.।

[573] সুরা বাক্বারাহ: আয়াত ২৭১।

দানের ফযীলত প্রসঙ্গে " দৈনন্দিন সদকার ফযীলত " শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

মাসআলাঃ যার ওপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব, তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন, তেমনি নিজের অধীনদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন। (প্রত্যেকে তার নিজের পক্ষ থেকে এবং নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করবে) তবে এতে যাকাতের মতো বর্ষ অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়[574]। এমনকি পবিত্র রমজানের শেষ দিনেও যে নবজাতক দুনিয়ায় এসেছে কিংবা কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার পক্ষ থেকেও সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে[575]।

প্রশ্নঃ সদকাতুল ফিতর ঈদগাহে যাওয়ার আগে আদায় না করলে/ঈদের দিন আদায় করতে না পারলে কি তা রহিত হয়ে যায়?

উত্তরঃ যার উপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব, নির্দিষ্ট সময়ে আদায় না করতে পারলে পরবর্তীতে যে কোন সময় তা আদায় করা ওয়াজিব। সময় মতো আদায় করতে না পারলে ওয়াজিব রহিত হয় না। বরং অন্য যে কোন সময় তা আদায় করতে হবে।[576]

(খ)- ঈদুল ফিতরের সুন্নাত সমূহঃ

- ঈদের চাঁদ দেখে তাকবীর শুরু করা।[577]
- খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা।[578]

---

[574] ফাতহুল ক্বাদির: ২/২৮১ পৃ.।

[575] ফতোয়ায়ে আলমগিরি: ১/১৯২ পৃ.।

[576] শামী: ২/৩৬৭ পৃ.।

[577] তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪৭৯ পৃ.।

[578] হিন্দিয়া: ১/১৪৯, বেহেশতী জেওর: ২/৪৯০, ফতোয়ায়ে দারুল উলুম: ফতোয়া নং ৪৭৪৫১।

- মিসওয়াক করা।[579]
- গোসল করা।[580]
- উত্তম পোষাক পরিধান করা। (কাপড় নতুন হওয়া জরুরী নয়। বরং পরিস্কার/উত্তম হওয়া)।[581]
- খুশবু ব্যবহার করা।[582]
- শরীয়তের আওতায় থেকে যথাসম্ভব সুসজ্জিত হওয়া।
- ফজরের নামাজের পর বেশি বিলম্ব না করে ঈদগাহে যাওয়া।
- ঈদগাহে যাওয়ার আগে খেজুর বা অন্য কোন মিষ্টিদ্রব্য আহার করা।[583]
- ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই ফিতরা আদায় করা।[584]
- ঈদের নামায মসজিদে আদায় না করে ঈদগাহে আদায় করা।[585]
- ঈদগাহে ঈদের নামাজের পূর্বে বা পরে নফল নামায আদায় না করা।[586]
- সম্ভব হলে এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।[587]
- পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।[588]

---

[579] ইবনে মাজাহ, হা. ১০৯৮।

[580] ইবনে মাজাহ, হা. ১৩১৫, বায়হাক্বী ৩/২৮১ পৃ.।

[581] ইবনে খুযাইমাহ, হা. ১৭৬৬।

[582] ইবনে মাজাহ, হা. ১০৯৮।

[583] ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৫৪, ১৭৫৬।

[584] মুসলীম, হা. ৯৮৪, শামী: ২/৫৯-৬০ পৃ.।

[585] বুখারী, হা. ৯৫৬।

[586] ইবনে মাজাহ, হা. ১২৯১।

[587] বুখারী, হা. ৯৮৬।

- ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে এই তাকবীরটি পাঠ করাঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-ল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।[589]
- ঈদুল ফিতরের মুবারকবাদ এই শব্দে দেওয়া: ''তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিনকুম''[590]
- নিজ বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জনদের সাথে ঈদগাহে যাওয়া।[591]
- ঈদ ও জুমআ একইদিন হলে, জুমআ প্রতি সাপ্তাহের ন্যায়ই ওয়াজিব। জুম'আর নামায ছেড়ে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

আবু দাউদসহ হাদীসের কিছু কিতাবে একথা আসছে, (যে রাসূল সা্ঃ ঈদের নামাযের পর জুমুআর নামায পড়াকে ইচ্ছাধীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন) তা মূলত এমন গ্রামের মুসল্লীদের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যে গ্রামের মুসল্লীদের উপর জুমু'আর নামায আদায় করা আবশ্যক নয়। কিন্তু তারা ঈদের নামায আদায় করার জন্য শহরে এসেছে।[592]

২- শাউওয়াল মাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল, **শাওয়ালের ৬ রোযা:** রমজানের রোযার পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল, শাওয়ালের ৬ রোযা রাখা।

---

[588] তিরমিজি, হা. ৫৩০, ইবনে মাজাহ, হা. ১২৯৪।

[589] ইবনে আবি শাইবাহ, হা. ৫৬৫২।

[590] ফাতহুল বারী: ২/৫১৭, সুনানুল কুবরা: হা. ৬২৯৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হা. ৩২৫৫।

[591] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, হা. ১৪৩১।

[592] শামী: ২/১৬৬, বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৭৫, মুশকিলুল আসার: ২/৫২,(তাহাবী)।

এ বিষয়ে হাদীসে স্পষ্টভাষায় উল্লেখ আছে,

عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّه حَدَّثَه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَه سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাসের রোযা রাখবে। এরপর সে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযাও রাখবে তাহলে সে একাধারে রোযা পালনকারী গণ্য হবে।[593]

ফযিলতঃ যে ব্যক্তি রমাযান মাসের রোযা পালনের পর শাউয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল। প্রিয় নবী সা্ঃ বলেছেন, “যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখার পর-পরই শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, সে যেনো পূর্ণ এক বছর (৩৬০ দিন) রোযা রাখার সমান সওয়াব লাভ করল।[594]

এই সওয়াব এই জন্য যে, উম্মতে মুহাম্মাদির যে কেউ একটি ভালো কাজ করলে আল্লাহর অনুগ্রহে সে তার দশগুণ সওয়াব পায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “কেউ কোনো ভালো কাজ করলে সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে।[595]”

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে শাওয়াল মাসের ছয় রোযা রেখে সারা বছর রোযা রাখার সমান সাওয়াব পাওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

---

593 মুসলিম, হা. ১১৬৪, তিরমিজি, হা. ৭৫৯, আবূ দাঊদ, হা. ২৪৩৩, দারিমী, হা. ১৭৫৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্, হা. ২১১৪।

594 মুসলিম, হা. ১১৬৪।

595 সুরা আল-আন’আম: আয়াত ১৬০।

মাসআলাঃ শাওয়ালের ছয় রোজা একসাথেও রাখা যাবে। পৃথক পৃথক ও রাখা যাবে। মাসের শুরুতেও রাখা যাবে, শেষেও রাখা যাবে। তবে মাসের শুরুতে ও একসাথে রাখাটাই উত্তম।

৩- শাওয়াল মাসে হজ্জের প্রস্তুতি:

ইসলামের পাচঁটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ পঞ্চম স্তম্ভ। বিশ্বনবী সা্ঃ এর যমানা হতে তা হজ্জ করতে সক্ষম ব্যক্তিরা পালন করে আসছেন। হজ্জ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদাত। এতে যেমন অর্থের প্রয়োজন বিদ্যমান, তেমনি শারীরিক পরিশ্রম ও বিদ্যমান।

এই মাসের আরেকটি আমল বা কাজ হলো, হজ্জের প্রস্তুতি নেয়া। হজ্জের জন্য যারা নিয়ত করেছে তাদের কাজ হলো, তারা যেন হজ্জের যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল পূর্ব থেকে জেনে নেয়।

হজ্জের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الحج اشهر معلومات

হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুপ্রসিদ্ধ।[596]

হজ্জের মূল কাজ ৫দিন তথা ৮'এ জিলহজ্জ থেকে নিয়ে ১২'ই জিলহজ্জ পর্যন্ত। তবে আমরা যেন হজ্জের গুরুত্ব মহাত্ম্য, ও ফযীলত এবং হজ্জের যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জানতে পারি। এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা ও কালক্ষেপনের ভয়বহতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারি এবং সে অনুযায়ী এ মহান জিম্মাদারী আদায়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দান করুক। আমীন

[596] সূরা বাকারা: আয়াত ১৯৭।

যুলকদ মাস

হিজরী সন অনুযায়ী আরবী একাদশ মাস, যুলক্বদ। জুলহিজ্জাহ মাসের পূর্বের মাস যুলকদ। কুরআন-সুন্নাহ তালাশ করলে এই মাসে একটি আমলের কথা পাওয়া যায়।

জুলহিজ্জাহ মাসের চাঁদ উদয়ের পূর্বেই নখ, চুল, শরীরের অবাঞ্চিত পশম কেটে ফেলা: জুলহিজ্জাহ মাসের চাঁদ উদয়ের পূর্বে একটি আমলের কথা হাদীসে পাওয়া যায়। তা হলো, চাঁদ উদয়ের পূর্বেই নখ, চুল, শরীরের অবাঞ্চিত পশম কেটে ফেলা। চাঁদ উদয়ের পর থেকে কুরবানীর পশু জবাই করা পর্যন্ত নখ, চুল ও নাভীর নিচের পশম ইত্যাদি না কাটা। এটি মুস্তাহাব আমল। এই মর্মে দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

অর্থ: হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর সা: এরশাদ করেন, যখন জুলহিজ্জার প্রথম ১০দিন শুরু হয়ে যায় আর তোমাদের কেহ যদি কুরবানী করার ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন নিজ নখ, চুল ইত্যাদি না কাটে।[597]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ . قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أُضْحِيَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

[597] মুসলিম, হা. ১৯৭৭।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল সা্ঃ বলেছেন, আমাকে ইয়াওমুল আযহার আদেশ করা হয়েছে, (অর্থাৎ এ দিবসে কুরবানী করার আদেশ করা হয়েছে) এ দিবসকে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য ঈদ বানিয়েছেন, লোকটি বলল আমার কাছে যদি শুধু পুত্রের দেয়া একটি দুধের পশু থাকে আমি কি তাই কুরবানী করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এরশাদ করেন, না বরং তুমি তোমার চুল, নখ, গোঁফ, ও নাভীর নিচের পশম (উল্লিখিত সময়ে) কাটবে না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা র নিকট এটাই তোমার পূর্ণ কুরবানী।[598]

উক্ত হাদীস দ্বারা যাদের কুরবানী করার সামর্থ্য নেই তাদের জন্যও উল্লিখিত আমল প্রমাণিত হয়।
জ্ঞাতব্যঃ নখ, চুল ইত্যাদি কাটার মাধ্যমে বায়তুল্লার মুসাফির (অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় যারা আছে) তাদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় উক্ত কাজকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। কারণ হাজীদের জন্য ইহরাম অবস্থায় এ সকল বস্তু কাটা নিষেধ, আর আল্লাহ তা'আলার আশেক ও মাকবুল বান্দাদের সাদৃশ্য ইখতিয়ার করা আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়।[599]

মাসআলাঃ চুল, নখ, গোঁফ, নাভীর নিচের পশম ইত্যাদি প্রতি সাপ্তাহে একবার পরিস্কার করা মুস্তাহাব। তবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে মাকরূহে তাহরীমী যা মারাত্মক গুনাহ। তাই ফুকাহায়ে কেরামগণ উল্লেখ করেছেন, ঐ দিনগুলোতে না কাটার ফলে যদি চল্লিশদিন অতিবাহিত

[598] আবু দাউদ, হা. ২৭৮৯, নাসাঈ, হা. ৪৩৭৭, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা. ৫৯১৪।
[599] আহসানুল ফাতওয়া: ৭/৪৯৬, ফতোয়ায়ে মাহমুদীয়া: ১৭/৪৮৬, কিতাবুল ফাতওয়া: ৪/১৬৬।

হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে অবশ্যই কেটে নিবে। কারণ মুস্তাহাব অর্জনের চেয়ে মাকরূহে তাহরীমী থেকে বাঁচা অপরিহার্য।[600]

জুলহিজ্জাহ মাস

হিজরী সন অনুযায়ী আরবী দ্বাদশ মাস জুলহিজ্জাহ। জুলহিজ্জাহ মাস হারাম বা পবিত্র মাসসমূহের মধ্যে একটি। আল্লাহ তা'আলা বারো মাসের মধ্যে চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' তথা সম্মানিত মাস বলে ঘোষণা করেছেন। তন্মধ্য থেকে একটি হলো জুলহিজ্জাহ মাস। ইসলামী শরীয়তে জুলহিজ্জাহ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে জুলহিজ্জাহ প্রথম দশদিন। কেননা এই দশদিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের কথা কোরআন-সুন্নাহে পাওয়া যায়।

পর্যালোচনা

কুরআন হাদিসের আলোকে জুলহিজ্জাহ মাসের গুরুত্ব:

১- জুলহিজ্জাহ মাস কুরআনে বর্ণিত সম্মানিত চার মাসের একটি মাস।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ.....الخ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি।এর মধ্যে বিশেষ রুপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত।[601]

২- জুলহিজ্জাহ মাস হজ্জের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মাস।

اَلْحَجُّ اَشْهرٌ مَعْلُوْمٰتٍ.....الخ

অর্থঃ হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত।[602]

---

[600] আহসানুল ফাতওয়া: ৭/৪৯৬।

[601] সূরা তাওবাহ: আয়াত ৩৬।

وَيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ فِيْ اَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ....الخ

অর্থঃ নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ: করতে পারে।[603]

উপরোক্ত আয়াতে নির্দিষ্ট দিন বলতে জুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশদিনকে বুঝানো হয়েছে।[604]

হজ্জের ফযিলতঃ

১- নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে: হজ্বের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো, এবং হজ্জ সমাপনকালে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকলো, ও গুনাহের কাজ করলোনা, সে নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে বাড়িতে ফিরবে।[605]

২- বিনিময় একমাত্র জান্নাত:

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

কবুল হজ্বের বদলা একমাত্র জান্নাত।[606]

---

602 সূরা বাকারা: আয়াত ১৯৭।

603 সূরা হাজ্জ: আয়াত ২৮।

604 তাফসীরে ইবনে কাসীর: পৃ.৪৪৫। (মোবাইল এফস) সূরা হাজ্জ: ২৮ নং আয়াত দ্র:।

605 বুখারী, হা. ১৫২১।

606 সহীহ ইবনে খুযাইমা, হা. ৩০৭২, আত্তারীখুল কাবীর, ১/১৩৩ পৃ.(বুখারী রহ.), মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩২৫,৩৩৫।

৩- গুনাহ ও দারিদ্রতা মিটিয়ে দেয়:

তিনি আরও বলেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا: يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

তোমরা হজ্জ ও ওমরা একের পর এক আদায় কর। কেননা হজ্জ ও ওমরা গুনাহ ও দারিদ্রতা দূর করে দেয়।[607]

৪- হজ্জের মাধ্যমে পরকালের স্বরণ হয়ঃ হজ্জ মূলত মানুষকে তার আখেরাত, পরকালের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। এখানে কোন আহমিকা নেই, কোন বাদশাহী জমিদারী নেই, কোন কিছু দেখাবার কোন অবকাশ নেই, বরং ধণী-গরীব, রাজা-প্রজা, আরব-অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সবাই সেখানে একই পোষাক, একই কাজ, একই তালবিয়া একই শ্লোগানঃ লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি-মাতা লাকাওয়াল মুলক লা-শারীকালাক।

অর্থঃ হাজির হে আল্লাহ। বান্দাহ তোমার দরবারে হাজির। তোমার কোন শরীক নেই। বান্দাহ হাজির। নিশ্চই সমস্ত প্রশংসা ও সমস্ত নি‘আমত তোমারই। আর রাজত্ব ও আধিপত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।

৩- জুলহিজ্জাহ মাস এমন একটি মাস যে মাসে দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে।

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتْ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ وَأَيْنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَاللهِ بِعَرَفَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

---

[607] নাসাঈ, হা. ২৬৩০।

ত্বরিক ইবনু শিহাব থেকে বর্ণিতঃ ইয়াহূদীগণ ‘উমার ফারূক (রাঃ)-কে বলল যে, আপনারা এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন তা যদি আমাদের মধ্যে নাযিল হত, তবে আমরা সেটাকে “ঈদ” হিসেবে গ্রহণ করতাম। ‘উমার (রাঃ) বললেন, আমি জানি এটা কখন নাযিল হয়েছে, কোথায় নাযিল হয়েছে এবং নাযিলের সময় রসূলুল্লাহ সা্ঃ কোথায় ছিলেন, আয়াতটি আরাফাতের দিন নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ্‌র শপথ আমরা সবাই ‘আরাফাতে ছিলাম, সেই আয়াতটি হল ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। সুফ্‌ইয়ান সাওরী বলেন, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।[608]

৪- জুলহিজ্জাহ মাস এমন একটি মাস যে মাসের দশ তারিখে মুসলমানদের খুশীর দিন তথা কোরবানির ঈদের দিন।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ " مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ " . قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ মাদীনাতে এসে দেখেন মাদীনা বাসীরা নির্দিষ্ট দু'টি দিনে খেলাধূলা ও আনন্দ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ জিজ্ঞেস করলেনঃ এ দু'টি দিন কিসের? সকলেই বললো, জাহিলী যুগে আমরা এ দু' দিন খেলাধূলা করতাম। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদের এ দু' দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। তা হলো, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বরের দিন।[609]

---

[608] বুখারী, হা. ৪৬০৬, ই.ফা. হা. ৪২৪৮।

[609] আবু দাউদ, হা. ১১৩৪।

করণীয় আমল:

পুরো জুলহিজ্জাহ মাস সম্মানিত হলেও জুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশদিনের আমলের গুরুত্ব ও তার ফযীলত অপরিসীম।

প্রথম দশদিনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, والفجر وليال عشر– والشفع والوتر

অর্থঃ শপথ ফজরের, শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার যা বেজোড়।

উল্লিখিত আয়াতে ليال عشرদশ রাত্র থেকে উদ্দেশ্য হল, জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত।[610]

বুখারী শরীফের হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ ". قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ " وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَىْءٍ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা্ঃ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট জুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয় অন্য কোন দিনের আমল নেই। সাহারায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি ঐ দশ দিনের আমলের চেয়ে প্রিয় নয়? হুজুর সা্ঃ বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও প্রিয় নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আর তার জান ও মালের কিছূই নিয়ে ফিরে আসে নাই অর্থাৎ নিজে শহীদ হয়েছে, আর তার মালও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়েছে তাহলে তা এই দিনের অন্যান্য আমল অপেক্ষা উত্তম।[611]

---

[610] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১৭৩ পৃ., সূরা ফাজর ২নং আয়াত দ্র:।

[611] বুখারী, হা. ৯৬৯, আবু দাউদ, হা. ২৪৩৮

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, হুজুর সা্ঃ এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট ইবাদতের দিক থেকে জুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশদিনের ইবাদতের তুলনায় অধিক পছন্দনীয় কোন দিনের ইবাদত নেই। প্রতিদিনের রোজা এক বছর রোজার সমতুল্য এবং প্রতি রাতের ইবাদত, লাইলাতুল ক্বদরের ইবাদতের সমতুল্য।[612]

উল্লিখিত হাদীসে জুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন রোজা রাখার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর অন্য হাদীসে ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম বলা হয়েছে, তাই দশ তারিখ অর্থাৎ ঈদের দিন বাদ দিয়ে বাকি দিন গুলোতে রোজা রাখার হুকুম বহাল থাকবে। তথা বাকি নয় দিন রোজা রাখা মুস্তাহাব।[613]

সংক্ষেপে করণীয় আমল সমূহঃ

১- উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝে আসলো, জুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশদিনের গুরুত্ব অনেক বেশি, ফযীলত ও আকাশচুম্বী। তাই ঈদের দিন ছাড়া বাকি নয় দিন, **দিনের বেলা রোজা রাখার ও রাতে নফল নামাজ পড়ার চেষ্ট করা**। কমপক্ষে দুই রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করা। যদি

[612] তিরমিজি: হা. ৭৫৮, ইবনে মাজাহ: হা. ১৭২৮, ফাযাইলুল আওকাত: (বাইহাকী) ৩৪৬ পৃ.।

[613] শরহে সহীহ মুসলীম: (ইমাম নববী) ৪/৩২৮ পৃ.।

তাও সম্ভব না হয়, কমপক্ষে এশা ও ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করা।

কারণ হাদীসের মধ্যে আসছে, যে ব্যক্তি এশারের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তার জন্য অর্ধরাত (নফল) নামায আদায়ের সাওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি 'ইশা ও ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তার জন্য সারারাত (নফল) নামায আদায়ের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।[614]

২- এই দশদিনে বেশি বেশি তাসবীহ, তাহলীল, যিকির-আযকার করা।

কারণ হাদীসের মধ্যে আসছে,

عن عبد الله ابن عمر رض مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتكبير والتَّحْمِيدِ

রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেন, 'এ দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তাই তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি বেশি করে পড়।[615],[616]

বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝে আসে, যে সকল কালিমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ উর্ধ্বের কালিমা হল, ১- সুবহানাল্লাহ, ২- আলহামদুলিল্লাহ, ৩- আল্লাহু আকবার, ৪- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

---

[614] মুসলিম, হা. ১৩৭৭, আবূ দাউদ, হা. ৫৫৫, তিরমিজি, হা. ২২১।

[615] মুসনাদে আহমাদ: ৯/৩২৪, হা. ৫৪৪৬।

[616] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ৩: ২৫০ পৃ.।

৩- নয়'ই জুলহিজ্জাহ আরাফার রোযা রাখা: আরাফার দিন মহামান্বিত একটি দিন। এজন্য হাজি সাহেবরা ছাড়া বাকি সকলের উচিত প্রথম কয়দিনের রোযা না রাখতে পারলেও কমপক্ষে নয়'ই জুলহিজ্জার রোযা রাখার চেষ্টা করা। যেহেতু আরাফার রোজার মর্যাদা/ফযীলত আকাশচুম্বী তাই প্রতিটি মুমিনের উচিত এ ফযীলত অর্জনের জন্য চেষ্টা করা। আরাফার দিনের রোজার ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে আসছে,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

হযরত আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুরে আকরাম সা্ঃ এরশাদ করেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এই মর্মে আশাবাদী যে, আরাফার দিন অর্থাৎ নয়'ই জুলহিজ্জাহ রোযার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা পূর্বের এক বছর এবং সামনের এক বছরের সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ করে দিবেন।[617] (কবিরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য খালেছ দিলে তাওবাহ শর্ত)।[618]

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. তার মিরকাত গন্থে বলেন "সামনের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন" এর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলা গুনাহ থেকে তাকে হেফাজত করবেন। অথবা গুনাহ হয়ে গেলে তা ক্ষমা করে দিবেন।[619]

মাসাআলাঃ আরাফার রোজা যার যার দেশের নয়'ই জুলহিজ্জাহ অনুযায়ীই রাখবে। এক্ষেত্রে ফিতনা করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এরশাদ করেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ! চাঁদ দেখে রোজা ছাড়।[620] এক্ষেত্রে সৌদি

---

[617] মুসলিম, হা. ১১৬২, আবু দাউদ, হা. ২৪২৫।

[618] ফায়জুল ক্বাদীর: (আল্লামা মুনাওয়ী) ৬/১৬২ পৃ., আত্তিজারাতিয়্যাতিল কুবরা।

[619] মেরকাত: 8/৮৭৪, হা. ২০৪৪।

[620] বুখারী, হা. ১৯০৬, মুসলীম, হা. ১০৮০।

আরব দেখে রোজা রাখার কথা বলা হয়নি। সুতরাং এসব বিষয় নিয়ে ফিতনা করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে তারা যুক্তি পেশ করে যে, হাজিদের সাথে মিল রেখে রোজা রাখা প্রয়োজন। জেনে রাখা দরকার হাজিদের জন্য এ রোজা রাখার কারণে দুর্বলতার আশংকা থাকলে মাকরূহ। অন্যথায় মুস্তাহাব।[621] তাই তাদের সাথে মিল রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই।

৪- তাকবীরে তাশরীকের আমল: প্রত্যেক বালেগ পুরুষ (উচ্চস্বরে), মহিলা (নিম্নস্বরে)[622], মুকিম/ মুসাফির, জামাতে নামায আদায় করুক বা একাকি আদায় করুক, বা ইমামের সাথে কয়েক রাকাত ছুটে যাক, (মাসবুক) সকলের উপর নয়'ই জুলহিজ্জাহ ফজরের নামাজের পর থেকে তের জুলহিজ্জাহ আসরের নামাযের পর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর সঙ্গে সঙ্গে একবার তাকবীরে তাশরীক বলা।[623] অন্যান্য নামাজে জরুরী নয়। তবে ঈদুল আজহার নামাযের পর তাকবির বলা মুস্তাহাব ।[624] বারবার তাকবীর বলাকে জরুরী মনে করা ভিত্তিহীন।[625]

তাকবীরে তাশরীকঃ (الله اكبر الله اكبر لااله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد)
উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

৫- দশ'ই জুলহিজ্জাহ ঈদের দিনের করণীয় আমল:
(ক): ঈদুল আযহার দিনের সুন্নত সমূহঃ

---

[621] আল বাহরুর রায়েক: ২/৫৯৫।

[622] দূররে মুখতার: ২/১৭৯, আলমগীরী: ১/১৫২।

[623] দুররে মুখতার: ২/১৭৯, আলমগীরী: ১/১৫২।

[624] আলমগীরী: ১/১৫২, দুররে মুখতার: ২/১৭৯।

[625] তাকরীরাতে রাফেয়ী: ১১৬ পৃ., আহসানুল ফাতওয়া: ৪/১৫২।

- খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা।[626]
- মেসওয়াক করা।[627]
- গোসল করা।[628]
- উত্তম পোষাক পরিধান করা। (কাপড় নতুন হওয়া জরুরী নয়। বরং পরিস্কার/উত্তম হওয়া)।[629]
- সুগন্ধি লাগানো।[630]
- ফজরের নামাযের পর তাড়াতাড়ি ঈদগাহে যাওয়া। কারণ ঈদের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব।[631]
- সম্ভব হলে এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।[632]
- ঈদুল আযহার দিনে উচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরীক বলতে বলতে ঈদগাহে যাওয়া।[633]
- ঈদুল আযহার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব সে কুরবানী করুক আর না করুক।
- ঈদুল আযহার নামায ঈদুল ফিতর অপেক্ষা তাড়াতাড়ি আদায় করা।[634]

---

626 হিন্দিয়া: ১/১৪৯, বেহেশতী জেওর: ২/৪৯০, ফতোয়ায়ে দারুল উলুম: ফতোয়া নং ৪৭৪৫১।

627 ইবনে মাজাহ, হা. ১০৯৮।

628 ইবনে মাজাহ, হা. ১৩১৫, বায়হাক্বী: ৩/২৮১ পৃ.।

629 ইবনে খুযাইমাহ, হা. ১৭৬৬।

630 ইবনে মাজাহ, হা. ১০৯৮।

631 হিন্দিয়া: ১/১৫০, আল বাহরুর রায়েক: ২/১৬০, আন নুতাফ ফীল ফাতাওয়া: ৬৭ পৃ.।

632 বুখারী, হা. ৯৮৬।

633 ইবনে আবি শাইবাহ, হা. ৫৬৫২।

➢ সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন- تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ. (তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিনকা) আল্লাহ কবুল করুন আমাদের পক্ষ হতে ও আপনার পক্ষ হতে।[635]

➢ ঈদের নামায মসজিদে আদায় না করে ঈদগাহে আদায় করা।[636]

➢ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।[637]

➢ ঈদগাহে ঈদের নামাযের পূর্বে বা পরে নফল নামায আদায় না করা।[638]

➢ নিজ বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জনদের সাথে ঈদগাহে যাওয়া।[639]

➢ ঈদ ও জুম‘আ একইদিন হলে, জুমআ প্রতি সপ্তাহের ন্যায়ই ওয়াজিব। জুমআর নামায ছেড়ে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আবু দাউদসহ হাদীসের কিছু কিতাবে যে কথা আসছে, (যে রাসূল সাঃ ঈদের নামাজের পর জুমুআর নামাজ পড়াকে ইচ্ছাধীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন) তা মূলত এমন গ্রামের মুসল্লীদের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যে গ্রামের মুসল্লীদের উপর জুমুআর নামায আদায় করা আবশ্যক নয়। কিন্তু তারা ঈদের নামায আদায় করার জন্য শহরে এসেছে।[640]

---

[634] শামী: ৩/৫৩, ২/১৭৭, বাহরুর রায়েক: ২/১৬৩, রহীমিয়া: ৫/৭৮, হিন্দিয়া: ১/১৫০

[635] ফাতহুল বারী: ২/৫১৭, সুনানুল কুবরা: (বায়হাক্বী) হা. ৬২৯৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হা. ৩২৫৫।

[636] বুখারী, হা. ৯৫৬।

[637] তিরমিজি, হা. ৫৩০, ইবনে মাজাহ, হা. ১২৯৪।

[638] ইবনে মাজাহ, হা. ১২৯১।

[639] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, হা. ১৪৩১।

[640] শামী: ২/১৬৬, বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৭৫, মুশকিলুল আসার: ২/৫২,(তাহাবী)।

(খ): দশ, এগারো, বারো'ই জুলহিজ্জাহ সামর্থ্যবান নর-নারী নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা।

কুরবানী করার ফযিলতঃ কোরবানীর ফযীলত বিষয়ে আল্লাহ তাআ'লা ঘোষনা করেন,

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

আল্লাহ তাআ'লার নিকট (কোরবানির পশুর) গোস্ত, রক্ত, পৌঁছে না। বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।[641] সুতরাং বান্দা যখন কুরবানির পশুর গলায় ছুরি চালায় অতঃপর রক্ত প্রবাহিত হয় ওই রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বে তা আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হয়ে যায়।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে শুধু রক্ত প্রবাহিত করা বা গোশত খাওয়া এবং খাওয়ানোর দ্বারাই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না বরং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন হবে যদি কুরবানী দাতার অন্তরে তাকওয়া এবং আত্মত্যাগ থাকে। আর এসব বিষয়গুলো যার যত বেশি থাকবে তার কুরবানি আল্লাহ তালার দরবারে ততো বেশি গ্রহণযোগ্য ও কবুল হবে।[642]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

---

[641] সূরা হজ্ব: আয়াত ৩৭।

[642] আত-তারগিব ওয়াত্তারহীব: ২/৩৯২, মাসায়েলে ঈদাইন: ৩৩ পৃ.।

আম্মাজান আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, কুরবানীর দিন মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচাইতে পছন্দনীয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)। কুরবানীর পশু সকল শিং, তাদের পশম ও তাদের খুড়সহ কেয়ামতের দিন [কুরবানীদাতার পাল্লায়] এসে হাজির হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা প্রফুল্ল চিত্তে কুরবানী করবে।[643]

অপর বর্ণনায় আসছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ قَالَ " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ " قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ " . قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ "

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) বলেন, রাসূল সাঃ এর সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ সকল কুরবানীর ফযীলত কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নাত। তারা পুনরায় আবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে আমাদের জন্য কী সওয়াব রয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, কুরবানীর পশুর প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি সওয়াব রয়েছে। তারা আবারো প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ভেড়ার লোমের কি হুকুম? [এটাতো গণনা করা সম্ভব নয়] তিনি বললেন, ভেড়ার লোমের প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি সওয়াব রয়েছে।[644]

কোরবানী না করার উপর ধমকিঃ

[643] তিরমিজি, হা. ১৪৯৩, মুসতাদরাকে হাকেম: হা. ৭৫২৩। ওয়াল আফআল, হা. ১২১৫৩।

[644] ইবনে মাজাহ, হা. ৩১২৭, মিরকাত: ৩/১০৮৯ পৃ.।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেন, ‘যার কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে।[645]

(প্রিয় পাঠক! স্পষ্ট সহীহ হাদিস থাকা সত্ত্বেও যারা বলে কুরবানী ঐচ্ছিক বিষয় দিলে দিবেন না দিলে সমস্যা নাই। এধরণের বক্তব্যধারী হোক সে আলেমের লেবাসে, তাকে কখনই মান্য করা যাবে না।

৬- ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা:

আমাদের সমাজে ঈদের রাত মানেই মার্কেটিংয়ের রাত, গল্প-গুজবের রাত, আড্ডবাজির রাত, এবং মা-বোনদের মেহেদী লাগানো ও বিভিন্ন আইটেমের পিঠা বানানোর রাত। বড় আফসোস ও হতভাগা জাতি আমরা। এতবড় ফযিলতের রাতটিকে আমরা হাসি তামাশা গল্পগুজবে কাটিয়ে দেই। অথচ ঈদের রাতের ফযীলত প্রসঙ্গে বিশ্ব নবী সা্ঃ ইরশাদ ফরমান,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

অর্থ: হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাওয়াবের আসায় আল্লাহর জন্য দুই ইদের রাতে ইবাদত করবে তর দিল (কেয়ামতের কঠিন দিনেও) মরবে না (যেদিন ভয়ংকর পরিস্তিতির কারণে)

---

[645] মুসনাদে আহমদ: ২/৩২১, হা. ৮২৭৩, মুসতাদরাক হাকিম: ৪/২৩১ হা.৭৬৩৯, ইবনে মাজাহ, হা. ২১২৩।

সব দিল মৃত্যুবরণ করবে। অর্থাৎ কেয়ামত দিবসে সে নিরাপদ, শান্তি ও আরামে থাকবে।[646]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر،وَلَيْلَةَ الْفِطر وليلة النصف من شعبان

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সা্ঃ বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) জাগ্রত থাকবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তারবিয়ার রাত (জিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত), আরাফার রাত, কুরবানী দিবসের রাত এবং ঈদুল ফিত্বরের রাত ও শবে বরাতের রাত।[647]

উল্লিখিত দুটি হাদীসের বিস্তারিত তাহক্বিক বাৎসরিক আমলের আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

---

[646] ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৮২। উক্ত হাদীসটির শাওয়াহেদ পাওয়া যায় মু'জামুল আওসাতে (তাবরানী) ইমাম নববী রহ. উক্ত হাদীসের সকল সনদকে জয়ীফ বলেছেনঃ আল মাজমু: ৫/৪২, সনদ সূত্রে হাদীসটি যদিও যয়িফ তবে আমলের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য।

[647] আত তারগীব ওয়াত তারহীব: (আসবাহানী) ১/২৪৮, (মুনজেরী) ২/৯৮, হাদীস-১৬৫৬।

❖ হাদীসটির মান :উক্ত হাদীসটি যয়ীফ (আমলযোগ্য)। কেননা উক্ত হাদীস এর একজন দূর্বল বর্ণনাকারী হলেন عبد الرحيم بن زيد العَمِّي আব্দুর রহীম বিন যায়েদ আল আম্মী। তার সম্পর্কে মুহাদ্দীসগণ নিম্নরূপে জারাহ করেছেন-

عبد الرحيم بن زيد العمي أحد رواته (متروك)، و سبقه ابن الجوزي فقال : حديث لا يصح ، و عبد الرحيم قال يحيى : كذاب ، و النسائي : متروك ... وقال ابن حجر :حديث مضطرب الإسناد» .و الحديث أورده المنذري في الترغيب بلفظ «...الليالي الخمس ...». و أضاف في آخره : «...وليلة النصف من شعبان » و أشار المنذري لضعفه

বর্জনীয় আমল:

১- ঈদের দিন রোজা রাখা যাবে না।

২- ঈদের নামাজের পূর্বে বা পরে জবাইয়ের আগে কিছু না খাওয়া উত্তম। গোস্ত দিয়ে খাবার শুরু করা।

অবশ্যই এটি মুস্তাহাব আমল। কেউ না করলে কিছু বলার সুযোগ নাই।

৩- কুরবানী পশু জবাইতে কষ্ট না দেওয়া।

৪- জবাইয়ের পর ঠান্ডা হওয়ার আগেই তার শরীরে ছুরি না লাগানো।

পুরো বারো মাসেই করণীয় আমল

কুরআন সুন্নাহ তালাশ করলে পুরো বারো মাসের প্রতিটি মাসেই বিশ্ব নবী সা্ঃ থেকে একটি স্বতন্ত্র আমলের কথা হাদীসে পাওয়া যায়: আইয়ামে বিজের রোজা তথা প্রতি আরবী মাসের তিনদিন ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোজা রাখা।

উক্ত তিনদিন রোজা রাখার ফযিলতঃ

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ তাকে বলেছেনঃ হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা পালন করতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে তা পালন কর।[648] রাসূল সা্ঃ প্রতি আরবী মাসের এই তিনদিন রোজা রাখতেন। এ জন্য আমাদেরও উচিত সাধ্যানুপাতে প্রতি মাসের এই তিনদিন রোজা রাখা। এর মাধ্যমে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ হবে। এর মাধ্যমে রাসূলের সুন্নাত জিন্দা হবে। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেন, যে

[648] তিরমিজি, হা. ৭৬১।

ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জীবিত করল সে আমাকেই ভালোবাসলো, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসলো সে তো জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।[649]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ প্রত্যেক মাসের তিন দিন সাওম (রোযা) পালন করা সারা জীবন সাওম (রোযা) পালন করার সমতুল্য। আর আইয়ামে বীয -তের তারিখের সকাল থেকে চৌদ্দ এবং পনের তারিখ পর্যন্ত।[650]

পুরো বারো মাসেই বর্জনীয় আমল:

নামায যদিও ঈমানের পর স্থান। কিন্তু তাও আদায় করতে হয় শরয়ী দিক নির্দেশনা অনুযায়ী। যখন ইচ্ছে আদায় করলে সেটা মনপূজা হবে। নামায বা রবের ইবাদত নয়।

সময়মতো নামায আদায়ের ফযীলত দৈনন্দিন আমলের শিরোনামে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে আলোচনা করা হবে
যে সকল ওয়াক্তে নামাজ পড়া হারাম ও মাকরূহ বিষয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তিন সময় নামায পড়া হারাম, এবং দুই সময় নামায পড়া মাকরূহ।

- ❖তিন ওয়াক্তে নামায পড়া হারাম। তথা সূর্য উঠা, ডুবা ও বরাবর হওয়ার সময়:

---

[649] তিরমিজি, হা. ২৬৭৮, মিশকাত, হা. ১৭৫।

[650] নাসাঈ, হা. ২৪২০।

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

‘হযরত মূসা ইবনে উলাইয়্যি (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির আল জুহানী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সা্ঃ তিনটি সময়ে আমাদেরকে সলাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন : (১) সূর্য যখন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উদয় হতে থাকে তখন থেকে তা পরিস্কারভাবে উপরে উঠা পর্যন্ত, (২) সূর্য যখন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় থেকে হেলে যাওয়া পর্যন্ত, (৩) সূর্য ক্ষীণ আলোক হওয়া থেকে তা সম্পুর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।[651]

❖ দুই ওয়াক্তে নামায পড়া মাকরূহ।তথা ফজরের জামাতের পর থেকে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের জামাতের পর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত। হাদিসে আসছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ ". " وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ ". أَوِ الشَّيْطَانِ. لاَ أَدْرِي أَىَّ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ.

ইব্নু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সা্ঃ বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক

[651] মুসলিম, হা. ১৮১৪, ই.ফা. ১৭৯৯, তিরমিজি, হা. ১০৩০, নাসাঈ, হা. ৫৬০, ইবনে মাজাহ, হা.১৫১৯।

কিনারা অস্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় বন্ধ রাখ।[652]

মাসআলা: উপরোক্ত দুই সময়ে নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে কোন ব্যক্তির যদি ঐ দিনের আসর নামায পড়তে না পারে। তাহলে সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত আসর পড়ে নিতে পারবে। তবে অন্য দিনের আসর পড়ার অনুমতি নাই।[653]

[652] বুখারী, হা. ৫৮২,৩২৭২, মুসলীম, হা. ১৮১১।

[653] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৭০ দারুল ফিকর, উমদাতুল ফিকহ: ৫৭ পৃ., যাওয়ার একাডেমী।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

বাৎসরিক আমল

দিন আর বছর গণনার পটভূমি !!!

বর্ষপঞ্জি জীবনের একটা অপরিহার্য প্রসঙ্গের নাম। দিন, মাস, সনের হিসাব ছাড়া আধুনিক পৃথিবীতে কোনো কাজই চলে না। বাংলাদেশে তিনটি বর্ষপঞ্জির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সরকারি--বেসরকারি দাপ্তরিক কাজ, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইংরেজি বর্ষপঞ্জি একটা অপরিহার্য মাধ্যম। হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণ, বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারণ আর কৃষিজীবীদের মৌসুমের হিসাব ছাড়া বাংলাদেশে বাংলা পঞ্জিকার ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়ার মতো নয়। মুসলমানদের নামায, রোযা, হজ, যাকাত, শবে কদর, শবেবরাতসহ ধর্মীয় বিষয়াবলির জন্য হিজরি সনের হিসাব অপরিহার্য বিষয়। জীবনের প্রাসঙ্গিকতায় ইংরেজি ও বাংলা সনের বিদায় ও বরণে যতটা গুরুত্ব প্রদান করা হয়, হিজরি সনের ক্ষেত্রে তা মোটেও লক্ষ করা যায় না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী বর্ষপঞ্জির প্রতি এতটা অবজ্ঞা সত্যিই দুঃখজনক। সাধারণ মানুষ তো বটেই; অনেক আলেম যাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে থাকেন, তাঁরাও হিজরি পঞ্জিকার দিন তারিখের খবর রাখেন না।

পৃথিবীতে আদিকাল থেকে বছর গণনার রীতি চলে এলেও সন নির্ধারণের

জন্য কোনো সর্বজনীন পদ্ধতি চালু ছিল না। তাই মানুষ কোনো বিশেষ বা ঐতিহাসিক ঘটনার বছর প্রথম ধরে বছরের সংখ্যা নির্দেশ করত। যেমন আবরাহা বাহিনীর কাবা আক্রমণের বছরকে কেন্দ্র গণ্য করে বলত আমুল ফিলের এত বছর পরে বা আগে। অথবা দুর্ভিক্ষের বছরের আগের বা পরের ঘটনা।

সন নির্ধারণের সর্বজনীন কোনো রীতি চালু না থাকায় মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির স্মৃতি সংরক্ষণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পরে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের নথি সংরক্ষণে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

হিজরি সন:

ইসলামী বর্ষপঞ্জি তথা আরবি পঞ্জিকাই পৃথিবীর আদি ও আদর্শ সন গণনার পদ্ধতি, যা পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে চলে আসছে। যদিও হজরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে রাসুল (সা.) এর হিজরতের বছরকে সূচনা ধরে হিজরি সনের প্রচলন করেন। তিনি বর্ষ পরিক্রমায় কোনো নতুন পদ্ধতি চালু করেননি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে বছর গণনার মাস ১২টি নির্ধারিত। এর মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এগুলোর বিষয়ে নিজেদের ওপর জুলুম করো না।[654] রাসুলুল্লাহ সা্ঃ ও বিদায় হজের ভাষণে একই কথা বলেছিলেন। রাসুল সা্ঃ বলেছিলেন, হে মানবমণ্ডলী, তোমরা মনোযোগসহকারে শোনো! যেদিন আল্লাহ তা‘আলা আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে সময় গণনার হিসাব যে বিধান অনুযায়ী হয়ে আসছে, এখনো ওই একই বিধানের

---

[654] সুরা তওবাহ: আয়াত ৩৬।

আলোকে তা পরিচালিত হবে। আল্লাহ তা'আলা যেদিন আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে আল্লাহর বিধানে বছর গণনার মাস ১২টি নির্ধারিত। এর মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। ওই চার মাসের ব্যাপারে তোমরা নিজেদের ওপর কোনো জুলুম করো না।[655] কোরআনের আয়াত ও হাদিসে উল্লিখিত নিষিদ্ধ চার মাস মহররম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

তবে জাহেলি যুগে নিষিদ্ধ মাসগুলোর ধারাবাহিকতায় আরবরা কিছু রদবদল করেছিল। মুজার গোত্র রজব মাসকে জমাদিল আখার ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী তথা সপ্তম মাস হিসেবে গণ্য করত, আর রবিয়া গোত্র শাবান ও শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী অর্থাৎ অষ্টম মাস হিসেবে গণ্য করত।[656] রাসুলুল্লাহ সাঃ ১২ মাসের ক্রমধারায় মুজার গোত্রের হিসাব সঠিক বলে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের তথ্যমতে, আরবি বর্ষপরিক্রমাই আদি এবং আদর্শ বর্ষপঞ্জি।

বিশেষ করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পরে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের নথি সংরক্ষণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। একবার হজরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তাঁর সামনে একটি দলিল উপস্থাপিত হলো, যাতে শুধু শাবান মাস উল্লেখ ছিল। খলিফা দলিলটি দেখে বললেন, এটা বর্তমান বছরের শাবান মাস, নাকি গত বছরের সেটা কী করে বুঝব? তিনি তাৎক্ষণিক সন নির্ধারণের জন্য বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের এক পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন। অন্য এক বর্ণনায় জানা যায়, একবার কুফার গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস (রা.) হজরত ওমর (রা.)-কে লিখে পাঠালেন, আমিরুল মুমিনীন, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে বিভিন্ন

---

[655] বুখারী।

[656] তাফসীরে ইবনে কাসীর।

সময়ে জরুরি পত্রাদি আসে। যাতে প্রজাতন্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ থাকে। আমাদের প্রতি জরুরি ফরমান থাকে, অথচ এতে কোনো দিন, তারিখ ও সন উল্লেখ থাকে না। ফলে আমরা বুঝতে পারি না চিঠিটা কবে আমাদের পাঠানো হলো, কত দিন পর আমরা সেটা পেলাম, আর কবে থেকে খলিফার ফরমান বা নির্দেশ কার্যকর হবে।

অতএব আপনার চিঠিপত্রে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ থাকা জরুরি। চিঠিটি পাঠ করে হজরত ওমর (রা.) বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন এবং তাৎক্ষণিক হজরত ওসমান (রা.) ও হজরত আলী (রা.)সহ বিশিষ্ট সাহাবিদের নিয়ে জরুরি পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। সভায় সবাই যুক্তিসহ নিজের মতামত পেশ করলেন। কেউ বললেন, রাসুলুল্লাহ সা্ঃ এর জন্মের বছরকে সূচনা ধরে মুসলিম সনের প্রবর্তন করা হোক, কেউ বললেন আল্লাহর রাসুলের নবুওয়াত প্রাপ্তির বছরকে প্রথম ধরে মুসলিম বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হোক।

আবার কেউ বললেন, রাসুলে করিম সা্ঃ এর ওফাতের বছরকে কেন্দ্র ধরে ইসলামী সনের প্রচলন করা হোক। হজরত ওমর (রা.) সবার মতামত শোনার পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন, যদি রাসুলের জন্মের বছরকে সূচনা ধরা হয়, তাহলে খ্রিস্টানদের অনুসরণ করা হয়। যদি মৃত্যুর বছরকে কেন্দ্র গণ্য করা হয়, তাহলে শোককে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়, আর যদি নবুওত প্রাপ্তির বছরকে ধরা হয় তাহলে বিষয়টি একেবারে আধ্যাত্মিক হিসেবে গণ্য হয়। তিনি ভিন্ন একটা প্রস্তাব পেশ করলেন। হজরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসুলের হিজরতের বছরকে আরম্ভ ধরে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বর্ষপঞ্জি নির্ধারণ করা যেতে পারে। সে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সেই থেকে মুসলমানদের

কার্যপঞ্জি হিসেবে হিজরি সন চালু হয়। ঘটনাটা ছিল ১৬ হিজরির বা ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের।

বাংলা সনে দিনের শুরু ও শেষ হয় সূর্যোদয়ের সময় হতে । ইংরেজি বা গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জিতে দিনের শুরু ও শেষ হয় মধ্যরাত হতে । হিজরী সনে দিনের শুরু ও শেষ হয় সূর্যাস্তের সময় হতে ।[657]

বৎসর ঘুরে যে আমল আসে; তথা যে আমলের সম্পর্ক দৈনিন্দন বা সাপ্তাহিক অথবা প্রতি মাসের সাথে সম্পর্কিত না তাকে বাৎসরিক আমলের শিরোনামে একত্রিত করা হয়েছে।

করণীয় আমলসমূহ

১- রমাদ্বান মাসের রোজা রাখা: বিস্তারিত রমজান মাসে অতিবহিত হয়েছে।

২- হজ্জ পালন করা:

কার উপর হজ্জ ফরজ হয়? কুরআন মাজীদে সামর্থ্যবানদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান এসেছে খুবই তাকীদের সাথে ।

ইরশাদ হয়েছে-

وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَمَنْ كَفَرَفَاِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থঃ মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্ব করা তার অবশ্যকর্তব্য। আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি সামান্যও মুখাপেক্ষী নন।[658]

---

[657] https://ismailhosen.wordpress.com/2014/06/24 / দিন-আর-বছর-গণনার-পটভূমি

[658] সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৯৭।

এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا

আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং বললেনঃ হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর।[659]

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করলে তার ব্যপারে রাসূল (সাঃ) এর বাণী:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

আলী (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ঘর পর্যন্ত পৌঁছার মত সম্বল ও বাহনের অধিকারী হওয়ার পরও যদি হজ্জ না করে তবে সে ইয়াহুদী হয়ে মারা যাক বা নাসারা হয়ে মারা যাক তাতে (আল্লাহ তা'আলার) কোন ভাবনা নেই।[660]

মাসআলা: যার মালিকানায় নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচের অতিরিক্ত এই পরিমাণ টাকা-পয়সা বা সম্পত্তি আছে, যা দ্বারা হজ্জে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্জকালীন সাংসারিক খরচ হয়ে যায়, তার উপর হজ্জ করা ফরয।[661]

---

[659] মুসলিম, হা. ৩১৪৮, ই.ফা. হা. ৩১২৩।

[660] তিরমিজি, হা. ৮১২।

[661] আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪৫৮ পৃ.।

মাসআলা: হজ্জ যে বছর ফরয হয় সে বছরই তা আদায় করা ওয়াজিব। গ্রহণযোগ্য কোনো ওযর ছাড়া হজ্জ বিলম্বিত করলে গুনাহ হবে।
তবে পরবর্তীতে হজ্জ আদায় করে নিলে এই গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।[662]

৩- যাকাত আদায় করাঃ ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো, নামায। নামাজের পরেই যাকাতের অবস্থান।

যাকাতের **আভিধানিক অর্থঃ** বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্র করা, প্রাচুর্য, প্রশংসা। **পারিভাষিক অর্থে** যাকাত বলা হয়ঃ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, নিজ সম্পদের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ, এমন কোন দরিদ্র মুসলিমকে কোন প্রকারের বিনিময় ব্যতিত প্রদান করা, যে নেসাব পরিমান মালের মালিক নয়, হাশেমী বংশের বা তাদের গোলামও নয়।[663]

যাকাত প্রদান করতঃ নিজের বাহ্যিক সম্পদকে পবিত্র করার সাথে সাথে অন্তরকেও পবিত্র করা।

যাকাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কোরআন মাজিদে এরশাদ করেন,
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না। আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে, ‘ এগুলোই তা যা

---

[662] রদ্দুল মুহতার: ৩/৫১৭ রশীদিয়া, কিতাবুল মাসাইল: ৩/৭৬।

[663] আদ্দুররুল মুখতার: ৩/১৭০ পৃ.,যাকারিয়া, আল মু‘তাসারুর জরুরী: ১৫৭ পৃ., হেরা।

তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। কাজেই তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর।[664]

আয়াতে ولاينفقونها(খরচ না করা) এই বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত হল, যারা প্রয়োজন অনুপাতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তবে বাকি জমাকৃত সম্পদ তাদের জন্য ক্ষতির কোনো কারণ নয়। হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা্ঃ ইরশাদ করেন যে সম্পদের যাকাত আদায় করে দেওয়া হয় তা ماكنزتم (পুঞ্জিভুত করা) এর অন্তর্ভূক্ত হবে না। (আবু দাউদ, আহমদ ইত্যাদি) সুতরাং এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত আদায় করার পর অবশিষ্ট সম্পদ জমা রাখা গুনাহ বা দোষের কিছু নয়। এটাই জমহুর ফুকাহা ও আইম্মায়ে কেরামের মত।[665]

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتَاهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, ‘যাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি, ক্বিয়ামাতের দিন তার ধন-সম্পদকে (বিষধর স্বর্পরূপে) তার জন্যে লোমবিহীন কালো-চিহ্ন যুক্ত সর্পে রূপে পরিণত হবে এবং তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। তার উভয় অধরপ্রান্তে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, ‘আমি তোমার সম্পদ ঐ (যা তুমি জমিয়ে রাখতে), আমি তোমার

[664] সূরা ত্বাওবাহ: আয়াত ৩৪।

[665] তাফসীরে মাযহারী: সূরা তাওবাহ ৩৪ নং আয়াত দ্র:।

সঞ্চয়' (যা তুমি একত্রিত করে রাখতে)। এরপর রাসূলুল্লাহ সা္ঃ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ

وَلاَيَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاآتَاهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ"এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে ......,[666]

যাকাত আদায়ের ফযিলতঃ

১- আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ

আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত প্রদান করে।[667]

২- আল্লাহর সাহায্য লাভের অন্যতম কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ – ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ

আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে...।[668]

৩- গুনাহ মাফির কারণ। নবী সা্ঃ বলেন,

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

[666] বুখারী, হা. ৪৫৬৫, ই.ফা. হা. ৪২০৬।

[667] সূরা আল আরাফ: আয়াত ১৫৬।

[668] সূরা আল হাজ্জ: আয়াত ৪০-৪১ আয়াত।

কা’ব বিন উজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, ‘রোযা হল ঢাল স্বরূপ। আর সদকাহ গোনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে (নিশ্চিহ্ন) করে দেয়।[669]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا

হারিসা ইব্‌নু অহব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি নবী সা্ঃ কে বলতে শুনেছি, তোমরা সদকা কর, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ আপন সদকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। (যাকে দাতা দেয়ার ইচ্ছা করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।[670]

❖ যাদের উপর যাকাত ফরয:

মাসআলা: মুসলমান, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, স্বাধীন, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এবং উক্ত নেসাবের উপর বৎসর অতিবাহিত হলে, যাকাত আদায় করা তার উপর ফরয।[671]

❖ যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়

---

[669] মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৪৪৪১, তিরমিজি, হা. ৬১৪, আবূ য়্যা’লা, হা. ১৯৯৯, ত্বাবারানী, হা. ১৫৬৮৯।

[670] বুখারী, হা. ১৪১১।

[671] আদ্দুররুল মুখতার: ২/২৫৯, বাদায়েউস সানায়ে: ২/৭৯,৮২ ।

মাসআলা: সব ধরনের সম্পদ ও সামগ্রীর ওপর যাকাত ফরয হয় না, একমাত্র; **১-শুধু সোনা (**সাড়ে সাত ভরি), **২-রূপা**, (সাড়ে ৫২ তোলা)[672], **৩-নগদ টাকা-পয়সা**[673], ক্যাশ থাকুক বা ব্যাংকে থাকুক, অথবা বন্ডের মাধ্যমে থাকুক,বা শেয়ারের মাধ্যমে থাকুক, বা চেকের মাধ্যমে থাকুক (রূপার নিসাব হিসেব ধর্তব্য), **৪-পালিত পশু** যেটা জঙ্গলে বিচরণ করে চলে, মালিকে খাওয়ানো লাগেনা, **৫-ব্যবসায়ীক বিক্রয়যোগ্য পণ্য**[674] (হোক সেটা পশু বা যে কোন পন্য) উল্লেখিত পাচঁটি জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়। উক্ত সম্পদে একটি চন্দ্র বৎসর অতিবাহিত হলে।

❖ যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে

আল্লাহ তা’আলা কুরআনে কারীমে যাকাতের খাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এখাত ছাড়া অন্য কোথাও যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۝

যাকাত তো কেবল (১) **নিঃস্ব**, (২) **অভাবগ্রস্ত** ও (৩) **যাকাতের কাজে নিযুক্ত** ব্যক্তিদের জন্য, (৪) **যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য** তাদের জন্য, (৫)

---

672 আবু দাউদ: ১/২২১, আবদুর রাযযাক, হা. ৭০৭৭, ৭০৮২, শামী: ৩/২২৪ পৃ.,যাকারিয়া, বুখারী, হা. ১৪৪৭, মুসলিম, হা. ৯৭৯।

673 মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হা. ৭০৯১,৭০৯২।

674 আবু দাউদ: ১/২১৮, সুনানুল কুবরা, (বায়হাকী) ৪/১৫৭, মুয়াত্তা ইমাম মালেক: পৃ. ১০৮, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হা. ৭১০৩, ৭১০৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হা. ১০৫৫৭, ১০৫৬০, ১০৫৬৩।

দাস মুক্তির জন্য, (৬) **ঋণগ্রস্তদের জন্য,** (৭) **আল্লাহর পথে জিহাদকারী** ও (৮) **মুসাফিরের জন্য।** এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[675] আয়াতে যাদের **মনোরঞ্জন** উদ্দেশ্য তাদের কথা বললেও অধিকাংশ ফুকাহাগণের মত বর্তমানে কাফেরদের জন্য এই খাত রহিত হয়ে গেছে।[676]

৪- শবে কদর অন্বেষণ করাঃ নিঃসন্দেহে শবে কদর রমজানুল মুবারকে বিদ্যমান। আরো স্পষ্ট করে বললে রমজানের শেষ দশকে বিদ্যমান। সুতরাং রমজানের শেষ দশক তথা ইতেকাফের সময়কালে শবে কদর রজনী অতিক্রম করে বিধায় আমাদের উচিত ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করে সহস্র রজনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম রাত-লাইলাতুল কদর তালাশ করা। এ বিষয়ে পবিত্র কালামুল্লাতে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝
تَنَزَّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ، هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝.

অর্থঃ নিঃসন্দেহে কদরের রাতে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ۝ আর আপনি কি জানেন শবে কদর কী? ۝শবে কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ۝এ রাতে ফেরেশতা ও রূহুল কুদ্দস (জিবরাঈল আ.) তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে ۝(এ রাতের) আগাগোড়া শান্তি, যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[677]

---

[675] সূরা তাওবা: আয়াত ৬০।

[676] তাফসীরে মাজহারী: সূরা তাওবাহ ৬০ নং দ্র:।

[677] সূরা ক্বাদর: আয়াত ১—৫।

শবে কদর রমাদ্বানের শেষ দশকের যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিতে হবার সম্ভাবনা প্রবল। তাই রাসূল সা; রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে শবে কদর তালাশ করতে বলেছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রতি বছর শবে কদর হয় কি না? তা নিশ্চিত নয়। একই তারিখে একাধিক বছর হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। তাই রমজানের শেষ দশকের প্রতি রাতেই ইবাদত করা উচিত। বিশেষ করে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে শবে কদর ইবাদতের মাধ্যমে তালাশ করা উচিত।

হাদীসের মধ্যে আসছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

আম্মাজান আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা; রমাদ্বানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন, এবং বলতেন তোমরা রমজানের শেষ দশকে শবে কদর তালাশ কর।[678] রমাদ্বানের শেষ দশকের ফযীলতই সবচেয়ে বেশি। রাসূলে কারীম সা; শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।[679]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :هِيَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ« يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ، وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ التَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা; বলেছেন, তা শেষ দশকে, তা অতিবাহিত নবম রাতে অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে [অর্থাৎ

---

[678] বুখারী, হা. ২০২০।

[679] মুসলিম, হা. ১১৭১।

লাইলাতুল কদর]। ইবনে আব্বাস রাঃ হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ কর।[680]

অপর বর্ণনায় আসছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

আম্মাজান আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা্ঃ বলেছেন, তোমরা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।[681]

বেজোড় রাত্রি বলতেঃ **২১, ২৩, ২৫,২৭ ও ২৯ শে রমজান : লাইলাতুল কদর**

এখানে বলা উচিত, ২১ থেকে ৩০ এর রাত পর্যন্ত শবে কদর অন্বেষণ ও ইতিকাফ করা।

অনেকের মনে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, সাতাশের রাতই হচ্ছে শবে কদর। এই ধারণা ঠিক নয়।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলে কারীম সা্ঃ কে লাইলাতুল কদর কোন রাত তা জানানো হয়েছিল। তিনি তা সাহাবীদেরকে জানানোর জন্য আসছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। তাদের ওই ঝগড়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সা্ঃ এর নিকট থেকে সে রাতের ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ কথাগুলো সাহাবীদেরকে জানানোর পর নবী সা্ঃ বললেন- হতে পারে, এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এখন তোমরা

---

[680] বুখারী, হা. ২০২২।

[681] বুখারী, হা. ২০১৭।

এ রাত (অর্থাৎ তার বরকত ও ফযীলত) রমযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর।[682]

অন্য হাদীসে বিশেষভাবে বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদর তালাশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।[683]

তাই সাতাশের রাতকেই সুনির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদর বলা উচিত নয়। খুব বেশি হলে এটুকু বলা যায় যে, এ রাতে লাইলাতুল কদর হওয়ার অধিক সম্ভবনা রয়েছে। যেহেতু মুসলীম শরীফে এ বিষয়ে স্পষ্ট একটি হাদীসও পাওয়া যায়ঃ

عَنْ عَبْدَةَ، وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ – رضى الله عنه – فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ . فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلاَمَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا

মুহাম্মাদ ইবনে হাতিম ও ইবনে আবু উমর (রাহঃ) ... যির ইবনে হুবায়শ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি উবাই ইবনে কা’ব (রাযিঃ) কে বললাম, আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গোটা বছর রাত জাগরণ করে, সে কদরের রাতের সন্ধান পাবে। তিনি (উবাই) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন, এর দ্বারা তিনি একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে লোকেরা যেন কেবল একটি রাতের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। অথচ তিনি অবশ্যই জানেন যে, তা রমযান মাসে শেষের দশ দিনের মধ্যে এবং সাতাশতম রজনী। অতঃপর তিনি শপথ করে বললেন, তা সাতাশতম রজনী। আমি (যির) বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনি কিসের ভিত্তিতে

---

[682] বুখারী, হা. ২০২০, মুসলিম, ১১৬৫/২০৯।

[683] মুসলিম, হা. ১১৬৫।

তা বলছেন? তিনি বললেন, বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা্ঃ আমাদের অবহিত করেছেন। যেমন, সেদিন সূর্য উঠবে কিন্তু তার আলোতে তেজ থাকবে না।[684]

(উপরোক্ত হাদিস থেকে সাতাশ তারিখেও শবে কদর হতে পারে বলে বুঝা যায়। তবে নির্দিষ্ট করে বলার সুযোগ নেই। যেহেতু এই হাদিসের বিপরীতেও অসংখ্য সহীহ হাদিস রয়েছে।)

শবে কদর চেনার আলামতঃ

১ : রাতটি গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে না। ২: নাতিশীতোষ্ণ হবে। অর্থাৎ গরম বা শীতের তীব্রতা থাকবে না। ৩: মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে। ৪: সে রাতে ইবাদত করে মানুষ অপেক্ষাকৃত অধিক তৃপ্তিবোধ করবে। ৫: কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ স্বপ্নে হয়তো তা জানিয়েও দিতে পারেন। ৬: ঐ রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হতে পারে। ৭: সকালে হালকা আলোকরশ্মিসহ সূর্যোদয় হবে। যা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত।[685]

শবে কদর পেয়েছে মনে হলে কোন দো'আ পড়বে?

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو قَالَ تَقُولِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি কদরের রাত পেয়ে যাই তবে কি দুআ' পড়বো? তিনি বলেনঃ তুমি

---

[684] মুসলিম, হা. ২৬৪৮।

[685] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, পৃ. ১০৪৯, হা. ২১৯০, মুসলীম, হা. ১১৭০, আবু দাউদ, হা. ১৩৭৮, আদ্দুররুল মানসুর, ৮/৫৭১।

বলবে, (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)"হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই ভালোবাসো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও"।[686]

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউ উন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু আন্নী। (তিরমিজি শরীফের বর্ণনায় "আফুউ উন" শব্দের পর কারীম শব্দ আছে। (দো'আটি নিজের জন্য হলে: আন্নী, একাধিকের নিয়তে পড়লে আন্না হবে।

শবে ক্বদরের বর্জনীয় বিষয়ঃ

এত ফযীলতপূর্ণ রাতেও অনেকে বিধর্মীদের কালচার মুসলমানদের মাঝে চালু করে অব্যাহত রেখেছে। আমাদের অনেকে না জেনে সেটাকে প্রমোটও করছে। বড় আফসোস ও পরিতাপের বিষয় মুসলমানের সন্তানরা আজ এসকল ধর্মীয় ইবাদতগুলোকে বিধর্মীদের কালচারের রঙ্গে রঙ্গিন করতে সদা মরিয়া হয়ে আছে। ধর্মীয় জ্ঞান আর অনুশাসনের অভাবে মা-বাবারা কোনটি ইসলামিক আর কোনটি অনৈসলামিক তা বাচ্চাদের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না। যার ফলে দিনদিন বাচ্চারা এসকল অনৈসলামিক কাজের সাথে অনায়সে জড়িয়ে যাচ্ছে।

আতশবাজি করাঃ এ আতশবাজি শুধু গুনাহের কাজই নয়, বরং এর দুনিয়াবী কুফল আর অসারতাও আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান। যেমন (১) এতে নিজের সম্পদ অযথা ধ্বংস ও অপচয় হয়। তাছাড়াও একাজ দুনিয়াতেও ঘৃণিত হওয়ার পাশাপাশি সর্ব প্রকার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে কারীমে এ ধরনের লোককে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (২) এর ফলে অনেক সময় নিজের সন্তান সন্ততি ও পাড়া প্রতিবেশীর জীবন হুমকির সম্মুখিন হয়ে পড়ে। (৩) শিশুদের হাতে এই আতশবাজির জন্য টাকা পয়সা দেয়া হয়। এটা বাল্যকাল

---

[686] তিরমিজি, হা. ৩৫১৩। মিশকাত, হা. ২০৯১, ইবনে মাজাহ, হা. ৩৮৫০।

থেকেই তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানীর শিক্ষা দেয় এবং অনর্থক রুসুমের প্রতি অভ্যস্ত করে তোলে (৪) যে রজনীতে মহান আল্লাহ দো'আ কবুল করেন, ঠিক সে মুহূর্তে এসব গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকা কি তার নি'আমতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন নয়? (৫) এছাড়াও আলোকসজ্জা ও আতশবাজি হল হিন্দু জাতির দিওয়ালী প্রথার একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র। একজন মু'মিনের ঈমানী চেতনা ও জযবা কখনই তা সমর্থন করতে পারে না।[687]

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক দ্বীন অনুসারে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

উল্লেখ্য; ইসলামের কিছু কিছু ইবাদাতের সময় নিয়ে অনেক সময় আমাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। যেমন আরাফার রোযা সৌদি অনুযায়ী রাখবো? নাকি আমাদের দেশ অনুযায়ী রাখবো? এমনি ভাবে শবে কদর আমাদের দেশ অনুযায়ী হবে? নাকি সৌদি আরব অনুযায়ী? এ বিষয়ে মুফতী আজম পাকিস্তান শফী রহ. মাআরেফুল কোরআনে লিখেন, যে ইসলামী তারিখ "ইখতেলাফুল মাতালে" চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে আলাদা হওয়ার কারণে প্রত্যেকের তারিখ অনুযায়ী ধর্মীয় বিষয়গুলো বিভিন্ন দিনে হয়ে থাকে। এতে কোন সমস্যা নেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ তারিখ অনুযায়ী তা পালন করলে বরকত, সাওয়াব অর্জন হবে।[688]

তা ছাড়া স্পষ্টভাবে হাদিসে বলা আছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

---

687 আস সারাহা: ১০৪, ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম: ২/৬৩২, আল মাদখাল লি ইবনিল হাজ্ব: ১/২৯৯ ও ১/৩০৬, ৩০৭, তানকীহুল হামীদিয়াহ: ২/৩৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৫/২৮৯।

688 মাআরেফুল কোরআন: ৮/৭৯৪।

قَالَ النَّبِي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بيَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُكُمْ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (রমযান) মাসকে এক বা দুই দিন অগ্রবর্তী করো না। তবে যদি এমন হয় যে, কারো বিশেষ কোনো রোযার মামুল আছে...। হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়ো। যদি হিলাল আড়ালে পড়ে যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। তারপর (ঈদুল) ফিতর পালন করো। [689]

অন্য বর্ণনায় আসছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত-

أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْظَرِه سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (রমযানের) মাস কে এগিয়ে এনো না। হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়। যদি তোমাদের মাঝে এবং হিলাল দেখার মাঝে মেঘ কিংবা ধূলা অন্তরায় হয় তাহলে পূর্ণ
ত্রিশ গণনা করো।[690]

৫- ঈদের দুই রাত্রিঃ ঈদের রজনীতে ইবাদত করার ফযীলত সম্বলিত বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্মে তাহকীকসহ উল্লেখ করা হলো–

০১. হযরত আবূ উমামা আল বাহেলী (রাঃ) এর হাদীস,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قَالَ:"مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

[689] মুসনাদে আহমাদ, হা. ৯৬৫৪, খ. ২, পৃ. ৮৩৮, জামে তিরমিযী, হা. ৬৯২।
[690] সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা. ১৯১২, আবু দাউদ, হা. ২৩২৭।

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) রাসূল সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিত্বর এবং ঈদুল আযহার রাতে (সাওয়াবের নিয়তে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে) জাগ্রত থাকবে, সে ব্যক্তির হৃদয় ঐ দিন মৃত্যুবরণ করবে না যেদিন অন্য হৃদয়গুলো মৃত্যুবরণ করবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবশে তার কোন ভয় থাকবে না)।[691]

০২. হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রাঃ) এর হাদীস,

---

[691] ইবনে মাজাহ: ২/৬৫৮, হা. ১৭৮২।

❖ হাদীসটির মান : উক্ত হাদীসটি যয়ীফ (আমলযোগ্য)। উলুমে হাদীসের নিয়ম অনুসারে দুটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র যয়ীফ হাদীস

এর উপর আমল করা যাবে-

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة، والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها –بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها– بشرطين، هما=(أ– ألا تتعلق بالعقائد، كصفات الله تعالى) (ب– ألا يكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام

আক্বিদা সম্বলিত যেমন আল্লাহর গুনাগুন ও হালাল হারাম ব্যতীত অন্য স্থানে যয়ীফ হাদীস এর উপর আমল করা যাবে। (তাইসীরু মুসতালাহীল হাদীস-৮০।) তাই এ ক্ষেত্রেও উক্ত হাদীস অনুসারে আমল করতে কোন বাধা নেই। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীস এর একজন বর্ণনাকারী হলেন بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ যার সম্পর্কে জারাহ ও তাদিলের প্রায় ৩০এর অধিক ইমামগণ দ্বি'মুখি মন্তব্য করেছেন। কেউ বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য আর কেউ বলেছেন তিনি يدلس عن الضعفاء এর জন্য যয়ীফ। সর্বপরি তার জন্য উক্ত হাদীসটিকে যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা নববী (রহ.)- رَوَاهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا وَرُوِيَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا كَمَا سَبَقَ وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ আল মাজমু শরহুল মুহাযযাব: ৫/৪২। ও আল্লামা ইরাকী (রহ.)-

تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار (ص: 430)أخرجه بِإِسْنَاد ضَعِيف من حَدِيث أبي أُمَامَة.

তাখরীযুল ইহইয়া লিল ইরাকী: ৪৩০। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) সহ আরো একাধিক ইমাম উক্ত হাদীসটি শুধু যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন। তালখিসুল হাবীর: ২/১৯০।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ رَجُلٍ وَهُوَ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوب. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، تَفَرَّدَ بِهِ: جَرِيرٌ

হযরত উবাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিত্বর এবং ঈদুল আযহার রাত্রি নামায রত থাকবে, সে ব্যক্তির হৃদয় ঐদিন মৃত্যুবরণ করবে না যেদিন অন্য হৃদয়গুলো মৃত্যুবরণ করবে।[692]

❖ একটি আশা :

গায়রে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা উল্লোখিত হাদীসগুলোর বিস্তারিত তাহক্বীক্ব দেখার পর তারা যেনো মিথ্যাচার, জাল হাদীস বলে শ্লোগান ও শায়খ আলবানী রহ. এর অন্ধ তাকলীদ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দান করুক। আমীন।

চার মাযহাবের ফাতওয়া :

ঈদের রজনীতে ইবাদত করা বিষয়ে চারও মাযহাবেই মুস্তাহাব বলে বর্ণিত হয়েছে। নিম্মে রেফারেন্স উল্লেখ করা হলো[693]

---

692 আল মুজামুল আওসাত: ১/৫৭, হা. ১৫৯।

❖ হাদীসটির মান : হাদীসটি যয়ীফ (আমলযোগ্য)। বিখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা হায়সামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ، وَلَكِنْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

উক্ত হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হলেন عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّআর তিনি সম্ভবত একজন যয়ীফ বর্ণনাকারী কিন্তু আল্লামা ইবনু মাহদীর ন্যায় অনেক মুহাদ্দীস তার প্রশংসাও করেছেন আর অনেকেই তাকে দুর্বল বলেছেন। আল্লাহ ভালো জানেন। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২/১৯৮, হা. ৩২০৩।

يستحبّ احياء ليلة العيد باتفاق المذاهب الأربعة ، قال في المجموع : وأسانيده ضعيفة , ومع ذلك استحبوا الإحياء لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ رَأَيْت مَشْيَخَةً مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَظْهَرُونَ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَيْلَةَ الْعِيدِ فَيَدْعُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى تَمْضِيَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ، وَبَلَغْنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْيِي لَيْلَةَ جُمَعٍ، وَلَيْلَةُ جُمَعٍ هِيَ لَيْلَةُ الْعِيدِ لِأَنَّ صَبِيحَتَهَا النَّحْرُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَأَنَا أَسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حُكِيَتْ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا (الأم للشافعي 1/ 264).

جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي(25/2) : (مطلب في إحياء ليالي العيدين والنصف وعشر الحجة ورمضان)
جاء في حاشية الدسوقي المالكي (399/1): (قوله وندب إحياء ليلته) أي لقوله عليه الصلاة والسلام { من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع والقيامة بل يكون قلبه عند النزع مطمئنا , وكذا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحير

وفي نهاية المحتاج للرملي 397/2: ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر (من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا أخذا من خبر { لا تدخلوا على هؤلاء الموتى ؟ قيل من هم يا رسول

---

[693] (কিতাবুল উম্ম: ১/২৬৪, হাশিয়া ইবনে আবেদিন: (হানাফী) ২/২৫, হাশিয়াতুদ দুসুকী: (মালেকী), নেহায়াতুল মুহতাজ: (রামালী) ২/৩৯৭, কাশশাফুল কেনা'আ: (আল বাহুতী: আল হাম্বলী ১/৪৬৭, তালখীসুল হাবীর: (ইবনে হজর) ২/১৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২/২৯১, আলবিররু ওয়াস সিলাহ: (মারওয়াজী) ৩৩পৃ.)

الله ؟ قال : الأغنياء } وقيل الكفرة أخذا من قوله تعالى { أومن كان ميتا فأحييناه } أي كافرا فهديناه . وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا , فقالت أم سلمة : , أو غيرها واسوأتاه , أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهم في ذلك اليوم شغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة)

ويحصل الإحياء بمعظم الليل وإن كان الأرجح في حصول المبيت بمزدلفة الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني من الليل . وعن ابن عباس يحصل إحياؤهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة , والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب) اهـ

وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (467/1) : (ولا يقومه كله) لقول عائشة رضي الله عنها {ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح } قال في الفروع : وظاهر كلامهم : ولا ليالي العشر , فيكون قول عائشة أنه أحيا الليل أي كثيرا منه أو أكثره ويتوجه بظاهره احتمال ويخرج من ليلة العيد ويحمل قولها الأول : على غير العشر , أو لم يكثر ذلك منه واستحبه شيخنا وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة (إلا ليلة عيد) لحديث { من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب } رواه الدارقطني في علله وفي معناها : ليلة النصف من شعبان كما ذكره ابن رجب في اللطائف) اهـ

و جاء في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر : 160/2 : (روى الخطيب في غنية الملتمس بإسناد إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطاة : " عليك بأربع ليال في السنة , فإن الله يفرغ فيهن الرحمة : أول ليلة من رجب , وليلة النصف من شعبان , وليلة الفطر , وليلة النحر) اهـ

وجاء في مصنف ابن ابي شيبة 291/2 : (من كان يقوم ليلة الفطر : حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله قال كان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بنا ليلة الفطر) اهـ

وفي البر والصلة للمروزي ص 33 : (حدثنا الحسين بن الحسن قال سمعت ابن المبارك يقول : بلغني أنه من أحيا ليلة العيد أو العيدين لم يمت قلبه حين تموت القلوب) اه

উল্লেখিত আলোচনার সার-সংক্ষেপ কথা হলো, চারো মাযহাবের কিতাব থেকে রেফারেন্স দ্বারা বুঝা যায়, দুই ঈদের রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব। যেমন শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবুল উম্মে, হানাফী মাযহাবের হাশিয়া ইবনে আবেদীনে, মালেকী মাযহাবের হাশিয়াতুদ দুসুকীতে, হাম্বলী মাযহাবের কাশশাফুল কেনাআসহ অন্যান্য গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে।

৬- পুরো বৎসরে ৫টি রাত জাগ্রত থেকে আমল করা প্রাসঙ্গে

এ বিষয়ে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন,

أخبرنا أبو الفتح الصحاف، أنا أبو سعيد النقاش الحافظ، أنا أبو ذر: الحسين بن الحسن بن علي الكندي بالكوفة، ثنا الحسين بن أحمد المالكي، ثنا سويد بن سعيد،ثنا عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن معاذ بن جبل –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر،وَلَيْلَة الْفطر وليلة النصف من شعبان

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) জাগ্রত থাকবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তারবিয়ার রাত (জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত), আরাফার রাত, কুরবানী দিবসের রাত এবং ঈদুল ফিত্বরের রাত ও শবে বারাআতের রাত।[694]

[694] আত তারগীব ওয়াত তারহীব: লিল আসবাহানী-১/২৪৮, লিল মুনজেরী-২/৯৮, হাদীস-১৬৫৬।

৭- শবে বারাআত পালন করাঃ পনের শাবানের মধ্য রজনীর রাত শবে বারাআত। অনেক ফযীলতপূর্ণ রাত।

সকলের উচিত ইবাদাতের মাধ্যমে এই রাতকে মূল্যায়ন করা।

শবে বারাআতের ফযীলত:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَجْتُ ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ لِي : أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟، قَالَتْ : قُلْتُ : ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল সা্ঃ কে বিচানায় পেলামনা, (তালাশ করতে গিয়ে দেখি) হুজুর সা্ঃ জান্নাতুল বাকিতে। (আমাকে দেখে) রাসূল সা্ঃ বললেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তোমার উপর জুলুম করবে বলে ভয় হচ্ছে নাকি? আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সা্ঃ আমি ধারণা করেছিলাম আপনি আপনার অন্য কোন বিবির নিকট তাশরিফ নিয়েছিলেন, হুজুর সা্ঃ বলেন, আল্লাহ তা'আলা শাবানের পনের তারিখ রাত প্রথম আসমানে অবতরণ করে, “কালব” গোত্রের পালের পশম পরিমানের চেয়েও অধিক লোকের গুনাহ মাফ করে দেন।[695] (সুবহানাল্লাহ এ রাতে কত বেহিসাব লোকের

❖ হাদীসটির মান :উক্ত হাদীসটি যয়ীফ (আমলযোগ্য)। কেননা উক্ত হাদীস এর একজন দূর্বল বর্ণনাকারী হলেন عبد الرحيم بن زيد العَمِّي তার সম্পর্কে মুহাদ্দীসগণ নিম্নরূপে জারাহ করেছেন-

عبد الرحيم بن زيد العمي أحد رواته (متروك)، و سبقه ابن الجوزي فقال : حديث لا يصح ، و عبد الرحيم قال يحي : كذاب ، و النسائي : متروك ... وقال ابن حجر :حديث مضطرب الإسناد» .و الحديث أورده المنذري في الترغيب بلفظ «...الليالي الخمس ...». و أضاف في آخره : «...وليلة النصف من شعبان » و أشار المنذري لضعفه

[695] তিরমিজি, হা. ৭৩৯।

মাগফিরাত হয়ে থাকে?))। এ প্রসঙ্গ বিস্তারিত আরবী অষ্টম মাস শাবান মাসের আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।

বাৎসরিক বর্জনীয় আমলঃ

পুরো বৎসর পাঁচদিন রোজা রাখা হারামঃ

দুই ঈদের দিন, তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন, আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন, তথা এগারো, বারো, তেরো জিলহজ্জ। হাদীসের মধ্যে আসছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সা্ঃ দু’দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন – কুরবানীর ঈদের দিন আর ‘ঈদুল ফিতরের দিন।[696]

অন্য বর্ণনায় আসছে,

عَنْ نُبَيْشَةَ، الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ".

নুবায়শাহ্ আল হুযালী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা্ঃ বলেছেন, আইয়্যামে তাশরীক্ব হচ্ছে পানাহার করার দিন।[697]

সমাপ্ত

[696] মুসলিম, হা. ২৫৬২, ই. ফা. হা. ২৫৩৯।

[697] মুসলিম, হা. ২৫৬৭, ই.ফা. হা. ২৫৪৪।